স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা

●

নরহরি কবিরাজ

●

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
(প্রাইভেট) লিমিটেড
কলিকাতা-১২

পরম শ্রদ্ধাভাজন

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে

সূচী

লেখকের কথা

বইখানি সম্পর্কে গোড়াতেই যে কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন তা হল এই যে মার্কসবাদী দৃষ্টি থেকে বিষয় বিশ্লেষণ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মার্কসবাদী দৃষ্টি থেকে এই বিষয় নিয়ে এই প্রথম আলোচনা নয়। এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মার্কসবাদীদের পক্ষ থেকে বিশ্লেষণের চেষ্টা কিছুদিন যাবৎ চলছে। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে যে মার্কসবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ আলোচনার অবতারণা করেছেন উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহগুলি নিয়ে। আবার কেউ কেউ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং তার ভাবধারা নিয়ে বিচার করেছেন। রামমোহন, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নিয়ে যে সব বিশ্লেষণ হয়েছে তাকে এই ধরনের আলোচনার উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে।

কিন্তু লেখকের মনে হয়েছে অনেকক্ষেত্রে এই ধরনের আলোচনায় একটি প্রধান ত্রুটি রয়ে গেছে। যারা কৃষক বিদ্রোহগুলির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা তদানীন্তন সমাজের বিকাশে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ভাবধারার যে ভূমিকা ছিল তাকে অনেকটা উপেক্ষা করে গেছেন। আবার যাঁরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নিয়ে বিচার করেছেন তাঁরা তদানীন্তন সমাজের অগ্রগমনের ইতিহাসে কৃষক বিদ্রোহগুলির যে অগ্রণী ভূমিকা ছিল তার প্রতি উদাসীনতা দেখিয়েছেন। কাজেই উভয় দিক থেকেই এই বিচার হয়ে পড়েছে আংশিক, অর্ধসত্য ও একাদশদর্শী। এই ধরনের বিশ্লেষণের ত্রুটিগুলিকে মূলধন করে বুর্জোয়া চিন্তানায়কেরা অনেক সময় বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে তাঁরা যা বলেন সেটাই ঠিক এবং মার্কসবাদীদের বক্তব্যগুলি সর্বাংশে ভুল।

এই অবস্থায় মার্কসবাদীদের প্রধান কর্তব্য হল ভারতের সমাজ-বিকাশের একটি সত্যসন্ধী ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করা। অর্থাৎ তদানীন্তন সমাজের শ্রেণী-মূলে প্রবেশ না করে বিচ্ছিন্নভাবে ও ওপর ওপর শুধু কৃষক বিদ্রোহগুলি অথবা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং তার ভাবধারা ও

সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলে তা দোষদুষ্ট হতে বাধ্য। এই জন্যে প্রয়োজন সঠিক মার্কসীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পর্বে সমাজ বিকাশের ধারা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন তদানীন্তন সমাজের অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে সম্যক পরিচয়। আর প্রয়োজন মনে রাখা যে এই অর্থনৈতিক-সামাজিক সম্পর্ককে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সেই সমাজের রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক ভাবধারা।

আলোচ্য বইখানিতে এই মার্কসীয় পদ্ধতিটি যথাসম্ভব অনুসরণ করার চেষ্টা হয়েছে। তাই এই বইখানি শুধু তদানীন্তন সমাজের অর্থনৈতিক পটভূমির বিশ্লেষণ নয়, শুধু কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস নয়, অথবা শুধু বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্রমবিকাশের চিত্রণও নয়। এই বইখানিতে প্রথমেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে আলোচ্য ঐতিহাসিক পর্বে সমাজের কাঠামো কি ছিল। তারপরে তদানীন্তন সামাজিক সম্পর্ককে ভিত্তি করে সেদিনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যে বিশেষ প্রকৃতি পরিগ্রহ করেছিল তার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। সর্বশেষে, এই সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মানসক্ষেত্রে যে প্রতিফলন হয়েছে তারও বিচার করার চেষ্টা হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে কোন একটি দিকের প্রতি ঝোঁক সংবরণ করে সেদিনের সমাজবিকাশের ধারা অসামগ্রিক ও সর্বদিকব্যাপী বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এ-ছাড়া, মার্কসবাদী পদ্ধতি থেকে কোন বিশেষ দেশের সমস্যা বিচারের মানদণ্ড হল শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। এই বইখানিতে বিষয় বিশ্লেষণের সময় এইদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। প্রতি পর্বে ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কি-ভাবে অন্যান্য পরাধীন দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে গাঁথা ছিল তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বোপরি এই পরম সত্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে সেদিনেও আজকের মতই ভারতের জাতীয় আন্দোলন ছিল বিশ্ববিপ্লবের ভাগ্য ও ভবিষ্যতের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত।

বইখানির বিষয়-সূচীটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে লেখক কাল-বিভাগের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। বাণিজ্য পুঁজির যুগ ও শিল্প-পুঁজির যুগের নামকরণ ও বিষয়-বিশ্লেষণে মূল সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে ভারত সম্পর্কে

কার্ল-মার্কসের লেখাগুলিকে। এই সঙ্গে মার্কসের চীন বিষয়ক ও আয়র্ল্যাণ্ড বিষয়ক অনুরূপ প্রবন্ধগুলির বিশেষ সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুগের নামকরণ ও বিষয় বিশ্লেষণে প্রধান সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে লেনিন ও পরে স্তালিনের লেখাগুলিকে।

এ ছাড়া দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় যে কথাটি বিশেষ করে বলার প্রয়োজন সেটি হল—বইখানিকে যথাসম্ভব ত্রুটিহীন করার জন্যে লেখক যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। এই উদ্দেশ্যে বইখানির কলেবর প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রথম সংস্করণে বইখানির ক্ষুদ্র কলেবরের মধ্যে তথ্য-সম্ভার যতটা প্রয়োজন ছিল তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রথম সংস্করণের পাঠক ও সমালোচকেরাও অনেকেই এই তথ্য সম্পদ বাড়াবার জন্যে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এবারে সেই সমালোচনার যথার্থতা স্মরণ রেখে যথাসম্ভব তথ্যসম্ভারে বইখানিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে।

প্রয়োজন মনে করায় কোনো কোনো বিষয় সম্পর্কে বিশেষ করে বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দিকের আন্দোলনগুলি সম্পর্কে (স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি) যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি নতুন অধ্যায়ও সংযোজন করা হয়েছে।

বইখানিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত। ১৯২৭ সালটিকে গুরুত্ব দিয়েছি এই কারণে যে এই বছরেই কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিটি প্রথম গ্রহণ করেছিল। ঐ বছরেই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কৃষক-মজুর রাজ প্রতিষ্ঠারও সংকল্প নিয়েছিল।

পাঠকদের সুবিধার জন্য উপসংহারে ১৭৫৭ থেকে ১৯২৭ দীর্ঘ দিনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি সংক্ষিপ্ত সার উপস্থিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের একটি স্তর বিভাগেরও চেষ্টা করা হয়েছে। 'উপসংহারে' ১৯২৭ থেকে ১৯৪৭ সালের পারম্পর্যটি সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়ারও চেষ্টা হয়েছে।

পাঠক বন্ধুদের ও স্বদেশ ও বিদেশের সমালোচকদের সাহায্য পাওয়ার জন্যেই লেখক দ্বিতীয় সংস্করণে বইখানিকে অনেকটা অঙ্গ সংস্কারে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু তবুও বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সামগ্রিক বিচারের ক্ষেত্রে বইখানি একটি প্রাথমিক চেষ্টা মাত্র। কাজেই লেখকের বহু সাবধানতা ও পরিশ্রম সত্ত্বেও

বইখানিতে যে নানা ধরনের ত্রুটি এখনও রয়ে যেতে পারে সে বিষয়ে লেখক সচেতন।

আলোচনার ভিত্তি হিসাবে এই বইখানি যদি গৃহীত হয় এবং পাঠক ও তাত্ত্বিকদের আরও সমালোচনার মাধ্যমে এই বইয়ের সিদ্ধান্তগুলি যদি আরও সুনির্ণীত ও সুপ্রমাণিত হয় তবে লেখক তাঁর চেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবেন।

সূচনা ॥

মধ্যযুগের বাঙলা

বাটি-ভরা দুধ, গোলা-ভরা ধান আর হাসি-ভরা মুখ!—কোনো কোনো বাঙালী কবি কল্পনা করেছেন ইংরেজ ভারতে আসার আগে বাঙলায় ছিল এমনি এক স্বর্গরাজ্য!

মধ্যযুগের বাঙলায় সুখ, সমৃদ্ধি আর ঐশ্বর্যের মধ্যে দিন কাটাত রাজা-রাজড়া আর সামন্ত প্রভুরা। কিন্তু বাঙলার জনসংখ্যার যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই কৃষক, কারিগর ও নিম্নশ্রেণীর জীবন ছিল দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, বেকারি, ভিখারি বৃত্তি নিয়ে বিড়ম্বিত। সমাজের সবচেয়ে সৃজনশীল শ্রেণী হলেও কৃষক ও কারিগরেরা ছিল জীবন্মৃত।

তবু বাঙালী কবির কল্পনাশ্রয়ী অতি-কথনের মধ্যেও লুকিয়ে ছিল এক আংশিক সত্য।

প্রাক্-ব্রিটিশ আমলের বাঙলায় স্বর্ণযুগের অস্তিত্ব না থাকলেও, দোষে-গুণে সেদিনকার বাঙলা ছিল স্বাধীন বাঙলা।

সামন্ততান্ত্রিক শোষণে জর্জরিত হলেও বাঙলা তথা ভারতের স্বাধীন বিকাশের ধারাটি সেদিন বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপে বাধা পেত না। ব্রিটিশ যুগের বাঙলা পরাধীন, প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের বাঙলা ছিল স্বাধীন, আত্ম-নির্ভরশীল।

গ্রাম সমাজের কাঠামো

পরাধীনতার কালো ছায়া বাঙলার বুকে নেমে আসার আগে প্রায় তের শো বছর ধরে বাঙলার যে ইতিহাস তা এই স্বাধীন সামন্ততান্ত্রিক বাঙলার ইতিহাস।

এই তের শো বছরের মধ্যে কত রাজবংশ গড়ে উঠেছে, কত রাজবংশ ভেঙে পড়েছে, হিন্দু শাসকের বদলে মুসলমান শাসকের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু বাঙলার সামন্ত সমাজের সাধারণ চরিত্রটি বদলায়নি।

সাধারণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছিল এই সমাজ। সমাজের মূল ভিত্তি ছিল শতকরা নব্বুই জন অধিবাসীর বাসভূমি বাঙলার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি।

এখানকার জীবন-প্রবাহ ছিল বৈচিত্র্যহীন। প্রতিটি গ্রামের প্রধান বাসিন্দা ছিল কৃষক ও কারিগর। গ্রামের অধিবাসীরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করত। সঙ্গে সঙ্গে তারা নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার জন্যে নানা রকমের গৃহ-শিল্পের কাজে নিযুক্ত থাকত। কৃষির কাজের পাশাপাশি চলত এই গৃহশিল্পের কাজ। কৃষি ও গৃহশিল্পের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল এই গ্রাম-সমাজের প্রাণ।

প্রতিটি গ্রামের সংগঠন ছিল ছকে-বাঁধা। প্রতি গ্রামে একজন করে 'প্রধান ব্যক্তি' থাকত। তার কাজ ছিল বিচার করা, গ্রামের শান্তি রক্ষা করা এবং খাজনা আদায় করা। মোড়ল ছাড়া এই গ্রামের অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্যে থাকত হিসাব-রক্ষক, পুরোহিত, পাঠশালার গুরুমশাই, জ্যোতিষী, নাপিত, কামার, ছুতোর, কুমোর, ধোপা প্রভৃতি। পুরোহিত, কামার, ধোপা প্রভৃতি ছিল গ্রামের সেবক এবং সেই হিসাবে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হত গ্রামের লোকদের। এই উদ্দেশ্যে সারা গ্রামের জনসমষ্টির কাছ থেকে তারা কয়েক খণ্ড নিষ্কর জমি পেত। এই জমি থেকে তাদের জীবিকা চলত আর এই সুযোগের বিনিময়ে তাদের গ্রামের লোকদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে হত। (১)

কৃষকদের পরিশ্রমে উৎপন্ন খাদ্য ও কৃষিজাত দ্রব্যাদিই ছিল গ্রামের প্রধান সম্পদ। জমির সঙ্গে কৃষকের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আধুনিক অর্থে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বলতে যা বোঝায় সেই ধরনের মালিকানা

স্বত্বের তখনও উদ্ভব হয়নি। উত্তর ভারতের গ্রামগুলিতে পঞ্চায়েতী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই অঞ্চলে জমির উপর সমষ্টিগত কর্তৃত্ব ছিল। সমস্ত গ্রামবাসী সমষ্টিগতভাবে রাজাকে খাজনা দিত। মধ্য ভারত, দক্ষিণ ভারত, বাঙলা ও আসামে প্রতিটি গ্রামে মোড়লের প্রভাব ছিল বেশি। এই অঞ্চলে জমিগুলি ছিল পৃথক পৃথক এবং প্রতিখণ্ড জমির খাজনাও ধার্য হত পৃথক পৃথকভাবে। (২)

এই গ্রাম-সমাজ ছিল একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ গ্রামের অধিবাসীরা যা উৎপাদন করত তা তারা নিজেরাই ভোগ করত। অধিবাসীরা গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য পণ্য হিসাবে গ্রামের বাইরে পাঠাবার প্রয়োজন বোধ করত না, আবার বাইরে থেকে একমাত্র লবণ, মশলা ও মুদ্রা (অবশ্য মুদ্রার প্রচলনও ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ) ছাড়া অন্যান্য পণ্যদ্রব্য তাদের আমদানি করার প্রয়োজন হত না।

শহর যে একেবারে ছিল না তা নয়। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি ছিল তখনকার দিনের বেশ সমৃদ্ধিশালী শহর। এই শহরে যে সব কারিগর বাস করত তারা বাজারে বিক্রির জন্যে জিনিসপত্র তৈরি করত। ধনিকেরা বাঙলার শিল্প-দ্রব্য বাঙলার বাইরে চালান দিত। ভারতের বাইরেও বাঙলার শিল্প-দ্রব্য রপ্তানি করা হত। কাজেই গ্রামে যেমন নিজেদের ভোগের জন্যে উৎপাদন চলত, শহরে তেমনি বিনিময়ের জন্যে উৎপাদন চলত।

এই শহরগুলোর প্রতিপত্তি ছিল কোনো ক্ষেত্রে রাজধানী বলে; কোনো কোনো শহর গড়ে উঠত ধর্মক্ষেত্র বলে তীর্থযাত্রীদের ভীড়ে আবার বাণিজ্যের প্রয়োজনেও দু'চারটে শহর গড়ে উঠেছিল।

তবে আধুনিক অর্থে শিল্পপ্রধান শহর বলতে যা বোঝায় সেই ধরনের শহর প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের বাঙলায় তখনও গড়ে ওঠেনি। (৩)

বিনিময়ের জন্যে পণ্য উৎপাদন প্রচলিত থাকলেও এই শহরগুলোতে তখন (বিশেষ করে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের আগে) বণিক বা শিল্পপতিদের প্রভাব ছিল নগণ্য। এই সময়ে শহরের সবচেয়ে ধনী সম্প্রদায় ছিল সামন্ত প্রভুরা। তারা নিজেদের ধন বিলাস-ব্যসনেই ব্যয় করত; পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করত না।

কাজেই শহরে বিনিময়ের জন্মে উৎপাদন প্রচলিত থাকলেও বাঙলার সমগ্র অর্থনীতিতে এই ব্যবস্থার ভূমিকা ছিল গৌণ। মুখ্য ভূমিকা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ সেই গ্রামগুলির—যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভোগের জন্মেই উৎপাদন।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলিই তখনকার দিনে সমাজের ছিল মূল ভিত্তি। এই আপাতসুন্দর গ্রামগুলির জীবন ছিল অনাড়ম্বর, স্পন্দনহীন, অনড়। অল্পে সন্তুষ্টি, কৃচ্ছ্র-সাধন, চিরাচরিত আদব-কায়দায় অভ্যস্ত জীবনধারা, বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের অভাব ভারতের গ্রাম-সমাজকে গতিহীন করে রেখেছিল।

কারিগরদের উদ্যম ছিল অতি অল্প। পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের ফলে সমাজে যে শ্রম-বিভাগ দেখা দেয় সেই ধরনের শ্রম-বিভাগ গ্রামসমাজে ছিল না। উৎপাদনের যন্ত্রপাতির কোনো উন্নতি হত না। বাঙলায় এবং বাঙলার বাইরে সারা ভারতে বড় বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন হত, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ এই গ্রাম-সমাজ ছিল সব ঝড়-ঝাপটার বাইরে।

✓শ্রেণী-সম্পর্ক

কোনো কোনো লেখক এই আপাতসুন্দর, অনাড়ম্বর জীবন-প্রবাহকে শান্তির দ্যোতক বলে প্রচার করেছেন।

বস্তুমূল্য উৎপাদনকারী হিসাবে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকত কৃষক ও কারিগর শ্রেণী। কৃষকেরা জমি চাষ করত। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে মাটিতে সোনা ফলাত। কারিগর সমাজকে সরবরাহ করত তার নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র, অলঙ্কার, কৃষি উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি।

এই কৃষক ও কারিগরদের জীবন কিন্তু মোটেই সুখের ছিল না। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কৃষকদের দায়িত্ব ছিল দুটি—১। জমি চাষ করার দায়িত্ব ও ২। রাজাকে ফসলের অংশবিশেষ দেওয়ার দায়িত্ব। রাজা প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাই রাজার প্রাপ্য—শস্যের এক অংশ। (৪) এই অংশ হিন্দু আমলে সাধারণত ৬ ভাগের ১ ভাগ ধার্য ছিল। শেরশাহ ও আকবর ৩ ভাগের ১ ভাগ নির্দিষ্ট করেন। আকবরের পরবর্তীদের আমলে অনেক সময়ে ৩ ভাগের ১ ভাগেরও বেশি, এমনকি ২ ভাগের ১ ভাগ খাজনা ধার্য হত।

হিন্দু আমল থেকেই একদল রাজা বা জমিদারের উৎপত্তি হয়। তারা কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত। মুসলমান রাজাদের আমলে খাজনা আদায়কারী জমিদার শ্রেণীর প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। মালিক, খাঁ, আমীর, জমিদার, জায়গীরদার প্রভৃতি পদমর্যাদা-সম্পন্ন এক অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সামন্তপ্রভু ও জমিদারেরা কৃষক ও কারিগরদের উপর অকথ্য শোষণ চালাত, কৃষকেরা নিজেদের লাঙল আর গরু দিয়ে চাষের কাজ চালাত, অথচ ফসলের একটা বড় অংশ তাদের জমিদারদের গোলায় তুলে দিয়ে আসতে হত।

সামন্তপ্রভুরা কৃষকদের কাছ থেকে শুধু খাজনা আদায় করে নিশ্চিন্ত হত না। রাষ্ট্র ছিল এই সামন্ত প্রভুদের কবলিত। কাজেই রাষ্ট্র সামন্ততান্ত্রিক শোষণ বজায় রাখার জন্যে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করত। রাষ্ট্র অসংখ্য সৈন্য পুষত এই শোষণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্যে। তাই প্রবাদ প্রচলিত ছিল—"সৈন্য ও কৃষক রাজ্যের দুই বাহু।" (৫) এই ব্যবস্থা তদারক করার জন্যে রাষ্ট্র একদল আমলা নিয়োগ করত। তাদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। রাষ্ট্রক্ষমতা-বলে তারা নির্দিষ্ট খাজনা ছাড়াও বে-আইনিভাবে কৃষকের কাছ থেকে অর্থ আদায় করত। জিয়াবারণী ও বাদায়ুনী উভয়েই রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন। জিয়াবারণী লিখেছেন—"লোকে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের যমের মত ভয় করত। এই বিভাগে কেরাণীগিরি করা পাপকর্ম বলে গণ্য হত এবং এই কেরাণীদের সঙ্গে কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে চাইত না। এই বিভাগে চাকরী নেওয়ার চেয়ে মৃত্যুকে অনেকে শ্রেয় বলে মনে করত।" (৬)

তাছাড়া, গ্রামের মোড়লেরাও কৃষকদের উপর অত্যাচার করত। মোড়লেরা ছিল গ্রামের নেতা। এই নেতারা রক্ষক ও ভক্ষক দুইই ছিল। মোড়লদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্যে আলাউদ্দীন আইন পাশ করেন। (৭) ফরীদ (পরে শেরশাহ) যখন পিতার জায়গীর পরিচালনার দায়িত্ব পান, তখন তিনি মোড়লদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হন। (৮)

রাষ্ট্র সামন্তপ্রভুদের স্বার্থ দেখতে ব্যস্ত থাকত ; এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র এমন সব আইন তৈরি করত যার সাহায্যে সামন্তপ্রভুরা কৃষকদের হাতে মাথা কাটতে পারত। বস্তুত, কৃষকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। বারণী অবজ্ঞাভরে জনসাধারণকে অভিহিত করেছেন 'পশুর দল' বলে। (৯) জমিদার, খাজনা আদায়কারী ও আমলারা কৃষকদের উপর জোর জবরদস্তি করত, খাজনা দিতে না পারলে কৃষকদের স্ত্রী-পুত্র কেড়ে নিয়ে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করে দিত। (১০)

অপরদিকে এই সমাজের উপরতলায় বাস করত হিন্দু-মুসলমান অভিজাত শ্রেণী—রাজা, জমিদার, জায়গীরদার প্রভৃতি। উৎপাদনের কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। কৃষকদের কাছ থেকে তারা যে খাজনা আদায় করত তার দ্বারা সংগৃহীত অর্থে এই সম্প্রদায়টি ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকত। এই সামন্তপ্রভুদের বিলাস-ব্যসন জোগাত নারী ও পুরুষ ক্রীতদাসেরা।

সেদিনকার সমাজে উপরতলা আর নীচের তলার মধ্যে পার্থক্য ছিল বিরাট। এই দুইয়ের মাঝামাঝি কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তেমন প্রভাব ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে একেবারে ছিল না তা নয়। পুরোহিত, টোলের পণ্ডিত, ঘটক, কবিরাজ, হাকিম, ভাট, নর্তকী—এদের নিয়েই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল জমিদারদের অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

মুঘল আমলে অভিজাত সম্প্রদায়ের নীতিহীন বিলাসিতা ও অকর্মণ্যতা চরমে উঠেছিল। প্রতিটি বিদেশী পর্যটকের বিবরণীতেই উচ্চশ্রেণীর বিলাসিতা ও নিম্ন শ্রেণীর অভাব-ক্লিষ্ট জীবনের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। এই অত্যাচার ও শোষণ সম্পর্কে স্যার টমাস রো লেখেন—"ভারতের জনসাধারণ বাস করে ঠিক যে-ভাবে মাছ সমুদ্রে বাস করে থাকে। অর্থাৎ বড় সবসময়ে ছোটকে গ্রাস করছে। প্রথমে বড় কৃষক ছোট কৃষককে শোষণ করে, তারপরে অভিজাতেরা বড় কৃষকদের শোষণ করে,—বড় ছোটকে শোষণ করে, রাজা শোষণ করে সকলকে।" (১১)

সমাজের সবচেয়ে কর্মঠ ও সৃজনশীল এই কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতার জন্যেই বাঙলার সামন্ত সমাজের নির্জীব, নিস্পন্দ জীবনকে ভেঙে ফেলতে পারে এমন কোনো শক্তির আবির্ভাব ঘটেনি।

কার্ল মার্কস্ স্বভাব-সুলভ তীক্ষ্ণ ভাষায় এই নিশ্চল সমাজের চরিত্রটি চিহ্নিত করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"মর্যাদাহীন, রুদ্ধস্রোত এই নিশ্চেষ্ট জীবন, জড়ের ন্যায় এই জীবনযাত্রা, উৎকট, উদ্দেশ্যহীন অপরিমিত ধ্বংসের শক্তিকেই ডেকে এনে হিন্দুস্থানে হত্যাকে ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত করেছিল। এই পরিস্থিতি মানুষকে অবস্থার প্রভু না করে তাকে বাহ্য অবস্থার দাস করে তুলেছিল। পরিবর্তনশীল এক সামাজিক অবস্থাকে এক অপরিবর্তনীয় পূর্বনির্দিষ্ট নিয়তিতে রূপান্তরিত করেছিল।" (১২)

শ্রেণী-সংগ্রাম

এই সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনের মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত বাস করত কৃষক, কারিগর ও অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণী।

অত্যাচার যখন চরমে উঠত তখন এই আধমরা মানুষের দলও মরীয়া হয়ে উঠত। কৃষকেরা অনেক সময় অত্যাচারী সামন্ত প্রভুদের হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্যে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেত। আবার কখনও কখনও তারা সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে গর্জে উঠত। এমনকি সময়ে সময়ে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ব্যাপারেও শ্রমজীবী জনসাধারণের ভূমিকা থাকত।

কি হিন্দু আমলে, কি মুসলমান রাজাদের আমলে দেশে যখন ঘোর অরাজকতা দেখা দিত এবং সামন্ত প্রভুদের স্বৈরাচার চরমে উঠত তখন কৃষকদের প্রতিরোধের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে পাল বংশের পতনের যুগে রাজা দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে বাঙলার জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এই সময়ে মহীপালকে বধ করে কৈবর্ত নায়ক দেশরক্ষা করেন এবং তাঁর এই মহৎ কাজের জন্যে তাঁকে জনসাধারণ রাজা নির্বাচিত করেন। এই ঘটনাটি ইতিহাসে 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামে বিখ্যাত।

মুসলমান রাজাদের আমলে সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার আরও বেড়েছিল। তাই এই সময়ে কৃষক বিদ্রোহের সংখ্যাও অনেক বেশি। সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বে রণথম্বরে জনসাধারণের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা

দেয়। এই বিক্ষোভের মূল কারণ ছিল স্থানীয় কোতোয়ালের অত্যাচার। উৎপীড়িত জনসাধারণ মরীয়া হয়ে হাজি মৌলা নামে জনৈক কোষাগার-রক্ষীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই সময়ে হাজি মৌলার পাশে শুধু জনসাধারণ এসে দাঁড়ায়নি, স্থানীয় মুচি সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তুমুল যুদ্ধ চালিয়েছিল। (১৩)

মুহম্মদ তুঘলকের আমলেও দোয়াব অঞ্চলে কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলেছিল। মুহম্মদ কতকগুলি খাজনার হার বাড়িয়ে দিলেন এবং পীড়নমূলক আবয়াব আদায় করতে লাগলেন। ফলে এই অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কৃষকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তারা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কেউ কেউ জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করল। (১৪)

বিদেশী পর্যটকেরা মুঘল আমলেও কৃষকদের অনুরূপ দুর্দশার কথা উল্লেখ করেছেন। বার্ণিয়র লিখেছেন—গরীব জনসাধারণের উপর সামন্ত প্রভুরা অকথ্য নির্যাতন চালাত। এই নির্দয় অত্যাচারের ফলে নিরুপায় হয়ে অনেক কৃষক গ্রাম ছেড়ে পালাত এবং এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহনীয় কাজ হিসাবে তারা শহরে বা যুদ্ধ শিবিরে গিয়ে কাজ সংগ্রহ করত। আওরঙ্গজেবের আমলে কৃষকদের পলায়নী বৃত্তিটি চরম আকার ধারণ করে। ব্যাপারটি এতই গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় যে এই পলায়নীবৃত্তি বন্ধ করার জন্যে সম্রাট আওরঙ্গজেব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হন। (১৫)

বাঙলাতেও কৃষকেরা পলায়নীবৃত্তির আশ্রয় নিত। তদানীন্তন কালের (সপ্তদশ শতাব্দী) জনৈক কৈবর্ত কবি রামদাস আদক কৃষক জীবনের এই ব্যথা চিত্রিত করেছেন নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নিম্নলিখিত ছত্র দুটিতে—

"দেশে খাজনার তরে পলাইয়া যাই
বিদেশে বেগারী বুঝি ধরিল সিপাই" ॥ (১৬)

শুধু পলায়ন নয়, মরীয়া হয়ে বাঙলার কৃষকেরা যে অনেক সময় বিদ্রোহ করত তারও প্রমাণ আছে।

কথিত আছে কেদার রায়ের রাজ্যের ভিতরে নওয়াপাড়ার জমিদারেরা অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল। এই জমিদারেরা ৭৫০টি কৃষক পরিবারের

পরিজনবর্গকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় কৃষকেরা কয়েকটি প্রভাবশালী পরিবারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। (১৭)

শুধু কৃষকেরা নয়, সময় সময় বিক্ষুব্ধ সেনা-বাহিনীও বিদ্রোহ করত।

তখনকার দিনে সামন্ত সমাজের অচলায়তনের বিরুদ্ধে কৃষক ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সৈন্যদের এই প্রতিরোধ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। এই প্রতিরোধের ফলে অচলায়তনের মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন সম্ভব হত, উৎপাদনের পথে যে জগদ্দল বাধা ছিল তাও কিছু কিছু অপসারিত হত। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এই সময়ে উৎপাদন পদ্ধতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন না হওয়ায় এবং কৃষকশ্রেণীর চেতনা নিম্ন স্তরে থাকায় এই কৃষক বিদ্রোহগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিফল হয়েছিল। চতুর নবাব ও জমিদারেরা এই কৃষক বিদ্রোহগুলিকে নিজেদের সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে বা নিজেদের রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে ব্যবহার করত। এই কারণে সামন্ত সমাজের আওতায় গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিলেও সামন্ত সমাজের মুল চরিত্রটি শতাব্দীর পর শতাব্দী অপরিবর্তিত রয়ে যায়।

সমাজ বিকাশের নতুন উপকরণ

এই মুলত অপরিবর্তনীয় সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও মুঘল যুগে নতুনতর সমাজ গঠনের কিছু কিছু উপাদান জন্মলাভ করতে থাকে। (১৮)

মুঘল যুগের আগে পর্যন্ত বাঙলা দেশে তথা সারা ভারতে পণ্য উৎপাদন, বাণিজ্য বা শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করেনি। হিন্দু রাজাদের আমলের মতই মুঘল-পুর্বযুগের ভারতে আভ্যন্তরীন লেন-দেন চলত পণ্য-বিনিময়ের সাহায্যে। মুদ্রার অঙ্কে হিসাব করলে জিনিস-পত্রের মুল্য ছিল নিতান্ত অল্প। তাই কড়ি ছিল এই সময়ে মুদ্রা মাত্রা। এই সময়ে উড়িষ্যা ও তেলেগু দেশের সঙ্গে ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বাঙলার লেন-দেন প্রায় ছিল না বললেই চলে। বাঙলার কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি অন্য দেশে অল্পই রপ্তানি হত।

মুদ্রা অর্থনীতি গড়ে না ওঠার ফলে তখনকার দিনে জমির খাজনা শস্যের বিনিময়ে শোধ করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। জমিদারেরা দিল্লীতে খাজনা বাবদ কোনো অর্থ পাঠাত না, পাঠাত হাতী ও অন্যান্য শিল্পসম্পদ।

মুঘল আমলে আকবরের পরে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল থেকে বাঙলার অর্থনীতিতে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে।

জাহাঙ্গীরের সময়ে ইওরোপীয় বণিকেরা বিশেষ করে ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকেরা ভারতে বাণিজ্য করার সুযোগ লাভ করে। এই সময় থেকে তারা বাঙলা দেশের সঙ্গেও বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে।

বাঙলা দেশের সঙ্গে ইওরোপের বাণিজ্য সম্পর্ক 'ত্রিশ বছরের যুদ্ধের' সময় থেকে শুরু হয়। এই যুদ্ধে বারুদের ব্যবহার হয়েছিল এবং সেই বারুদ তৈরির একটি প্রধান উপকরণ গন্ধক তারা বিহারের উত্তর অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছিল। এর পর থেকে বিদেশী বণিকেরা এদেশ থেকে প্রচুর রেশমী দ্রব্য, কার্পাস দ্রব্য, নীল প্রভৃতি কিনে বিদেশে চালান দিতে থাকে। হিসাব করে দেখা গেছে যে ১৬৮০-১৬৮৩ মাত্র এই চার বছরের মধ্যে একমাত্র ইংরেজ বণিকেরাই পণ্যদ্রব্য কেনার জন্য শুধু বাঙলা দেশে ২০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের রৌপ্য নিয়োগ করেছিল। প্রতি বছরে ডাচদের রৌপ্য নিয়োগের পরিমাণ তার চেয়ে কম ছিল না, কেননা এদেশে ইংরেজদের তুলনায় ডাচদের প্রতিষ্ঠা তখন অনেক বেশি। ঐতিহাসিকগণ হিসাব করে দেখেছেন যে আজকের বিনিময়ের হারে হিসাব করলে তখন একটিমাত্র বিদেশী কোম্পানী প্রতি বছরে ৮০ লক্ষ টাকার সমমূল্য অর্থনিয়োগ করত।

এইভাবে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য আমদানি হওয়ার ফলে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়।

নতুন অবস্থায়: কিছু পরিমাণে অর্থ কৃষক ও কারিগরের ঘরে গিয়ে পৌঁছতে লাগল। ফলে, কৃষক ও কারিগরেরা এখন শস্যের বদলে অর্থের মাধ্যমে খাজনা দেবে—সরকার এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারল।

বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে রৌপ্য গৃহীত হওয়ায় বাঙলার বাণিজ্য প্রসারিত হতে লাগল। এখন থেকে বাঙলার পণ্য অন্য প্রদেশে ও অন্য দেশে যেমন চালান দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হল তেমনি অন্য প্রদেশ থেকে বা অন্য দেশ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানি করাও সহজসাধ্য হল।

বাণিজ্য প্রসারের দরুণ অর্থের মূল্য ও বেতনের হার বেড়ে গেল। এই পরিবর্তনে সবচেয়ে লাভবান হল সমাজের ধনী সম্প্রদায়। তাঁদের হাতে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হতে থাকল।

শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চারিত হল। বাঙলার কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের একটি বাজার খুলে গেল। তা ছাড়া, শিল্প উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ও শিল্প সংগঠনেরও কিছু কিছু উন্নতি দেখা দিল। ইংলণ্ড থেকে দক্ষ ও শিক্ষিত কারিগরেরা এসে এদেশের কারিগরদের উন্নত ধরনের শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করতে শেখাল। কাশিমবাজারে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের যেসব কুঠি ছিল সেখানে ৭ থেকে ৮ শত বাঙালী কারিগর একসঙ্গে কাজ করত।

বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব

মুঘল আমলের প্রথম একশো বছরের মধ্যে এইভাবে সামন্ত সমাজের গর্ভে কতকগুলি নতুন অর্থনৈতিক শক্তি জন্ম নিচ্ছিল। এই নতুন অর্থনৈতিক শক্তিগুলো সামন্ততন্ত্রের চিরাচরিত জীবনে ফাটল ধরাতে আরম্ভ করল।

মুঘল আমলের শেষাশেষি রাজনীতি ক্ষেত্রেও সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামন্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ল। রাষ্ট্রের দুর্বলতায় রাজ-সভার সমারোহ নিভে এল। রাজসভার দুর্দিনে শুরু হল রাজন্যবর্গ ও সামন্তবর্গের দুর্দশা। মুঘলদের সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

এই অবস্থায় পুরানো সমৃদ্ধিশালী সামন্ত বংশগুলো দুর্বল হয়ে পড়ল, আর যারা নতুন পরিবেশে রৌপ্যধনের মালিক হতে পারল তারাই ক্রমশ ধনী হয়ে উঠতে লাগল। (১৯)

এই রৌপ্যধনের কল্যাণে ভারতে এক প্রভাবশালী ধনিক শ্রেণীর আবির্ভাব হল। এদের ধনাগমের উপায় ছিল মহাজনী কারবার, দাদনী কারবার, আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বাণিজ্য এবং শিল্প।

এই ধনিকশ্রেণী ক্রমশ এতই শক্তিশালী হয়ে উঠল যে এদের ধনের উপর রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা নির্ভর করতে লাগল।

এদের প্রভাব প্রতিপত্তি তদানীন্তন কালে ভারতে যে সব পর্যটক এসে-ছিলেন তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। (২০)

মাণ্ডেলশ্লো লিখেছেন—রাজধানী দিল্লীতে বিদেশী বণিকদের জন্যে ৮০টি সরাইখানা ছিল। এইগুলির কোনো কোনোটি ছিল বিরাট তেতালা বাড়ি।

এখানে থাকবার রাজসিক ব্যবস্থা, সংরক্ষিত ভাণ্ডার, আস্তাবল ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত ছিল।

মানরিক (১৬২৯-১৬৪৩) লিখেছেন—পাটনা শহরে ৬০০ জন ধনী দালাল ও ব্যবসায়ী বাস করত।

মানরিক আগ্রা শহরের ধনী ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে বলেছেন, সদাগর বা ক্ষত্রী নামে এঁরা পরিচিত ছিলেন। এঁদের বাড়িতে তিনি শস্যের গাদার মত অর্থের গাদা লক্ষ্য করেছিলেন।

উপকূল ভাগের সর্বত্র, গোয়া, করমণ্ডল, এবং বাঙলায় গুজরাটি বেনিয়াদের দেখা যেত। তারা ভারতের বাইরেও বাণিজ্য করতে যেত।

ঢাকা শহরেও ধনিকদের খুব প্রভাব ছিল। পর্যটকেরা লিখেছেন যে এখানে ক্ষত্রীদের বাড়িতে অর্থের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে তা গণনা করা সম্ভব ছিল না। এই অর্থ সাধারণত ওজন করে পরিমাপ করা হত।

বিদেশী পর্যটকেরা এই ধনী ব্যবসায়ীদের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে যে ক'টি শহরের নাম করেছেন তার মধ্যে কাশী, লাহোর, মুলতান, আগ্রা, সুরাট, আমেদাবাদ প্রভৃতি প্রধান। কাশীতে সাত হাজার তাঁতের কাজ চলত। তাঁদের চোখে লাহোর ছিল ভারতের সব চেয়ে বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র। আমেদাবাদ শহর তাঁদের কাছে লণ্ডনের মত বড় শহর বলে মনে হয়েছিল।

এই সব ব্যবসা কেন্দ্রে যে ধনী পরিবারেরা নেতৃত্ব করত তাদেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

গুজরাটী বণিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন ভিরজি ভোরা (১৬১৯-১৬৭০), সুরাটের সমস্ত বাণিজ্য এবং মালাবার উপকূলের বাণিজ্যের বিরাট অংশ তাঁর অধিকারে ছিল। তাঁর বাণিজ্য. কেন্দ্র ছিল ভারতের দূর দুরান্তস্থিত বিভিন্ন প্রদেশে ও ভারতের বাইরে। থিবনটের মতে তিনি ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী লোক।

বাঙলা দেশে মুর্শিদাবাদে এই সময়ে খুব প্রভাবশালী ছিলেন শেঠ পরিবার (২১)। তাঁরা অর্থের লেনদেন করতেন। জমিদার আর বাঙলার নবাবদের তাঁরা ব্যাঙ্ক ছিলেন বলা চলে। নবাবরা তাঁদের উপর অর্থের জন্যে নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় ইংরেজ আগমনের পূর্বে এই পরিবারের বিরাট রাজনৈতিক

প্রভাব গড়ে ওঠে। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন জগৎ শেঠ। ১৭১৮ থেকে ১৭৬০—এই ৪২ বছর ধরে জগৎ শেঠের বংশ বাঙলার অর্থনৈতিক জীবনে দোর্দণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

জগৎ শেঠের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন মাড়োয়ারের অধিবাসী। সেখান থেকে তাঁরা পাটনায় অর্থ ব্যবসায় উপলক্ষ্যে আসেন। এই বংশের মাণিকচাঁদ ঢাকায় অর্থব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে মাণিকচাঁদ ঢাকা ছেড়ে ব্যবসার খাতিরে মুর্শিদাবাদে আসেন। মাণিকচাঁদের পরবর্তী ফতেচাঁদ বা জগৎ শেঠের আমলে এই বংশটির উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকে। শেঠ বংশের কারবার সারা ভারত জুড়ে চলতে থাকে। এই সময়ে এই পরিবারের এত প্রতিপত্তি ছিল যে, বার্ক এই পরিবারের কারবারের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের কারবারের তুলনা করেন।

জগৎ শেঠ পরিবারের মূল কাজ ছিল—নবাবের টাকশাল হিসাবে কাজ করা, জমিদার ও ইজারাদারদের টাকা ধার দেওয়া, মহাজনী কারবার করা। জগৎ শেঠ পরিবার সম্পর্কে জনৈক ইতিহাসবেত্তা মন্তব্য করেছেন—এই পরিবারের সমৃদ্ধির মূলে শুধু সুদী কারবার নয়—এই পরিবার কিছুটা আসল ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। তারা ক্রেডিট দিত এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও করত। (২২)

ভারতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ হল না কেন?

এইভাবে মুঘল যুগের প্রথম একশো বছরের মধ্যে সামন্ত সমাজের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন শুরু হয়েছিল। এই আলোড়নের মূলে ছিল এক নতুন শক্তি—সেটি হল বিনিময়ের জন্যে পণ্য উৎপাদন, ও মুদ্রা অর্থনীতি। একদিকে এই নতুন শক্তির আবির্ভাবে, আর একদিকে সামন্ত সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা দিল এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী—বণিক, ব্যবসায়ী, ধনিক ইত্যাদি।

ইংলণ্ডে শতবর্ষের যুদ্ধ থেকে গোলাপের যুদ্ধ পর্যন্ত এই রাজনৈতিক পর্বে যে সামাজিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, ভারতে এই সময়ে অনেকটা সেই ধরনের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। (২৩) ইংলণ্ডে এই সময়ে যেমন সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিয়েছিল, বাণিজ্য ও ব্যবসার প্রসার হয়েছিল এবং এই

অবস্থাকে কেন্দ্র করে এক বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, ঠিক সেই রকম ভারতেও অনুরূপ এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ড ও ভারতের বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়। ভারতের মত ইংলণ্ডে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের অস্তিত্ব ছিল না। তাছাড়া, ইংলণ্ডে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমশ রাষ্ট্রযন্ত্রও করায়ত্ত করতে পেরেছিল। ফলে ইংলণ্ডে বাণিজ্য-পুঁজির স্তর থেকে শিল্প-পুঁজির স্তরে উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু ভারতে গ্রাম-সমাজের অস্তিত্বের ফলে সামন্ত সমাজের ভিত্তিমূলটি একেবারে ভেঙে ফেলা বড় কঠিন হয়ে পড়ল। শহরে বাণিজ্য পুঁজিকে কেন্দ্র করে এক দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হলেও নানা কারণে শিল্প পুঁজির স্তরে উত্তরণ সম্ভব হয়নি। এমন কি, বাণিজ্য পুঁজিকে কেন্দ্র করে যে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম হল তাদের প্রভাব শহরেই সীমাবদ্ধ রইল। গ্রাম সমাজের আপাতমধুর সহজ, সরল জীবনযাত্রাকে আক্রমণ করতে পারলেও বুর্জোয়া শ্রেণী এই সমাজের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরাতে পারল না। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলির সংগঠন এতই সাদাসিধে ছিল, এদের অভাব ও অনটন এতই অল্প ছিল যে বণিক শ্রেণীর পণ্যের মূল্য গ্রামবাসীর কাছে ছিল না বললেই চলে। কৃষকদের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ায় বণিকদের বাজার হয়ে রইল শহরে সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ, একপেশে।

এই অবস্থায় নীচে থেকে ভারতে পুঁজিতন্ত্র গড়ে ওঠার আর সম্ভাবনা রইল না।

অপর দিকে, উপর থেকেও এই পুঁজিতন্ত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল না। উপরতলার সামন্ত প্রভুরা বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত থাকায় তাদের সঞ্চিত অর্থ ভোগের জন্যই ব্যয়িত হত, শিল্প বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পুঁজি নিয়োগে এই শ্রেণী অভ্যস্ত ছিল না।

তাছাড়া, সামন্ত সমাজ-পুষ্ট টোল বা মাদ্রাসাগুলি বিদ্যার কচকচি নিয়ে ব্যস্ত থাকত, এই ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুযোগ না থাকায় উৎপাদনের যন্ত্রপাতির কোনো উন্নতির অবকাশ রইল না।

সর্বোপরি, রাষ্ট্রের উপরে সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা ছিল চূড়ান্ত। এমন কি, সামন্ততন্ত্রের যখন ঘোর দুর্দিন তখনও নবোদ্ভূত মধ্যবিত্তশ্রেণী রাষ্ট্রের উপর নিজ

মর্যাদা স্থাপন করতে পারেনি। সত্য বটে, এই সময়ে বাঙলা দেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপর রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা নির্ভর করত, কিন্তু তবুও রাষ্ট্র-কাঠামোর উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ছিল সামন্ত প্রভুদের। বরং সামন্তরাষ্ট্র এই বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশের পথটি সব সময়েই রোধ করে রাখতে পারত। ভারতের এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে পণ্য চালান দিতে হলে ভারতীয় বণিকদের আভ্যন্তরীন শুল্ক দিতে হত। অথচ ইওরোপীয় বণিকদের আভ্যন্তরীন শুল্ক দিতে হত না। এইভাবে সামন্তরাষ্ট্র দেশীয় বণিকদের স্বার্থের প্রতি প্রতিকূল আচরণ করত।

একদিকে গ্রাম-সমাজের নিশ্চল সংগঠন, আর একদিকে সামন্তরাষ্ট্রের এই সংকীর্ণ নীতি ভারতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের পথে মস্ত বড় বাধা হয়ে রইল।

রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় চেতনা

বাঙলার সামন্ত সমাজের মূল অর্থনৈতিক কাঠামোটির মত রাজনৈতিক কাঠামোটিও মূলত অপরিবর্তিত রয়ে যায়।

তদানীন্তন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল সামন্ত প্রভুদের। রাজা ছিলেন এই সামন্ত প্রভুদের নেতা। সম্রাট এই সামন্ত প্রভুদের নিয়ে রাজসভায় বস.তেন, তাদের পরামর্শ শুনতেন, তাঁদের মধ্যে থেকে মন্ত্রী, সেনাপতি, প্রাদেশিক শাসন কর্তা নিয়োগ করতেন।

মুসলমান সম্রাটদের আমলে রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল দিল্লী। দিল্লীর সম্রাট ছিলেন সারা ভারতের বাদশা। কিন্তু প্রদেশগুলির উপর দিল্লীর সম্রাটের নামে মাত্র কর্তৃত্ব ছিল। বাঙলা, বিহার, দক্ষিণ ভারতে দিল্লীর বাদশার প্রতিনিধিত্ব.করত স্থানীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তারা। কার্যত এই শাসনকর্তারা ছিলেন স্বাধীন নবাব।

প্রদেশগুলির উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অভাব থাকায় সারা দেশব্যাপী এক ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া, মুসলমান সম্রাটদের আমলে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে বাধা ছিল ধর্মগত প্রশ্নটি। আকবর অবশ্য ভারতের রাষ্ট্রীয় চেতনার এই দুর্বলতা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। তাই তিনি প্রদেশগুলির উপর দিল্লীর আসল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

করেন। তাছাড়া, হিন্দু-মুসলমান সামন্ত প্রভুদের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামোটিকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করতেও সচেষ্ট হন। ক্রমশ তাঁর সময়ে একটি সর্বভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্রের জন্মের সূচনা হয় (২৪)। তার পরে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময়েও এই আদর্শটি মোটামুটি বলবৎ ছিল। কিন্তু এই আদর্শ শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি। আওরঙ্গজেবের আমলে আবার আকবর-পূর্ব যুগের জাতীয়তার পরিপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি মাথা তুলে দাঁড়ায়। (২৫)

সাধারণভাবে বলা চলে—মুসলমান বাদশাদের আমলে সর্বভারতীয় জাতীয়তার আদর্শ গড়ে উঠতে পারেনি।

বরং এই সময়ে কোনো কোনো প্রদেশে জাতি-গঠনের একটি প্রক্রিয়া বা 'ন্যাশনালিটি' দানা বাঁধতে থাকে। উদাহরণ হিসাবে বাঙলা ও মারাঠা দেশের কথা ধরা যেতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মারাঠা দেশে প্রথমে রামদাস ও পরে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠী 'ন্যাশনালিটি'র সূচনা হয়।

বাঙলা দেশে অনেক আগে থেকে ন্যাশনালিটি গঠনের প্রক্রিয়াটি দানা বাঁধতে থাকে। মুঘল আমলে আকবরের সময় বাঙলাকে দিল্লীর জীবনের যোগসূত্রের সঙ্গে বাঁধবার চেষ্টা হলেও তা সার্থক হয়নি। বাঙলার লোকের কাছে মুঘল আমল ছিল মোটামুটি 'বিদেশীর শাসন'!

মুঘল শাসন 'বিদেশী' শাসন বলে প্রতিভাত হওয়ার ফলে, দিল্লীর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বাঙলায় প্রায়ই বিদ্রোহ দেখা দিত। এই বিদ্রোহের উপলক্ষ্য ছিল অনেক সময় বাঙলার 'স্বাধীনতা', স্বাতন্ত্র্য ও স্বধর্ম রক্ষার সংকল্প। সন্দেহ নেই, অনেক সময় উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজা বা নবাব বাঙালীর এই স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার সুযোগ নিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইত। যেমন, আকবরের সময়ে চাঁদ রায়, কেদার রায়, ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি জমিদারেরা মুঘল শাসন উপেক্ষা করে নিজ নিজ অঞ্চলে একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানো ছাড়া যে কোনো জাতীয় ভাবাদর্শ তাঁদের ছিল বলে মোটেই মনে হয় না। কিন্তু তবুও 'বিদেশী' মুঘলদের বিরুদ্ধে তাঁদের এই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সেদিন বাঙলার জনসাধারণ সমর্থন জানিয়েছিল। বার ভুইঞাদের এই

আন্দোলন এই দিক থেকে বাঙলায় ন্যাশনালিটি গঠনের ক্রিয়াটিকে সাহায্য করেছিল।

এমন কি স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে বাঙলার মুসলমান নবাবেরা পর্যন্ত 'বাঙালী' হয়ে ওঠেন। মুর্শিদাবাদের নবাবদের জীবনযাত্রায় এই 'বাঙালী' প্রভাব লক্ষ্যণীয়। প্রজাদের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই বোধ হয় আলিবর্দি, সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর প্রভৃতি নবাব তাঁদের আত্মীয় বন্ধুদের নিয়ে প্রতি বছর হোলি উৎসবে যোগ দিতেন। (২৬)

এই রাজা, বাদশা, সামন্ত প্রভু ছাড়া সাধারণ নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর লোকদের মধ্যে নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মগত ও সাংস্কৃতিক কর্মোদ্যমের মাধ্যমেও এই বাঙালী 'ন্যাশনালিটি' গঠনের প্রক্রিয়াটি অগ্রসর হতে থাকে।

এই দিক থেকে সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে কৃষকদের যে বিদ্রোহগুলি দেখা দিত তার ভূমিকা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এই শ্রেণী-সংগ্রামগুলি কৃষকদের মধ্যে অনেকটা শ্রেণীগত সংহতি সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া, সামন্ত প্রভুরাই তখন দেশের রাজনীতির হর্তাকর্তা-বিধাতা হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামগুলি কখনও কখনও রাজনৈতিক সংগ্রামেরও রূপ নিত। ফলে, এই সংগ্রামগুলি তখনকার অবস্থা বিবেচনায় কৃষকদের রাজনীতি জ্ঞানের উদ্বোধনেও যথেষ্ট সাহায্য করত। (২৭)

এই প্রত্যক্ষ শ্রেণীসংগ্রামগুলি ছাড়া কৃষক ও অন্যান্য নিম্ন ও মধ্যবিত্তের শ্রেণীচেতনা এই সময়ে প্রায়ই প্রকাশ পেত ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৪শ শতাব্দী থেকে ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ চারশো বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আকারে এই ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব লক্ষিত হতে থাকে। বাঙলার হিন্দু সমাজে তখন উচ্চজাতির প্রাধান্যে নিম্নজাতিগুলি জীবন্মৃত, ঘৃণিত জীবনের ভারে বিপর্যস্ত। ঠিক এই সময়ে ইসলামের অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক আবেদন নিম্নজাতির লোকেদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

ধর্মের ভাষায় প্রকাশ পেলেও এই সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে উচ্চ জাতির (শ্রেণীর) বিরুদ্ধে নিম্নজাতির (শ্রেণীর) বিদ্রোহ স্পৃহাই প্রতিফলিত হয়েছিল। সামন্ত সমাজের জাতি (শ্রেণী) বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, ও

অন্যান্য পীড়নমূলক অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদের বাণী উচ্চারণ করলেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন নিম্নশ্রেণী ও নিম্নজাতির অন্তর্গত। (২৮) জাতিতে জাতিতে মিলন, হিন্দু মুসলমানে মিলন—এই ছিল সংস্কার আন্দোলনের প্রধান বাণী।

কবীর লিখলেন—"হিন্দুর হিন্দুয়ানী, মুসলমানের মুসলমানী দুইই দেখিলাম। ইহারা কেহই পথের সন্ধান পাইল না।"

দাদু প্রচার করলেন—"হিন্দু মুসলমান দুই হাত। দুই হাত একত্র না হইলে কেমন করিয়া অমৃতের অঞ্জলি রচিত হইবে?" (২৯)

কবীর ছিলেন মুসলমান, বৃত্তিতে জোলা। রামানন্দের শিষ্য শোন ছিলেন নাপিত, ধন ছিলেন শূদ্র, আর রাম্নদাস ছিলেন মুচি। মারাঠাদেশের কবি তুকারাম ছিলেন জাতিতে মুদি।

বাঙলায় এই সময়ে অনুরূপ সংস্কার আন্দোলনের সর্বপ্রধান প্রবর্তক ছিলেন নবদ্বীপের পণ্ডিত প্রবর শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্য নিজে উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশজাত হলেও তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে উদারতার প্রভাব অতি স্পষ্ট। চৈতন্য ঘোষণা করেন বৈষ্ণবের জাতিভেদ নেই—

"বৈষ্ণবের জাতিভেদ করিলে প্রমাদে।
বৈষ্ণবের জাতিভেদ নাহিক সংসারে।"

চৈতন্যের মুসলমান শিষ্য ছিলেন। (৩০) কয়েকজন বৌদ্ধকেও তিনি নিজের মতে এনেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। চৈতন্যের প্রচারকার্য যে সনাতন প্রথার বিরোধী ছিল তা নিম্নোক্ত শ্লোকে পরিষ্কার—

"সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্বনাশ
নীচ শূদ্র দ্বারে করে ধর্মের প্রকাশ।"

....

"বেদের বিরুদ্ধকার্য করে সর্বক্ষণ।
যবন সংসর্গ নাহি মানয়ে দূষণ।"

এ-ছাড়া, বাঙলায় 'ন্যাশনালিটি' গঠনের প্রক্রিয়াটি পরিপুষ্ট হতে থাকে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে জাগরণ দেখা দেয় তার মধ্য থেকে। এই সময়ে উপরোক্ত ধর্ম প্রচারকদের লেখা ও ভাষণকে কেন্দ্র করে ধর্মাশ্রয়ী এক ধরনের সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। কবীর, নানক, ও চৈতন্য ভক্তদের পদাবলীতে

জনতার কাছে সহজবোধ্য ভাষায় প্রচারের মাধ্যমে এক সর্বজনবোধ্য অসাম্প্রদায়িক জনপ্রিয় সাহিত্য গড়ে উঠতে থাকে।

তাছাড়া, পৌরাণিক কাহিনী, সমাজচিত্র প্রভৃতি নিয়ে যে সব পাঁচালী, যাত্রা প্রভৃতি রচনা ও অভিনয় হত সেগুলিও ছিল হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙলার জনসাধারণের উপভোগের বস্তু।

বিদগ্ধ সাহিত্য-রসিকেরা কখনও রাজসভা থেকে, কখনও জনসভা থেকে যে সাহিত্য রচনা করতেন তাও ছিল বাঙালী মাত্রেরই সম্পদ। কবিকঙ্কন, মুকুন্দরাম, দৌলত কাজী, আলাওল, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যগুণে পৃথক হলেও তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বাঙালী কবি।

রাজার মেয়ে বিদ্যা, ব্যাধের মেয়ে ফুল্লরা, অভাবগ্রস্ত গ্রাম্য কবি—সমাজের স্তর ভেদে জীবন প্রবাহে তাদের বহু পার্থক্য সত্ত্বেও সবাই তারা এক জায়গায় এক—তারা সবাই বাঙালী।

বাঙলার "নীচকুলে জন্ম, জাতিতে চোয়াড় যারা" তাদের জন্যে "ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে তালপাতার ছাউনি।"

অভাবগ্রস্ত বাঙালী কবির এক গ্রাম ছেড়ে আর এক গ্রামে পলায়ন। কিন্তু তবু কি শান্তি আছে? আগের মতই আবার—"শিশু কাঁদে ওদনের তরে।"

ভারতচন্দ্রের কাব্যরসেও এই বাঙালী মন রয়েছে সঞ্চারিত। গঙ্গাবিধৌত বাঙলার সেই প্রেমগাথা অনুরণিত বিদ্যার কণ্ঠে: 'হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যেথা।'

মোট কথা, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, পালা অভিনয়ে বাঙালী এক ভাষায় কথা বলতে শুরু করে, এক ধরনের আবেগ প্রকাশ করতে থাকে, এক ধরনের রুচির পরিচয় দিতে থাকে।

বাঙালীর 'ন্যাশনালিটি' গঠনের প্রক্রিয়াটিতে তাই বাঙলা সাহিত্যের যে অবদান তাও উপেক্ষা করা চলে না।

কিন্তু একথা একবারও ভুললে চলবে না যে বাঙলায় জাতি গঠনের উপরোক্ত প্রক্রিয়াটি সামন্ত সমাজের অভ্যন্তরে জন্মলাভ করেছিল। সামন্ত সমাজের মূল কাঠামোটিকে অতিক্রম করে আধুনিক বুর্জোয়া জাতি-গঠনের যে প্রক্রিয়া ইওরোপে মধ্যযুগের ভাঙনের ক্ষণে দেখা দিয়েছিল সেই ধরনের বুর্জোয়া জাতি-গঠনের প্রক্রিয়া এই সময়ে বাঙলায় তথা ভারতে দেখা দেয়নি।

বুর্জোয়া জাতি-গঠনের পূর্বশর্ত হিসাবে সমাজে বুর্জোয়া শক্তির যে প্রাধান্ত প্রয়োজন সেই প্রাধান্ত সেদিনকার ভারতে নানা কারণে সম্ভবপর হয়নি।

সত্য বটে, মুঘল আমলের শেষে গ্রাম-সমাজের কৌলীন্তে আঘাত পড়েছিল, সামন্ত সমাজের জঠরে বাণিজ্য-শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, সামন্ত রাষ্ট্রের বাঁধুনি আলগা হয়ে এসেছিল, কিন্তু তবুও সামন্ত সমাজ থেকে উন্নততর ধনতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণ নানা কারণে সম্ভবপর হয়নি।

এইভাবে ভারতের সমাজ বিকাশের নিয়মটি যখন নানা আভ্যন্তরীন শক্তির বাধায় আড়ষ্ট, তখন ভারতের বাইরে পৃথিবীর একটি বিশেষ অংশে, ইওরোপে, সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস-যজ্ঞ সমাপ্তপ্রায়, ধনতন্ত্রের বিজয়ধ্বনিতে ইওরোপীয় দিগন্ত মথিত।

ইওরোপের এই ধনতান্ত্রিক শক্তি নিজের প্রয়োজনে বিশ্ব-দরবারে উপস্থিত হল। ভারত না চাইলেও এই অধিকতর পরিণত ও অধিকতর শক্তিশালী ইওরোপীয় ধনতন্ত্র ভারতের দ্বারে এসে উপস্থিত হল।

সামন্ত রাষ্ট্র এই অধিকতর শক্তিশালী বিদেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে অন্তর্নিহিত দুর্বলতার চাপে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। যে দেশীয় বণিক-শ্রেণী ভারতে পুঁজিতন্ত্রের স্বাধীন বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করতে পারত তারা এই বিশাল শত্রুকে বাধা দেওয়া দূরে থাক, তার কাছে আত্মবিক্রয় করে খাল কেটে কুমির আনার বন্দোবস্ত করে দিল।

যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইওরোপে স্বদেশমন্ত্রের উদ্গাতা তারাই অবস্থা বৈগুণ্যে ভারতে পরাধীনতার চারণ-কবির ভূমিকা গ্রহণ করল।

ভারত ইতিহাসের এক ঘোর অন্ধকার দিনের কালো ছায়ার মাঝে স্বাধীন সামন্তসমাজের জীবন-নাটিকায় যবনিকা পড়ল।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

(১) Karl Marx—Capital Vol. I, P. 391—94.
(২) Gadgil—The Industrial Evolution of India, P. 9—12
(৩) Baden Powel—"The Origin & Growth of Village Communities in India", P. 19—20.
(৪) Gadgil—Industrial Evolution., P.6—8.

(৫) Moreland—The Agrarian System of Moslem India, P. 3
(৬) ঐ ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
(৭) Barni—Tarikh-i-Firoz Shahi (Susil Gupta Edition), P. 101
(৮) Moreland—Agrarian System, P. 32.
(৯) ঐ পৃঃ ৭০
(১০) ঐ পৃঃ ৩২
(১১) ঐ পৃঃ ১০১
(১২) Moreland—"India at the death of Akbar", P. 269.
(১৩) Marx—British Rule in India, P. 21.—Socialist Book Club Edition.
(১৪) Barni—Tarikh-i-Firoz Shahi., P. 92—94.
(১৫) ঐ পৃঃ ১৬২
(১৬) Moreland—Agrarian System, P. 144.
(১৭) গোপাল হালদার—"বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা," পৃঃ ১৩৬
(১৮) Tapankumar Roychowdhury—Bengal under Akbar and Jahangir, P. 23, P. 50,—footnote.
(১৯) J. N. Sarkar—History of Bengal,—Vol. II, P. 216—20.
(২০) Radhakamal Mukherji—The Economic History of India (1600—1800) P. 76.
(২১) ঐ পৃঃ ৭৬-৭৭
(২২) N. K. Sinha—Economic History of Bengal—from Plassey to Permanent Settlement, P. 137—43
(২৩) ঐ পৃঃ ১৪১
(২৪) R. P. Dutt—India Today, Indian Edition (1947), P. 85.
(২৫) Panikkar—"A Survey of Indian History", P. 152
(২৬) ঐ পৃঃ ১৫৭, ১৬৫
(২৭) K. K. Dutta—"Studies in the History of the Bengal Subah" P. 94, 95.
(২৮) Dyakov—"The National Question & British Imperialism"— Review Article, 'Communist', No 4, 1949.
(২৯) Panikkar—A Survey of Indian History.
(৩০) ক্ষিতিমোহন সেন—ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা—পৃ: ২১, ২৩
(৩১) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব—পৃঃ ২২, ২৯

প্রথম অধ্যায় ॥

কোম্পানীর আমল

(১৭৫৭—১৮১৩)

সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর থেকে বাঙলার মাটিতে শুরু হয় বিদেশীর শাসন।

এখন থেকে যে যুগের সূচনা হল বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক অভিধানে তাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তীকালীন ঐতিহাসিক পর্বটিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকাল বলে ধরা হয়ে থাকে।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম সনদ লাভ করে। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দেড়শো বছর ধরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল মূলত একটি বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে কোম্পানীর নেতৃত্বে ভারতে "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল···রাজদণ্ডরূপে"।

বাঙলার ধন-জন-প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ইংরেজের হস্তক্ষেপের ফলে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশের মধ্যে সামাজিক অগ্রগতির যে লক্ষণগুলি দেখা যাচ্ছিল তা বিদেশ থেকে আগত এক দারুণ ঝড়ের ঝাপ্টায় বন্ধ হয়ে গেল। মুঘল যুগের অন্ধকার দিনগুলিতে দেশীয় এক বুর্জোয়াশ্রেণীর যে বিবর্তন-সম্ভাবনা দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল, সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে তা ছিল অতি তাৎপর্যপূর্ণ এক ঘটনা। ইংরেজ কোম্পানীর হস্তক্ষেপের ফলে এই দেশীয়

বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যুত্থানের সকল সম্ভাবনা দূর হল। এই বিষয়টি সম্পর্কে রজনী পাম দত্ত মন্তব্য করেছেন—"অপেক্ষাকৃত উন্নত শিল্পরীতি, সামরিক সাজ-সজ্জা এবং সামাজিক রাজনৈতিক সংযোগের অধিকারী, অপেক্ষাকৃত উন্নত, ইওরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিদের সঙ্কটের দিনে ভারত-অভিযান বিবর্তনের এই স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করিয়া দিয়া উহাকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করিল। ফলে পুরাতন ব্যবস্থার ধ্বংসের পর যে বুর্জোয়া শাসন ভারতে দেখা দিল, তাহা পুরানো ব্যবস্থার কাঠামোর ভিতর বিকাশোন্মুখ ভারতীয় বুর্জোয়ার শাসন নহে। তাহা হইল বিদেশী বুর্জোয়ার শাসন। পুরানো সমাজের বুকের উপর এই বিদেশী বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের কর্তৃত্ব জোর করিয়া চাপাইয়া দিল এবং অভ্যুত্থানশীল ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বীজ পর্যন্ত ধ্বংস করিয়া দিল"। (১)

শুরু হল ভারত-ইতিহাসের সেই মর্মান্তিক কাহিনী—যখন থেকে ভারতের সমাজ বিকাশের নিয়ম ভারতের স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে বিদেশী ব্রিটিশ বাণিজ্যপতি ও পরে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থে পরিচালিত হতে থাকল।

বাঙলা লুণ্ঠন

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের কাছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে, ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে, ও ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে কোম্পানী কুঠি স্থাপন করে।

বাংলা দেশে ঢাকা শহরে কোম্পানী কুঠি স্থাপন করে ১৬৬৮ সালে আর কলকাতায় কোম্পানীর কাজ শুরু হয় ১৬৯৮ সালে।

ভারতের উপরোক্ত কেন্দ্রগুলি থেকে কোম্পানী সাধারণত এই দেশে উৎপন্ন কতকগুলি কৃষিজাত ও শিল্প-জাত পণ্য ক্রয় করত এবং সেই পণ্য ইওরোপে চালান দিত। এই সময়ে ইওরোপে গন্ধক, নীল, লঙ্কা ও অন্যান্য মশলার খুব চাহিদা ছিল। তাছাড়া, সুরাটের ক্যালিকো, ঢাকার মসলিন ও মুর্শিদাবাদের সিল্কেরও চাহিদা ছিল প্রচুর।

অবশ্য প্রথম থেকেই কোম্পানীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল পক্ষপাতদুষ্ট। এই সময়ে স্থলপথ বা নদীপথে পণ্যদ্রব্য আনা-নেওয়ার

সময় দেশীয় বণিকদের এক ধরনের আভ্যন্তরীন শুল্ক দিতে হত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাহ্‌জাহানের কাছ থেকে এই সুবিধা আদায় করল যে তারা যে পণ্যদ্রব্য এদেশ থেকে রপ্তানি করবে বা এদেশে আমদানি করবে তার ক্ষেত্রে এই আভ্যন্তরীন শুল্ক দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

একবার এই সুবিধা পাওয়ার পরে কোম্পানী ক্রমশই নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হতে থাকল। এই সময়ে দেশীয় বণিকেরা পারস্য সাগর পার হয়ে নিজেদের জাহাজে পণ্যদ্রব্য চালান দিত। ইংরেজ দস্যুরা এদের উপর লুটপাট আরম্ভ করল। ভারতে ডাচ, ফরাসী ও আর্মেনিয়ান জাতির যে বণিকেরা বাণিজ্য করত ইংরেজরা তাদের উপরও অত্যাচার শুরু করে।

'কোম্পানীর বাণিজ্যের' নামে বিশেষ আর এক ধরনের দুর্নীতি দেখা দিল। বাদশাদের ফারমান পেয়ে কেবল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই বিনাশুল্কে বাণিজ্য করত তা নয়; কোম্পানীর কর্মচারী, তাদের আত্মীয়-স্বজন, এমনকি কোম্পানীর এদেশীয় গোমস্তারা পর্যন্ত ব্যক্তিগত বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করত এবং কোম্পানীর দস্তকের (বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার পরোয়ানা) অপব্যবহার করে তারাও যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করত। সমুদ্রপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করা কোম্পানীর ছিল প্রধান কাজ। কোম্পানীর কর্মচারীদের বহির্বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করার অধিকার ছিল না। তারা আভ্যন্তরীন বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করত। মুর্শিদকুলি খাঁ কোম্পানীর দস্তক দেখিয়ে কর্মচারীরা যাতে বাণিজ্য করতে না পারে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। (২) আলিবর্দি খাঁও এই দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সিরাজদৌল্লা যখন নবাব হলেন তখন দস্তক নিয়ে এই দুর্নীতি আরও ব্যাপক হয়। সিরাজ এই দুর্নীতি বন্ধ করার জন্যে ইংরেজদের আদেশ দিলেন। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। ইংরেজ কর্মচারীরা এই ন্যায্য আদেশ উপেক্ষা করে গায়ের জোরে এই দুর্নীতি চালাতে চেষ্টা করল। সিরাজের সঙ্গে পলাশীতে ইংরেজদের যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল—এই দস্তক নিয়ে দুর্নীতি।

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের পর থেকে কোম্পানীর লুণ্ঠন অবাধে বেড়ে চলতে থাকে। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পাওয়ার ফলে কোম্পানীর দুর্নীতি এখন সকল সীমা লঙ্ঘন করল। মীরজাফর সন্ধিসূত্রে ইংরেজ কোম্পানীর "বাণিজ্যগত সুবিধাগুলি" রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পলাশীর পরে

লবণ, সুপারী ও তামাক যা এতদিন ইওরোপীয়দের বাণিজ্যের জন্য নিষিদ্ধ ছিল তাও ইংরেজদের জন্য উন্মুক্ত হল। (৩) এর পরে মীরকাশিম যখন বাংলার নবাব হলেন তখন কোম্পানীর দুর্নীতি ও কোম্পানী কর্মচারীদের যথেচ্ছাচার চরম আকার ধারণ করে। (৪) কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত এক চিঠিতে বাঙলা লুণ্ঠনের এই কাহিনী মীরকাশিম নিজেই ব্যক্ত করেছেন—

"প্রত্যেক পরগণায়, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক কুঠিতে, কোম্পানীর গোমস্তারা কেনাবেচা করে লবণ, সুপারী, ঘি, চাল, খড়, বাঁশ, মাছ, চট, আদা, চিনি, তামাক, আফিম এবং আরও অনেক পণ্যদ্রব্য। এই সব পণ্যের সংখ্যা এত বেশী যে তার প্রত্যেকটির নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয় এবং উল্লেখ করার প্রয়োজনও নেই।" (৫) কি ভাবে এই কেনা-বেচা চলে তার পরিচয় দিয়ে তিনি ঐ চিঠিতে আরও লিখেছেন—"কোম্পানীর এজেণ্টরা রায়ত ও ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্র আসল দামের এক চতুর্থাংশ দিয়ে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মারপিট ও অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে রায়ত প্রভৃতিকে এক টাকার জিনিস পাঁচ টাকায় নিতে বাধ্য করে।"

মীরকাশিম জানালেন—কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রতিনিয়ত শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার ফলে বছরে প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকার আয় থেকে নবাব বঞ্চিত হয়ে থাকেন।

সর্বশেষে, মীরকাশিম অনুযোগ করলেন যে কোম্পানীর কর্মচারীদের বাণিজ্যের নামে দস্যুগিরির ফলে দেশে শাসন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

মীরকাশিম এই দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হন।

ইংরেজ শাসনের অনুরাগী হয়েও ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত কোম্পানীর এই দস্যুবৃত্তির নিন্দা করতে ভাষা খুঁজে পাননি। তিনি লিখেছেন—

"অস্ত্রবলের সাহায্যে বিদেশী বণিকদের এই ধরনের চরম দাবি উপস্থিত করার উদাহরণ—ইতিহাসে বোধ হয় আর একটিও নেই···মীরকাশিমের অপরাধ—তিনি এই ধরনের দাবির বিরোধিতা করেন এবং তারই ফল হয় যুদ্ধ।" (৬)

মীরকাশিম যখন দেখলেন যে ইংরেজদের অত্যাচারে দেশীয় বণিকেরা মৃতপ্রায়, রাজকোষ একেবারে শূন্য, তখন আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসাবে তিনি

ইংরেজ বণিক বাণিজ্যক্ষেত্রে যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করত তা রহিত করে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন—ইংরেজ বণিকদের মত দেশীয় বণিকদেরও আর আভ্যন্তরীন শুল্ক দিতে হবে না।

জাতিগর্বী মনোভাব থেকে তিনি ঘোষণা-পত্র জারী করলেন—

"আমি অবগত হয়েছি যে আমার নিজের দেশের বেশির ভাগ বণিক দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ব্যবসা ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকতে ও বেকার থাকতে বাধ্য হয়েছে। এই অবস্থায় এই ধরনের লোকদের হিত ও শান্তির জন্যে আমি সমস্ত বাণিজ্যশুল্ক, চৌকিদারী মরগণ, নবনির্মিত নৌকার উপর কর, এবং জল ও স্থলের উপর ধার্য অন্যান্য ছোটখাট কর দু'বছরের জন্য রহিত করছি।" (৭)

মীরকাশিমের এই কাজ শুধু যে দেশীয় বণিকদের স্বার্থ রক্ষা করেছিল তাই নয়, জাতির জীবনে যখন ঘোর দুর্যোগ উপস্থিত সেই মুহূর্তে ভারতের জাতীয় সম্মান রক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

মীরকাশিমের পরাজয়ের পরে কোম্পানীর পথের শেষ কাঁটা অপসারিত হল। আবার মীরজাফরকে ইংরেজরা সিংহাসনে বসাল। মীরজাফর মীরকাশিমের শুল্ক রহিত পরোয়ানা প্রত্যাহার করলেন। ইংরেজরা আবার বাণিজ্যের নামে দস্যুগিরি করার অধিকার পেল, পূর্বতন সুবিধাগুলি ছাড়াও বাঙলা দেশে উৎপন্ন চা, বাঙলা দেশে আমদানীকৃত সমস্ত লবণ, পান আর তামাকের উপর কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার সাব্যস্ত হল। এখন থেকে সরকারীভাবে দেশীয় আভ্যন্তরীন বাণিজ্যের উপরেও কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। (৮)

বাঙলার দেওয়ানী লাভের পরে কোম্পানীর সামনে একটানা দস্যুবৃত্তির যে সুযোগ উপস্থিত হল এবং এই দস্যুবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে কোম্পানী এ-দেশ থেকে বিলাতে কত টাকা পাঠাতে পেরেছিল তার হিসাব-নিকাশ করেছেন স্বয়ং ক্লাইভ সাহেব। ১৭৬৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে লিখিত এক পত্রে তিনি জানান—

"আমি যতদূর হিসেব করে দেখেছি···আগামী বছরে আপনাদের রাজস্বের পরিমাণ ২৫০ লক্ষ সিক্কার কম হবে না···অন্তত আরও বিশ ত্রিশ লক্ষ বেশিই হবে।

নবাবের (বাঙলার নবাব) ভাতা ইতিমধ্যেই কমিয়ে ৪২ লক্ষ টাকায় দাঁড় করানো হয়েছে। বাদশাকে (মুঘল সম্রাট) দেয় করও হ্রাস করার ফলে দাঁড়িয়েছে ২৬ লক্ষ টাকায়। কাজেই কোম্পানীর ১২২ লক্ষ টাকা সোজাসুজি লাভ থাকবে।"

এই টাকা আর এর সঙ্গে কোম্পানীর বড়-ছোট-মাঝারি সর্বস্তরের কর্মচারীদের বে-আইনী বাণিজ্য, ঘুষ ও নজরানার টাকা যোগ দিলে যা দাঁড়ায় তারই মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বাঙলার বুক নিঙড়ে কোম্পানীর বাণিজ্য করার কুখ্যাত কাহিনী।

কোম্পানীর আমলে জনসাধারণ

কোম্পানী আমলের আগে শান্তিপুর, ঢাকা, কাশিমবাজারে তাঁতীদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। তারা বছরে ৬ মাস কাজ করত। বাকি ৬ মাস বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাদের সংসার চলে যেত। এই সব শহরে তাঁতীদের কারুর কারুর পাকা বাড়ি ছিল। (৯) দেশে ছড়া প্রচলিত ছিল—

"চরকা আমার সোয়ামী পুত, চরকা আমার নাতি ;
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতি"

এই তাঁতীরা ছিল স্বাধীন। নিজেদের অর্থ তারা শিল্পে নিয়োগ করত এবং নিজেরাই তারা শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রি করত।

কিন্তু কোম্পানী এই সব শিল্পের উপর যখন থেকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল, তখন থেকেই কারিগরদের জীবনে দারুণ দুর্যোগ দেখা দিল।

প্রথমে কোম্পানী তাঁতীদের কাছ থেকে মাল সংগ্রহের জন্যে একদল ঠিকাদার নিয়োগ করত। এই ঠিকাদারেরা কারিগরদের 'দাদন' দিত এবং কারিগরেরা উৎপন্ন দ্রব্য এই ঠিকাদারদের দিতে বাধ্য থাকত। পরে কোম্পানী ঠিকাদারী প্রথা তুলে দেয় এবং গোমস্তার সাহায্যে মাল সংগ্রহ করতে থাকে। এখন থেকে গোমস্তারা কোম্পানীর পক্ষ থেকে কারিগরদের দাদন দিতে শুরু করল। যারা এই দাদন নিত তাদের বাজার দর থেকে শতকরা ১৫ ভাগ, এমন কি কখনও কখনও শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত কম দরে মাল বিক্রি করতে হত। কাজেই তাঁতীরা কোম্পানীর গোমস্তাদের কাছে মাল বিক্রি করতে চাইত না।

গোমস্তারা এই সময়ে তাঁতীদের এক ধরনের মুচলেকা সই করিয়ে নিত—এই মুচলেকা অনুযায়ী তারা কোম্পানীকে মাল বিক্রি করতে বাধ্য থাকত। যারা এই মুচলেকা দিতে রাজি হত না, তাদের চরম শাস্তি দেওয়া হত। এমনকি, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে কারিগরদের আঙুল কেটে দেওয়া হত। (১০)

ছোট-বড়-মাঝারি কোনো রকমের কারিগরের কোম্পানীর গোমস্তাদের হাত থেকে রক্ষা ছিল না। কোম্পানীর এজেন্টরা তাদের প্রায়ই অবরুদ্ধ করে রাখত, লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখত, জোর করে অনেক টাকা জরিমানা আদায় করত, বেত দিয়ে প্রহার করত, তাদের জাত-ব্যবসা থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা করত।

কোম্পানী-শাসনের কয়েক বছরের মধ্যেই বাঙলার তাঁতশিল্প চরম সংকটের সম্মুখীন হল। সমৃদ্ধিশালী শহরগুলো বন্য পশুর বাসভূমিতে পরিণত হল।

ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করেছেন—তিনি যখন মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেন তখন তিনি দেখে স্তম্ভিত হন যে শহরটি লণ্ডনের মতই বৃহৎ, জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী। বরং তিনি আশ্চর্য হলেন এই দেখে যে এখানকার বড়লোকদের মধ্যে অনেকে লণ্ডনের বড়লোকদের চেয়েও বেশী সম্পত্তিপন্ন। (১১) ইংরেজ যখন বাঙলায় দেওয়ানী পেল, তখন নাটোর, নদীয়া, দিনাজপুর বর্ধমান প্রভৃতির রাজারাও ধনে-জনে বেশ সম্পত্তিপন্ন ছিলেন।

কিন্তু ইংরেজ শাসনের স্পর্শে এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকল।

১৭৬০ সালে কোম্পানী বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার এবং পরে সমগ্র বাঙলা দেশের রাজস্ব আদায়ের ভার পায়।

কোম্পানী ভার পেয়েই প্রচলিত রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত পরিবর্তন করে দেয়।

বহু পুরাকাল থেকে বাঙলা দেশে 'জমিদার' নামে এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হয়েছিল। তাদের কাজ ছিল কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা এবং খাজনার একটি নির্দিষ্ট অংশ নবাবের কাছারিতে জমা দেওয়া।

নিজ নিজ এলাকায় এই 'জমিদারদের' দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। তাঁরা ছিলেন প্রজাদের দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতা। প্রজাদের ওপর 'জমিদারদের' অত্যাচার ছিল যথেষ্ট। তবে তখনকার দিনে 'জমিদার' ও প্রজার মধ্যে এক

ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠত। প্রজাদের সঙ্গে তারা দোল-দুর্গোৎসব, ঈদ-মহরম, পীর-পূজা, ধর্ম-পূজার সমারোহে মেতে উঠত। সাধারণ প্রজাদের মঙ্গলের জন্মে তারা খাল কাটত, বাঁধ বাঁধত, রাস্তা-ঘাট তৈরি করত, মন্দির মসজিদ প্রতিষ্ঠা করত, গোঁসাই ফকিরদের দয়া করত, কবি-ধর্মপ্রচারকদের রাজসভায় ডেকে এনে পুরস্কৃত করত, স্থাপত্য-সৌকর্যে গ্রাম-নগর সুসজ্জিত করে তুলত। এইভাবে পুরানো দিনের বাঙলায় জমিদারতন্ত্রের অত্যাচারের পাশাপাশি একটা উদারতার দিকও ফুটে উঠত।

মুঘল আমলে 'জমিদারেরা' উত্তরাধিকারসূত্রে খাজনা আদায়ের অধিকার ভোগ করত। মুর্শিদকুলি খাঁ, আলিবর্দি বা মীরকাশিমের আমলে জমিদারদের উপর যথেষ্ট পীড়ন চলত একথা ঠিক, কিন্তু জমিদারদের উপর সাময়িক জুলুম থাকলেও জমিদারী কেড়ে নেওয়ার কোন রেওয়াজ তখন ছিল না। (১২)

কোম্পানী ক্ষমতা পেয়েই পুরানো 'জমিদার'দের অধিকারে হস্তক্ষেপ করল। এখন থেকে প্রতি বছরে জমি বন্দোবস্ত করার জন্মে নীলাম ডাকা হত। নীলামে যে ব্যক্তি সব চেয়ে বেশী পরিমাণ খাজনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিত কোম্পানী তাকেই খাজনা আদায়ের ভার দিত। ফলে, একদল দুর্ধর্ষ নর-পিশাচের আবির্ভাব হল যারা কোম্পানীর অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে প্রজাদের কাছ থেকে জুলুম করে তাদের শেষ কাণাকড়িটি পর্যন্ত কেড়ে নিতে আরম্ভ করল। পুরানো দিনের জমিদারেরা প্রজা পীড়নে ও খাজনা আদায়ে নতুন নর-পিশাচদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না। ফলে তাদের জমিদারী একে একে হাত-ছাড়া হয়ে যেতে লাগল।

নাটোর, নদীয়া, দিনাজপুর, বর্ধমান—একে একে পুরানো যুগের প্রায় প্রত্যেকটি বংশ কোম্পানীর শাসনের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ভেঙে পড়ল।

প্রথমেই নদীয়ার রাজার কথা ধরা যাক্। ১৭৮৫ সালে কোম্পানীর কাছে নদীয়া রাজের খাজনা বাকি পড়ে। নদীয়া রাজকে জমিদারীর কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়। কোম্পানী খাজনা আদায়ের জন্মে একজন ট্রাস্টির হাতে জমিদারীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেয়। রাজাকে মাত্র দশ হাজার টাকার ভাতায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়। (১৩)

দিনাজপুরের রাজবংশও পুরানো অভিজাত বংশগুলোর অন্যতম। এই বংশের রাণী সরস্বতী কোম্পানীর শাসনের সঙ্গে কোনোদিন বন্ধুত্বস্থাপন করতে পারেনি। রাণীর বিরাট ক্ষোভ ছিল—তাঁর পূর্ব-পুরুষেরা ছিলেন স্বাধীন রাজা আর কোম্পানীর শাসনে রাজারা সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন, কোম্পানীর স্থানীয় এজেন্টদের দয়ার উপর সর্বদা নির্ভরশীল। ১৮০০ সালের মধ্যে এই বংশেরও প্রায় সব কিছুই নীলাম হয়ে যায়। এমনকি অবস্থা এতই খারাপ হয়ে দাঁড়ায় যে মালিকেরা ঋণের দায়ে রাজ-বাড়ির বাইরে বেরুতে সাহস পেতেন না। (১৪)

নাটোরের রাজবংশ (১৫) কোম্পানীর আমলের আগে সারা বাঙলার জমিদারদের আদর্শস্থানীয় ছিল। নাটোরের রাণী ভবানীর দান-ধ্যানের খ্যাতি সারা বাঙলায় সুবিদিত ছিল। কিন্তু কোম্পানীর আমলে এই রাণী ভবানীর উপরও নির্যাতন চলল। তাঁর জীবদ্দশায় বাড়ি ঘেরাও করা হল। ১৮৯৩ সালে রাজসাহী ডিভিশনের কমিশনার হ্যারিংটন সাহেব বাকি খাজনার দায়ে নাটোরের রাজাকে রাজবাড়িতে বন্দী করেন। (১৫)

ঠিক এমনিভাবেই বর্ধমানের রাজার উপরও অকথ্য পীড়ন চলে। বীরভূমের রাজাকে ও বিষ্ণুপুরের রাজাকে বাকি খাজনার দায়ে হাজতবাস করতে হয়।

কোম্পানী-সৃষ্ট নতুন রাজস্ব-ব্যবস্থায় শুধু জমিদারেরা ক্ষতিগ্রস্ত হল না, একেবারে সর্বস্বান্ত হল বাঙলার কৃষককুল।

মুঘল আমলে কৃষকদের উপর অত্যাচার ছিল না তা মোটেই নয়। তবে শত অত্যাচার সত্ত্বেও মুঘল আমলে জমির নির্দিষ্ট খাজনা ছাড়া বে-আইনী কর বা আবয়াব আদায় আইন-সম্মত কাজ বলে গণ্য হত না। সত্য বটে, মুর্শিদকুলি খাঁ আবয়াব আদায় আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর পরবর্তীরা আবয়াবের পরিমাণ বাড়িয়ে চলেন। কিন্তু কোম্পানীর আমলে বাঙলার কৃষকদের কাছ থেকে যে পরিমাণ খাজনা আদায় করা হয় তা আগের আমলের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করল। (১৬)

কোম্পানীর মূল লক্ষ্য ছিল কিভাবে কত বেশী টাকা এই দেশ থেকে শুষে নেওয়া যায়। স্থানীয় জমিদারেরা কোম্পানীর ইচ্ছামত টাকা আদায় করতে অভ্যস্ত ছিল না। তারা তাই কোম্পানীর লোভের খোরাক জোগাতে পারল না। তখন তারা এই জমিদারদের অগ্রাহ্য করে একদল আদায়কারী

কর্মচারী বা আমিল নিয়োগ করল। এই আমিলেরা নির্দিষ্ট জেলায় খাজনা আদায়ের ভার পেল। তারা নির্দিষ্ট জেলা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিল। এই অবস্থায় যে-ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী খাজনা আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিত তাকেই খাজনা আদায়ের ভার দেওয়া হত। এই আদায়কারীরা প্রতি বছরের জন্যে নিযুক্ত হত। কাজেই তারা ভাবতে থাকল যে আগামী বছরে তারা আদায়ের ভার নাও পেতে পারে। ফলে এক বছরের মধ্যে যত বেশী হারে খাজনা আদায় করা সম্ভব তারা তাই করতে থাকল।

বলাই বাহুল্য, এই আমিলদের ওপর অধিক হারে খাজনা আদায়ের যে ভার পড়ল তা তারা কৃষকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আদায় করল। তারা কৃষকদের উপর নতুন করে আবয়াবের বোঝা চাপাতে থাকল। (১৭)

এই অবস্থায় কৃষক ও গ্রামবাসীরা ঋণের দায়ে সর্বস্বান্ত হল। খাজনার ভয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। কেউ কেউ ডাকাতের দলে নাম লেখাল।

এই সময়ে কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন—

"মীরজাফরের সময়ে আবয়াব আদায়ের প্রশ্নটি কৃষকদের সহ্যের সমস্ত সীমা অতিক্রম করল।...... এই সময়ে কৃষকদের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ছিল গ্রাম থেকে পলায়ন।...স্বভাবত কৃষকেরা সহজে গ্রামের মায়া ছাড়তে চাইত না। তবে গ্রাম থেকে পলায়ন যে কৃষকদের হাতে একটি অতি শক্তিশালী অস্ত্র ছিল এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কার্যত এই পলায়ন ছিল ষ্ট্রাইকের সামিল।" (১৮)

শেষ পর্যন্ত কোম্পানী ও তার দেশীয় অনুচরদের হৃদয়হীন অত্যাচারের ফলে দেশে দেখা দেয় এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। বাঙলা দেশের লোকের কাছে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলে পরিচিত।

১৭৬৯ সালের এই শোষণের জাঁতাকলে বাঙলার গ্রামবাসীর পাঁজর ক'খানা যখন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে দেখা দিল অজন্মা। ফলে সারা দেশে হাহাকার শুরু হল। শেষে হাহাকার দুর্ভিক্ষে গিয়ে পৌঁছল, মাত্র ৯ মাসের মধ্যে স্থানীয় জনসংখ্যার ৩ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ১ কোটি লোকের মৃত্যু হল। ১৭৭০ সালের দারুণ গ্রীষ্মে যমে-মানুষে এক ভয়ঙ্কর লড়াই শুরু হল। গ্রামবাসীরা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের বিক্রি করে দিল,

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলে-মেয়ে কেনার লোক মিলল না। তারা গাছের পাতা আর ঘাস খেতে থাকল। খবর পাওয়া গেল—যারা জীবিত তারা মৃত ভক্ষণ করছে। (১৯)

কিন্তু এত বড় দুর্ভিক্ষও বিদেশী ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারল না। ১৭৭০-৭১ সালে দুর্ভিক্ষ যখন চরমে ওঠে সেই বছরেও কোম্পানী কৃষকদের কাছ থেকে আগের বছরের তুলনায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বেশি খাজনা আদায় করে। তার পরের বছরে খাজনা আদায় করা হয় আরও ১৩ লক্ষ টাকা বেশি। এই অধিক খাজনা আদায় করা হয় এক ধরনের জুলুমের মধ্যে দিয়ে। কোম্পানী স্থির করে যে, যে-সব গ্রামে কৃষকেরা মারা গেছে বা পালিয়ে গেছে তাদের বাকি খাজনা যারা বেঁচে আছে তাদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। এই অন্যায় জুলুমটির নাম 'নাজাই কর।' (২০)

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস নতুন করে পাঁচ বছরের জন্যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এ-বারেও অর্থের লোভে একদল লোভী ইজারাদার নিয়োগ করা হল, যারা সবচেয়ে বেশী খাজনা আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিল তাদের মধ্যে থেকে। এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অত্যন্ত চড়া হারে ইজারাদারেরা কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা ও আবয়াব আদায় করতে থাকল। কৃষকদের উপর তাদের অত্যাচার এত চরমে উঠল যে ১৭৮৩ সালে রংপুর ও দিনাজপুরে শেষ পর্যন্ত কৃষকেরা মরীয়া হয়ে ইজারাদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

ইংরেজরা ক্রমশ দেখল যে ইজারাদারী ব্যবস্থার ফলে কোম্পানী যতটা লাভ করতে পারবে ভেবেছিল তা পারল না। কেননা ইজারাদারেরা কৃষকদের ঠেঙিয়ে লাল হল বটে, তবে তারা কোম্পানীকে ফাঁকি দিতে সচেষ্ট ছিল। কাজেই রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ শোষণের প্রয়োজন অনুভূত হল।

এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হল বহু-নিন্দিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। ১৭৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে লিখিত একটি স্মারকলিপিতে ফ্রান্সিস জমিদারদের জমির মালিকানা স্বত্ব অর্পণ করার সুপারিশ করেন। (২১) ১৭৯৩ সালে লর্ড

কর্ণওয়ালিসের সময়ে সরকারীভাবে জমিদারদের এই মালিকানা স্বত্ব অর্পণ করা হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে স্বীকৃত মূল নীতিটি—অর্থাৎ জমির উপর জমিদারদের মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃতির নীতিটি—বাঙলার ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি মূলগত পরিবর্তন আনল। মুঘল আমলে ভারতে যে জমিদারী ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল আর এখন যে জমিদারী ব্যবস্থা প্রচলিত হল—এই দুইয়ের জাত একেবারে আলাদা। (২২)

মুঘল আমলে জমিদারদের জমির উপরে কোনো মালিকানা স্বত্ব ছিল না। তারা ছিল রাষ্ট্রের প্রাপ্য অংশ অর্থাৎ খাজনা আদায়কারী মাত্র।

মুঘল যুগে জমির উপর মালিকানা না থাকলেও দখলী স্বত্ব ছিল কৃষকদের। রাষ্ট্র জমির মালিক ছিল না। জমির উপর প্রধান অধিকার ছিল তার যে জমি কর্ষণ করত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এইদিকে অগ্রগামী পরিবর্তনের সূচনা না করে পশ্চাৎ-গামী পরিবর্তনের সূচনা করল। কৃষকদের যে অধিকার ছিল তা সর্বাংশে কেড়ে নিয়ে জমিদারদের মালিকানা স্বত্ব দেওয়ার ফলে কৃষকেরা শক্তিশালী জমিদারের অর্ধদাসে পরিণত হল।

কোম্পানী একান্ত সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে এই ভূমি ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও তারা ইতিহাসের যন্ত্র হিসাবে কাজ করল। অর্থাৎ জমির উপর পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব, জমিকে পণ্যদ্রব্য হিসাবে দেখা, জমি কেনা-বেচা ইত্যাদি আধুনিক ব্যবস্থাগুলি যা হিন্দুস্থানে গ্রামীণ সমাজে কখনও গড়ে ওঠেনি সেইগুলির পত্তন করল কোম্পানী এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাহায্যে।

দাস-সমাজের গোড়াপত্তন

বাঙলার স্বাধীন সামন্ত সমাজের বনিয়াদটি ভেঙে ফেলে তার উপরে নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী এক নতুন পরাধীন সমাজের কাঠামো তৈরি করার জন্যে এইবারে কোম্পানী সচেষ্ট হল।

কোম্পানীর বড়কর্তারা ক্রমশই অনুভব করতে লাগল যে সমগ্র দেশটার ওপর যদি স্থায়ীভাবে ও আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে শোষণ চালাতে হয় তা হলে

কোম্পানীর শাসনেরও একটি সামাজিক ভিত্তি প্রয়োজন। তাই শুরু হল দেশের ভিতর এমন কতকগুলি সামাজিক স্তরের সৃষ্টি করা যা কোম্পানীর আমলকে এদেশে বাঁচিয়ে রাখতে তৎপর থাকবে।

প্রথমেই কোম্পানী-সৃষ্ট নতুন জমিদার শ্রেণীর কথা ধরা যাক।

আগেই দেখেছি প্রথমে হেষ্টিংসের নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা ও পরে কর্ণওয়ালিস্ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পুরানো জমিদার বংশগুলো ধ্বংসপ্রায় হয়ে উঠল। এখন এই বংশগুলোর দুর্দশার সুযোগ নিয়ে একদল ভাগ্যান্বেষী নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করতে লাগল। এই ভাগ্যান্বেষীরা ছিলেন অধিকাংশই কোম্পানীর এজেণ্ট—কোম্পানীর দেওয়ান, সেরেস্তাদার, মুৎসুদ্দি, গোমস্তা, বেনিয়ান, দালাল ইত্যাদি।

রীতিমত রাজনৈতিক কারণে যে কোম্পানী মুঘল আমলের জমিদারদের ধ্বংস সাধন করতে চেয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে।

এই সময়ে বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে স্থানীয় পুরানো জমিদারেরা ইংরেজ শাসন পত্তনের বিরোধিতা করেন এবং তাঁরা অনেক সময়ে স্থানীয় জনতাকে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতেন। তাই ১৭৬০ সালে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত জমিদারদের সম্পর্কে গভীর সন্দেহ পোষণ করতে থাকেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসেরও পুরানো জমিদারদের সম্পর্কে গভীর সন্দেহ ছিল। তাই তিনি একটি বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন—"বড় বড় জমিদারেরা তাঁদের প্রচণ্ড প্রভাব ব্যবহার করে থাকেন সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেইজন্তই তাঁদের প্রভাব নষ্ট করা একটি বাঞ্ছনীয় কাজ।" (২৩)

হেষ্টিংস প্রথমে কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল নতুন এক শ্রেণীর জমিদার সৃষ্টির কাজে হাত দেন। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থায় এই কৌশল আরও পরিপূর্ণতা লাভ করে।

রীতিমত রাজনৈতিক কারণে যে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি তা ভারতের গভর্ণর লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-১৮৫৩) একটি সরকারী বক্তৃতায় খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন—

"গণ-বিক্ষোভ বা গণ-বিপ্লব থেকে নিরাপত্তা রক্ষার দিক থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটা বিশেষ মূল্য আছে। এই বন্দোবস্ত অন্তান্ত অনেক দিক

থেকে এবং অনেক মূল বিষয়ে একেবারে নিরর্থক হলেও ব্রিটিশ আধিপত্যের উপর নির্ভরশীল এক ধনী জমিদার-গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছে।" (২৪)

নব-সৃষ্ট জমিদার পরিবারগুলোর জন্মের ইতিহাস থেকেই ইংরেজের এই উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। প্রথমেই কাশিমবাজারের রাজ-পরিবারের উৎপত্তির কথা ধরা যাক। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু ওয়ারেন হেষ্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। হেষ্টিংসের কৃপায় নাটোরের রাজার জমিদারীর কিছুটা আত্মসাৎ করে তিনি বিরাট জমিদারীর মালিক হন।

হেষ্টিংসের অনুগ্রহে তাঁর মুন্সী নবকিষণ কলকাতার সবচেয়ে বড় জমিদার রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ইনিই শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন হুগলী থেকে কলকাতা, সুতানটী, গোবিন্দপুরে এসে বসতি স্থাপন করল, তখন তাদের সঙ্গে হুগলীর একদল সুবর্ণবণিক এল কলকাতায়। এই সুবর্ণবণিক সমাজের একজন প্রধান লক্ষ্মীকান্ত ধর ওরফে নকু ধর কোম্পানীকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করেন। ইনিই আবার প্রথম মারাঠা যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্যে ইংরেজকে নয় লক্ষ টাকা সাহায্য করেন। কোম্পানী তাঁর পৌত্রকে 'মহারাজা' উপাধিতে সম্মানিত করেন। এই লক্ষ্মীকান্তের বংশধরেরাই কলকাতার প্রসিদ্ধ পোস্তার রাজপরিবার। (২৫)

কাঁদি ও পাইকপাড়ার জমিদার বংশের ইতিহাসও একই ধরনের। পলাশীর যুদ্ধের আগে এই বংশের রাধাকান্ত সিংহ সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন ও ইংরেজকে সরকারী দলিলপত্র দিয়ে সাহায্য করেন। এই বংশের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন হেষ্টিংসের প্রধান সহায়, কাজেই কোম্পানীর অনুগ্রহে তাঁদের সম্পত্তি ও সম্ভ্রম বেড়ে চলল।

এই রকমের আরও অনেক উদাহরণই দেওয়া চলে। পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর পরিবার, জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার, বড়বাজারের মল্লিক বংশ, সিমলার ছাতুবাবুর বংশ, হাটখোলার দত্ত পরিবার—এই সব বংশেরও সম্পত্তি ও সমৃদ্ধি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুগ্রহে।

এই ইংরেজ-পুষ্ট জমিদারদের পাশাপাশি ইংরেজের অনুগ্রহ-প্রার্থী একদল দেশীয় ব্যবসায়ীর (Comprador Bourgeoisie) আবির্ভাব হয়। প্রতিপত্তি-শালী জগৎশেঠ পরিবার সংকীর্ণ স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে কোম্পানীকে

অর্থ সাহায্য করতে থাকেন। এই পরিবারের আর্থিক সাহায্য ছাড়া ক্লাইভের ষড়যন্ত্র কার্যকরী হত কিনা সন্দেহ। এই পরিবারের দেশদ্রোহী কাজের জন্য মীরকাশিম তাদের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করেন। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর থেকে এই বংশের দুর্বল-সুলভ দাস্যতা আরও বৃদ্ধি পেল।

কোম্পানীর আর একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন উমিচাঁদ। তিনিও কোম্পানীকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করতেন।

মাদ্রাজে দুর্দিনে ইংরেজদের সহায় ছিলেন চেট্টীরা, আর উত্তর ভারতে ছিলেন সুরাটের নাথজীরা।

কিন্তু কোম্পানীর আমলে শেঠদের স্বাধীন বণিক হিসাবে মর্যাদা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। সরকারী কাগজে ও বিদেশী কোম্পানীর শেয়ারে টাকা গচ্ছিত রাখাই এখন তাঁরা নিরাপদ ভাবলেন।

অর্থবান বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা ব্যবসাক্ষেত্র সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেননি, তাঁরা বিদেশী কোম্পানীগুলির দালালী করে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করলেন।

অর্থবান বাঙালীরা এই সব বিদেশী ফার্মকে টাকা ধার দিতেন। এই সব ফার্মের দেওয়ান, বেনিয়ান, সদর-মেট, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি হলেই তাঁরা সৌভাগ্য বলে মনে করতেন।

"বেনিয়ানরা ছিলেন ফার্মের ইন্টারপ্রেটার, প্রধান হিসাব রক্ষক, প্রধান সম্পাদক, প্রধান দালাল, মহাজন, অর্থরক্ষক, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিশ্বাস-ভাজন কর্মচারী।...ইংরেজ প্রভুত্ব এদেশে কায়েম হওয়ার পর থেকে প্রধান প্রধান হিন্দু পরিবারের লোকেরা এই চাকরী পাবার জন্যে বেশ উৎসুক থাকতেন"। (২৬)

অবশ্য কয়েকজন অর্থবান বাঙালী স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার কথাও ভাবলেন। এই দিক থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টা সবচেয়ে প্রশংসনীয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "কার টেগোর এণ্ড কোম্পানী" ও "বেঙ্গল কোল কোম্পানী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জনৈক সমসাময়িক লেখক মন্তব্য করেছেন—"দ্বারকানাথের আগে অর্থবান নেটিভদের ব্যবসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ইংরেজ ফার্মের বেনিয়ান হবার সৌভাগ্য অর্জন করা, বিলাতী কুঠির মহাজন হওয়া

অথবা মুৎসুদ্দি হয়ে ঐ সব কুঠির হুকুম তামিল করা এবং দস্তুরী পাওয়া—এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এই সময় বাঙালী অর্থবানদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।" (২৭)

কিন্তু দ্বারকানাথের প্রচেষ্টাও সফল হল না। কোম্পানী সৃষ্ট দাস পরিবেশে স্বাধীন ব্যবসার কোনো সুযোগ ছিল না।

এই পরিবেশে যারা ভাগ্যবান তারা জমিদার হল, বাকি যারা তারা হয় ইংরেজ ব্যবসায়ীদের দালালী নয় কোম্পানীর অধীনে ছোট-খাটো চাকরি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হল।

কোম্পানীর অধীনে সেরেস্তাদার বা দেওয়ান হওয়াই সবচেয়ে বড় পদ-মর্যাদা বলে বিবেচিত হত। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারী ও দেশীয় কর্মচারীদের বেতনে অদ্ভুত তারতম্য সৃষ্টি করা হত। সেরেস্তাদারের পদমর্যাদা সম্পর্কে একজন ইংরেজ লেখক মন্তব্য করেছেন—

"সেরেস্তাদার সব ক্ষেত্রেই জেলার সবচেয়ে প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। বিচার বিষয়ে জজের থেকেও তাঁর কাজ অনেক বেশী অপরিহার্য। কিন্তু এই প্রভাব ও দায়িত্বশীলতা সত্ত্বেও সেরেস্তাদারের মাসিক মাইনে একশো টাকা। অথচ জজের মাসিক মাইনে ২৫০০৲ টাকা।" (২৮) লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় থেকে এই তারতম্যের নীতি আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হল। 'নেটিভ' মুন্সেফ, 'নেটিভ' পুলিশ, 'নেটিভ' অফিসার এবং সাহেব কর্মচারীদের মাইনেতে অদ্ভুত তারতম্য সৃষ্টি করা হল।

ক্রমশ যে দাস পরিবেশ সৃষ্টি হল তাতে এ দেশীয় অভিজাত শ্রেণীর একটা অংশ গা ভাসিয়ে দিলেন। কাশীর চ্যারিটি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জয়নারায়ণ ঘোষাল দেশীয় রাজাদের উপর ব্রিটিশ জয়কে অভিনন্দন জানাতে এক আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করেন। (২৯) দুর্গোৎসবের সময়—রাজা রামচন্দ্র, মধুসূদন সুন্দুল, রাজা রাজকিষণ, রাজা নবকিষণ প্রভৃতির পরিবার নাচগানের ব্যবস্থা করে সাহেব মনিবদের তুষ্ট করতে ব্যস্ত থাকতেন। (৩০)

এইভাবে কোম্পানী দাস মনোভাবাপন্ন লোকদের নিয়ে এদেশে এক দাস সমাজের ভিত্তি রচনা করল। তবে যারা এই সময়ে আত্মবিক্রয় করেছিল বিদেশী প্রভুদের কাছে, তারা ছিল দেশের জনসংখ্যার এক মুষ্টিমেয় অংশ। সমগ্র জাতির চোখে এই অংশ, বিদেশী শাসনের আশ্রিত জন, জাতির দুশমন।

এই অভিজাত শ্রেণী ছিল বিদেশী ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী ক্লাইভ, হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিসের হাতের ক্রীড়নক। উপরোক্ত বিবেকহীন ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের শাসনকাল শঠতা, প্রবঞ্চনা, আর চুক্তিভঙ্গের কাহিনীতে কলঙ্কিত। কোম্পানীর দেশীয় অনুচরেরা এই কলঙ্কের অংশভাগী।

মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম একদিকে বাঙলার এই কলঙ্ক-লিপ্ত ইতিহাস আর একদিকে বিবেকহীন বিদেশী শাসকের শঠতা ও প্রতিশোধ-স্পৃহার এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

এইভাবে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮১৩ সাল—এই অন্তর্বর্তীকালের মধ্যে স্বাধীন সামন্ত সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তে বাঙলার মাটিতে দেখা দিল এক হৃদয়হীন দাস-সমাজ ও স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্র—বিদেশী স্বার্থে যার রূপায়ণ, বিদেশী স্বার্থে যার নিত্য-নৈমিত্তিক পরিচালনা। এই নতুন ব্যবস্থার অত্যাচার মুঘল যুগের অত্যাচারকে হার মানাল। মুঘল যুগে নবাব জমিদারেরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করে যে টাকা আত্মসাৎ করত তা বিলাসে নিয়োজিত হলেও দেশের টাকা দেশেই থাকত। কিন্তু এখন থেকে ভারতের টাকা বিদেশে চালান যেতে লাগল। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ক্ষয়িষ্ণুতার চরম সীমায় গিয়ে পৌছাল। ভারতের সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, অথচ নতুনতর কোনো উৎ-পাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠল না। বাঙলার সামন্ত সমাজের নিশ্চল বাঁধুনির মধ্যেও যেটুকু জীবনীশক্তি অবশিষ্ট ছিল বিদেশী শাসনের স্পর্শে সেটুকুও নিভে গেল। বাঙলা হল মহাশ্মশান।

হিন্দুস্থানের এই গভীর মর্মবেদনা অনবদ্য ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন কার্ল মার্কস একটি মাত্র ছত্রে—

"ভারত হারাল তার পুরানো জগৎ, কিন্তু নতুন জগতের আস্বাদ থেকেও সে রইল বঞ্চিত।"

—এইখানেই মার্কসের প্রধান আক্ষেপ।

॥ গ্রন্থ নির্দেশিকা ॥

(১) R. P. Dutt—India To-day, P. 85
(২) N, K. Sinha—Economic History of Bengal—P. 67-69
(৩) ঐ —পৃ: ৬৮

(৪) N. K. Sinha—Economic History of Bengal —P. 69
(৫) R. C. Dutt—The Economic History of British India, Under Early British Rule—P. 23
(৬) ঐ —পৃঃ ৩১
(৭) K. K. Datta—Studies in the History of Bengal Subah—P. 335 (foot note)
(৮) ঐ —পৃঃ ৩৫০-৬৭
(৯) Rohinimohan Chaudhuri—The Evolution of Indian Industries —P. 35
(১০) Bolts—Considerations on Indian affairs—P. 194-197
(১১) Indian Industrial Commission Report
(১২) Kisory Chand Mitra—The Rajas of Rajshahi—'Calcutta Review' 1873
(১৩) ঐ —The Nadia Raj—'Cal. Review' 1872
(১৪) Westmacott—The Dinajpur Raj—Calcutta Review, 1872
(১৫) K. C. Mitra—The Rajas of Rajshahi,—Calcutta Review, 1873
(১৬) Ramkrishna Mukherji—The Rise & Fall of East India Company —P. 204
(১৭) J. C. Sinha—Economic Annals of Bengal—P. 93-95
(১৮) Ramsbotham—Studies in the Land Revenue History—P. 15
(১৯) J. C. Sinha—Economic Annals of Bengal—P. 98
(২০) ঐ —পৃঃ ১০২-৩
(২১) রঞ্জিত গুহ—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত—'পরিচয়ে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য
(২২) Marx—Permanent Settlement—"New Age" (Monthly), June, 1953
(২৩) Introduction to the Fifth Report
(২৪) Speech of Lord William Bentinck—quoted in R. P. Dutt—India To-day—P. 192-193
(২৫) Benimadhav Chatterji—A Short Sketch of Maharaja Sukhamoy Bahadur & his family—P. 1-3
(২৬) "Calcutta in Olden Time"—'Calcutta Review', 1860
(২৭) Kissori Chand Mitra—Memoirs of Dwarkanath Tagore—P. 12
(২৮) J. C. Marshman—The Efficiency of Native Agency in Govt. Employ —Calcutta Review, 1848
(২৯) Asiatic Journal, 1818
(৩০) Asiatic Intelligence, 1816

কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

(১৭৫৭-১৮১৩)

জনকয়েক সুবিধাভোগীর কাছে কোম্পানীর শাসন 'বিধাতার আশীর্বাদ' বলে মনে হলেও, সারা জাতির কাছে এই শাসন ছিল এক বিরাট দুর্ঘটনা।

কোম্পানীর আমলে ভারতের সমাজ বিকাশের স্বাধীন ধারাটি যতই বাধা পেতে থাকল, ততই কোম্পানীর শাসনের সঙ্গে সমগ্র জাতির বিরোধ উপস্থিত হতে থাকল।

বিদেশী শাসনের সঙ্গে জনসাধারণের এই বিরোধ নানাভাবে প্রকাশ পেল। নবাব, জমিদার, বণিক, কারিগর, কৃষক—সকলেরই অল্প-বিস্তর কোম্পানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল।

সিরাজদ্দৌলা

পলাশীর যুদ্ধের আগেই কোম্পানীর কার্যকলাপ বাঙলার নবাবের বিরক্তি উৎপাদন করে। ১৭৩৯ খ্রীঃ ৯ই জানুয়ারী ইংরেজদের কলকাতাস্থিত প্রধান কর্মচারী বারওয়েল সাহেব নবাব দরবার থেকে একখানি চিঠি পান—

"হুগলীর সৈয়দ, মোগল, আরমানি প্রভৃতি বণিকগণ অভিযোগ করিয়াছেন যে, তোমরা নাকি তাঁহাদের বহু লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যপূর্ণ কয়েকখানি জাহাজ লুট করিয়া লইয়াছ,.........আমি তোমাদিগকে বাণিজ্য করিতেই অধিকার দিয়াছি, দস্যুতা করিতে ক্ষমতা প্রদান করি নাই। এই রাজাদেশ পাইবামাত্র

তোমরা যদি সহজে এই ক্ষতিপূরণ না কর, তবে আমি বিশেষ কঠিন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিব।" (১)

এই সময়ে বাঙলার নবাব ছিলেন আলিবর্দী খাঁ। আলিবর্দী অন্তিম শয্যায় সিরাজকে উপদেশ দেন—

"ইংরাজদিগকে দমন করিতে পারিলে, অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকেরা আর মাথা তুলিয়া উৎপাত করিতে সাহস পাইবে না। ইংরাজদিগকে কিছুতেই দুর্গ নির্মাণ বা সৈন্য সংগ্রহ করিবার প্রশ্রয় দিও না;—যদি দাও, এ দেশ আর তোমার থাকিবে না। (২)

সিরাজ বৃদ্ধ পিতামহের এই উপদেশ ভোলেননি। তাই সিরাজ সিংহাসনে বসার পরে যখন শুনলেন যে ইংরেজরা কলকাতায় দুর্গ নির্মাণে ব্যস্ত, তখন তাদের হুঁশিয়ার করে দেন এই বলে—

"শুনিলাম তোমরা নাকি আমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, কলিকাতার নিকটে দুর্গ নির্মাণ করিতেছ? আমি কিছুতেই এরূপ কার্যের প্রশ্রয় দিতে পারিব না।...মনে রাখিও—আমিই এদেশের নবাব; যদি দুর্গ প্রাচীর চূর্ণ করিতে ত্রুটি হয়, তবে কিছুতেই আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।" (৩)

ইংরেজ বণিকেরা নবাবের আদেশে এক মুচলেকা স্বাক্ষর করতে বাধ্য হল। এই মুচলেকা পত্রে তারা সামরিক প্রস্তুতি ও ব্যবসাক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রশ্রয় বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কিন্তু ইংরেজ বণিক মুচলেকা-পত্রের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে পুনরায় আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করল। কলকাতায়, হুগলী ও চন্দননগরে তাদের যুদ্ধসজ্জা চলতে লাগল। সিরাজের সঙ্গে তারা বার বার সন্ধি করল এবং বার বার সন্ধি-শর্ত ভঙ্গ করল। ইংরেজের এই ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে সিরাজ লিখলেন :—

"তোমরা নাকি পাঁচখানি অতিরিক্ত যুদ্ধজাহাজ আনাইয়াছ এবং আরও আনাইবার চেষ্টায় আছ।......ইহা কি বীরোচিত অথবা ভদ্রজনোচিত ব্যবহার?...এই ত সেদিন সন্ধি করিয়াছ! এই অল্প দিনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কি ভদ্রনীতি? মহারাষ্ট্রীয়দিগের (এখানে বর্গীদের বাঙলা আক্রমণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে) বাইবেল নাই,—কিন্তু তাহারা ত সন্ধি লঙ্ঘন করে না।" (৪)

বার বার এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরে নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধেরই নাম হল পলাশীর যুদ্ধ।

পলাশীর যুদ্ধ সিরাজের দিক থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, বাঙলার চোখে এই যুদ্ধ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ, ন্যায় যুদ্ধ।

পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পরে সিরাজ বন্দী হন এবং ইংরেজের প্ররোচনায় তাঁকে হত্যা করা হয়।

মীরকাশিম

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পরে ইংরেজ মীরজাফরকে বাঙলার নবাবের গদিতে বসাল। মীরজাফর তাঁদের সঙ্গে সন্ধিপত্রের নামে এক দাসখতে স্বাক্ষর দিলেন। সন্ধিপত্রে মীরজাফর ঘোষণা করলেন ইংরেজের স্বার্থের প্রতি ক্রীতদাসসুলভ আনুগত্য। এই দাসখতে স্বীকার করে নিলেন—ইংরেজের যারা শত্রু (ভারতীয় অথবা ইওরোপীয়) বাঙলার নবাবেরও তারা শত্রু।

মীরজাফরের চরম দাসত্ব সত্ত্বেও তিনি লোভী ইংরেজের মনস্তুষ্টি সাধন করতে পারলেন না। অযোগ্যতার অজুহাতে তাঁকে অপসারণ করে ইংরেজরা তাঁরই জামাতা মীরকাশিমকে সিংহাসনে বসালেন।

কিন্তু মীরকাশিম ছিলেন বুদ্ধিমান, সাহসী এবং দেশপ্রেমিক।

মীরকাশিম ইংরেজকে ঘৃণা করতেন এবং ইংরেজের অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। মীরকাশিম সিংহাসনে বসেই ইংরেজের বিরোধিতা করেন নি। নবাবের কর্মচারীরা কোম্পানীর কর্মচারীদের অত্যাচারের যে-সব বিবরণী পাঠাতেন, তাতে তাঁর পক্ষে নিঃশব্দে সব কিছু সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

নবাবের কর্মচারীরাও জনসাধারণের দুর্দশা যতই স্বচক্ষে দেখতে লাগল ততই তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়তে লাগল। ক্রমে ক্রমে কর্তব্যের খাতিরে তারাও কোম্পানীর অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদ করতে লাগল, অনেক ক্ষেত্রে তারা এই জুলুম বন্ধ করার জন্য কোম্পানীর কর্মচারীদের শাস্তি দিত।

১৭৬২ সালে ৭ই অক্টোবর তারিখে এলিস নামক এক ইংরেজ কোম্পানী-কর্তৃপক্ষকে কলকাতায় লিখিত এক চিঠিতে জানালেন—

"কাপড়ের প্রধান আড়ত ইসানাবাদে আমাদের গোমস্তা ও দালালদের কাপড় কিনতে নিষেধ করে এক হুকুম জারি হয়েছে এবং তাদের এই স্থান পরিত্যাগ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ যে ধোপীরা পরিষ্কার করত তাদের প্রহার দেওয়া হয়েছে এবং এই ধোপীরা যাতে কাজ করতে না পারে তার জন্যে তাদের পিছনে লোক নিয়োগ করা হয়েছে।" (৫)

ঢাকা ফ্যাক্টরীর প্রধান কর্মকর্তা কলকাতায় জানালেন যে "প্রত্যেক চৌকীতে আমাদের নৌকা থামানো হয়, আমাদের লোকজনকে অপমান করা হয়, এবং আমাদের পতাকার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাসূচক কথাবার্তা বলা হয়। স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে যে ইংরেজদের সঙ্গে তারা কোনো রকমের সম্পর্ক রাখবে না।" (৬)

ঢাকার নবাবের রাজস্ব আদায়কারী মহম্মদ আলী সন্দীপ পরগণার আমিনকে লিখে জানালেন—"কোনো ইংরেজকে সহ্য করবে না এবং ইংরেজ নামধারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে শাস্তি দেবে।" (৭)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে নবাব-কর্মচারীদের ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রাজস্ব আদায়কারী, ফৌজদার, জমিদার, চৌকীদার, প্রভৃতি নবাব কর্মচারীরা কোম্পানীর এজেন্টদের বিরুদ্ধে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তার প্রতি নবাবের নিশ্চয়ই সমর্থন ছিল।

মীরকাশিম ইংরেজের এই ঔদ্ধত্য বেশীদিন স্বীকার করলেন না এবং ইংরেজ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। পর পর কাটোয়ায়, গিরিয়ায়, উধুয়ানালায়, মুঙ্গেরে ও পাটনায় মীরকাশিম ইংরেজের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু পরাজিত হন। শেষে তিনি বাঙলা ছেড়ে দিল্লীতে পালিয়ে গেলেন এবং ফকিরের বেশে অবশিষ্ট জীবন কাটালেন।

দেশের সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে মীরকাশিমের এই সংগ্রাম বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় ঐতিহ্য হিসাবে চিরদিন অক্ষয় থাকবে সন্দেহ নেই।

তাঁতী ও মালঙ্গীদের সংগ্রাম

কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারী শাসনকে বাঙলার শ্রমজীবী জনসাধারণও মেনে নেয়নি। পশ্চিম ভারতে ব্রোচ ও বরোদাতে তাঁতীরা একটি পুরোদস্তুর 'মিউটিনি' বা ষ্ট্রাইক সংগঠিত করেছিল এইরকমের সংবাদ পাওয়া যায়। (৮) ঢাকা বা মুর্শিদাবাদের তাঁতীরা বিদ্রোহ করেছিল বা ষ্ট্রাইক করেছিল এই রকমের নজীর নেই। তবে বাঙলা দেশের তাঁতীরা কোম্পানীর গোমস্তাদের অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য হত অথবা তাঁতের কাজে ইস্তফা দিয়ে কৃষির কাজ বেছে নিতে বাধ্য হত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। (৯) হাজার হাজার তাঁতীর মৌন প্রতিরোধের ফলে বাংলার সমৃদ্ধিশালী তাঁত ব্যবসাটি ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যায়—এই স্বাক্ষর ইতিহাস বহন করছে।

শুধু মৌন প্রতিরোধ কেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঙলা দেশের তাঁতীরা সক্রিয় প্রতিরোধের পন্থাও অবলম্বন করত। এই দিক থেকে শান্তিপুরের তাঁতীদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কোম্পানীর কর্মচারীরা যে মূল্যে তাদের কাছ থেকে মাল কিনতে চাইত তাতে তাদের পড়তায় পোযাত না।

তাছাড়া কোম্পানীর এজেন্টদের নির্দিষ্ট মূল্যে মাল বিক্রি না করলে তাঁতীদের কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতে অবরুদ্ধ করে রাখা হত, এমন কি এই রকমের অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে সময়ে বন্দী তাঁতীদের মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হত। এই দুঃসহ অবস্থার প্রতিরোধ করতে তাই তাঁতীরা অগ্রসর হয়েছিল। (১০)

তারা একযোগে জানিয়ে দিতে থাকল যে তারা কোম্পানীর জন্যে কাজ করবে না। এই সময়ে তাদের মধ্যে অভূতপূর্ব ঐক্য ও সৌহার্দ্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল। শিঙা বাজিয়ে তারা প্রতিদিন এক জায়গায় এসে জড়ো হত এবং নিজেদের অভিযোগের কথা নিয়ে তারা আলোচনা করত। কোম্পানীর এজেন্টরা এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ভাঙতে বদ্ধপরিকর হল। তারা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করল—"রাজদ্রোহী নেতাদের অবরুদ্ধ কর"। এবং যে উপদেশ, সেই কাজ। শান্তিপুরের তাঁতীদের ৯ জন প্রধান প্রধান নেতাকে অবরুদ্ধ করা হল। (১১) এই তাঁতীদের যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁরাও ছিলেন তাঁতী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গরীব তাঁতী। (১২)

তাঁতীদের মত মালঙ্গীরাও কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। মেদিনীপুরে লবণ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল তমলুক ও হিজলী। লবণের বাণিজ্য ছিল কোম্পানীর একচেটিয়া। কাজেই এখানে কোম্পানীর অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। কোম্পানীর অধীনে এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল হিজলীতে ৭,৫৫৬ জন ব্যক্তি অথবা পরিবার, এবং তমলুকে ৫,৮৩২ জন ব্যক্তি বা পরিবার। (১৩)

কোম্পানীর এজেন্টদের বিরুদ্ধে মালঙ্গীদের নানা রকমের অভিযোগ ছিল। ন্যায্য দর না দিয়ে নামমাত্র মূল্যে তাদের কাছ থেকে কোম্পানীর কর্মচারীরা মাল ছিনিয়ে নিয়ে যেত। মালঙ্গীরা কোম্পানীর কলকাতাস্থিত কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন—গত পাঁচ বছর ধরে তারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে আসছেন যে তাঁদের ওজনে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে (যা পাওনা তার দ্বিগুণ পরিমাণ লবণ নেওয়া হয়) কিন্তু এতদিনেও তার কোন প্রতিকার হয়নি। স্থানীয় সাহেব চ্যাপমানের কাছে মুৎসুদ্দি, কয়াল, সাহবন্দর প্রভৃতির অসাধু আচরণের কথা জানাতে তাঁরা যান। কিন্তু সাহেবের নাজির তাদের নিজ ঘরে জোর করে বন্দী করে রাখে ও চার পাঁচ দিন বন্দী অবস্থায় তাদের অনাহারে কাটাতে হয়। তারা আরও জানালেন—শোনা যায় তহুরী, দস্তুরী ও বাজে মাঙ্গা প্রভৃতি বেআইনী। কিন্তু এই সব বেআইনী অর্থ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (দারোগা, সাহাবন্দর প্রভৃতি) আদায় করে চলেছে। এর থেকে তাদের নিষ্কৃতি নেই। (১৪)

১৭৯৪ সালে লিখিত একখানি আরজিতে হিজলীর মালঙ্গীরা জানালেন—আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্গতি নেই। দেনা করে সংসার চালাতে বাধ্য হচ্ছি। অভাবে অনাহারে বহু মালঙ্গীর মৃত্যু হয়েছে। অনেকে জাতি-ভ্রষ্ট হয়েছে। বহু মালঙ্গী ব্যবসা ছেড়ে পালিয়েছে। অনেকে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। (১৫)

মালঙ্গীদের অসহযোগিতার কথা জানিয়ে তুরুদমনানের জনৈক দারোগা বড় কর্তাদের জানাচ্ছেন—

"গত বছরে চৈত্র ও বৈশাখ মাস থেকে এই পরগনার আজুরা মালঙ্গীরা লবণ উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। তারা ২৪ গরগণার মুরাগাছায় পালিয়ে গেছে এবং সেখানকার জনসাধারণ তাদের আশ্রয় দিয়েছে।" (১৬)

ক্রমশ মালঙ্গীদের মধ্যে নেতারও আবির্ভাব হতে থাকে। পরমানন্দ সরকার নামে জনৈক ব্যক্তি ও তাঁর ভ্রাতা কাঁথিতে মালঙ্গীদের সংগঠিত করেন। এই পরমানন্দ সম্পর্কে কোম্পানীর এক কর্মচারী লিখেছেন (১৭)—

পরমানন্দ সরকারের নেতৃত্বে মালঙ্গীরা প্রথমে মফঃস্বলে যায় এবং সেখানে নিম্নশ্রেণীর মালঙ্গীদের জমায়েত করে। প্রায় তিন শো জন একসঙ্গে হৈ চৈ করতে করতে আমার কাছারিতে এসে হাজির হয়। অবিলম্বে তাদের দাবি পূরণের জন্যে তারা জিদ ধরে এবং ভয় দেখায় যে দাবি পূরণ না হলে তারা কাজ করবে না।

তিনি আরও জানিয়েছেন—জানতে পেরেছি বিভিন্ন অঞ্চলে পরমানন্দ সরকার ও তাঁর ভাইয়ের প্ররোচনায় আরও বহু মালঙ্গী প্রস্তুত হচ্ছে। পরমানন্দ সরকার ও তাঁর ভাই···মালঙ্গীদের নিয়ে একটি বিদ্রোহ সংগঠিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

কৃষক বিদ্রোহ

বাঙলার কৃষক কোম্পানী-আমলের অনাচার মুখ বুজে সহ্য করেছিল মনে করলে ভুল হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে কৃষকেরা অনেক সময় অভাব অভিযোগের কথা জানাত, কিন্তু সদুত্তর তারা পেত না কখনই। ফলে গ্রাম ছেড়ে তারা পালাতে বাধ্য হত, নয়তো চরম পন্থা হিসাবে বিদ্রোহ করত।

এই বিদ্রোহের সংখ্যা এক নয়, দুই নয়, অনেক। তারই মধ্যে প্রধান কয়েকটি বিদ্রোহের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

কোম্পানী দেওয়ানীর অধিকার পাওয়ার পর থেকে কিভাবে পুরানো জমিদারদের অগ্রাহ্য করে সঠিক খাজনা আদায়ের আশায় একদল ইজারাদার নিয়োগ করত তার কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

১৭৮০ সালে দিনাজপুরের রাজা মারা যান এবং তাঁর বিধবা স্ত্রী জমিদারী পরিদর্শন করতে থাকেন। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ জমিদার-কুমার নাবালক এই অজুহাতে জমিদারী পরিচালনার জন্যে দেবী সিংহ নামে জনৈক ব্যক্তিকে এজেন্ট নিযুক্ত করে। এই দেবী সিংহ ১৭৮১ সালের সেটেলমেণ্টের সময়

রংপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বেনামীতে কোম্পানীর আদায়কারী বা ইজারাদার হিসাবে নিযুক্ত হয়। এই অঞ্চলের ইজারাদারী পেয়েই দেবী সিংহ তার অধস্তন একজন জমিদার, নায়েব ও দালালের সাহায্যে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনার নামে নানা প্রকার বে-আইনী কর আদায় করতে থাকে।

অত্যাচারিত কৃষকেরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের মূল অভিযোগগুলি জানিয়ে আবেদন পত্র পেশ করে। তারা জানায় তাদের প্রধান অভিযোগ হচ্ছে স্থানীয় ইজারাদারেরা তাদের কাছ থেকে গত দু' বছর ধরে ৫ আনা করে 'দিরীনউইল্লা' নামে এক ধরনের বে-আইনী ট্যাক্স আদায় করে। তা'ছাড়া, ৩ আনা করে তাদের কাছ থেকে বাটা আদায় করা হয়। এ-ছাড়া, এ-বছরের জমার উপরে আরও দু' আনা করে বেশি ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে। (১৮)

তাদের মর্মান্তিক অবস্থা জানিয়ে তারা আরও লিখল—খাজনার দায়ে "আমরা গরু-বাছুর বিক্রি করেছি, মেয়েদের গায়ে যা-কিছু সামান্য অলঙ্কার ছিল তাও বিক্রি করেছি। তারপরে আমরা ছেলে-মেয়েদেরও বিক্রি করেছি। আজ আমাদের দেহ ছাড়া আর কিছুই সম্বল নেই। তবুও নায়েব, তহশীলদারদের অত্যাচারের শেষ নেই। তারা আমাদের বাড়িতে ঢুকে আমাদের প্রহার করছে, বাঁশে বেঁধে মারছে, ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিচ্ছে। (১৯)

১৭৮৪ সালে সরকারের পক্ষ থেকে যে কমিশন নিয়োগ করা হয় তারাও এই অত্যাচারের কথা স্বীকার করেন। তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে গ্রামবাসী-কাছ থেকে এই সময় দিরীনউইল্লা, বাটা এবং টাকা প্রতি সাড়ে আট আনা বে-আইনী ট্যাক্স আদায় করা হয়েছিল। (২০)

এই অত্যাচার যখন চলছিল তখন রংপুরের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। মুদ্রার অভাব এই সময়ে এত চরম আকার ধারণ করে যে চাষীদের কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের কেনাবেচা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। (২১) ফলে তাদের পক্ষে খাজনা দেওয়া এমনিই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এই অবস্থায় আবার যোগ হল দেবী সিংহের অত্যাচার। কৃষকেরা শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে উঠল। খাজনা আদায়কারীদের তারা ঘেরাও করল, তাড়া করল। বিদ্রোহীরা জনকয়েক শত্রুস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করল। তারা

ঘোষণা করল—আর খাজনা দেবে না। রংপুরের কৃষকদের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে, বিশেষ করে দিনাজপুর ও কুচবিহারের কৃষকদের মধ্যে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। বিদ্রোহীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং বিদ্রোহের প্রধান নেতা দিরজী নারায়ণকে নবাব বলে ঘোষণা করল। (২২)

বিদ্রোহ ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। কর্তৃপক্ষ সৈন্য নিয়োগ করে বিদ্রোহ দমন করতে সচেষ্ট হয়। লেফটেনেন্ট ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের নেতৃত্বে একটি সিপাহী বাহিনী বিদ্রোহ দমন করার জন্যে পাঠানো হয়। বিদ্রোহী বাহিনী ও সিপাহী বাহিনীর মধ্যে পাটগ্রামের কাছে ১৭৮৩ সালের ২২শে ফেব্রুরারী তারিখে এক সংঘর্ষে বিদ্রোহী বাহিনী পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বিদ্রোহী পক্ষের ৬০ জন লোককে কোম্পানীর সৈন্যেরা নিহত করে এবং বহু লোক হয় আহত, নয় বন্দী হয়। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে প্রধান পাঁচজনকে নির্বাসিত করা হয়। (২৩)

এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও সরকারী রাজস্ব নীতির উপর এই বিদ্রোহের প্রভাব পড়ল। ইজারাদারী ব্যবস্থা বন্ধ করার প্রয়োজন অনুভূত হল। এর পরে খাজনা আদায়ের জন্যে সরাসরি জমিদারদের সঙ্গে সরকার চুক্তি করল এবং পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হল।

বাঁকুড়ায় প্রজা বিদ্রোহ

গ্রান্ট তাঁর "ভিউ অব দি রেভিনিউজ অব বেঙ্গল" নামে পুস্তকে লিখেছেন—"বাঁকুড়া হল বাঙলা দেশের বিখ্যাত চোরের আড্ডা।"

এই অঞ্চলগুলি বর্গীর হাঙ্গামায় শ্রীহীন হয়ে পড়ে। ১৭৭০ সালের মন্বন্তর এই অঞ্চলটিকে একেবারে লোকশূন্য করে তুলেছিল। লোকের অভাবে চাষের কাজ চালানো শক্ত হয়ে উঠল। জমি অকর্ষিত পড়ে রইল। স্থানীয় লোকেরা ভিখারীর জীবন অবলম্বন করতে বাধ্য হল, কেউ কেউ বা অভাবের তাড়নায় সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ বেছে নিল। চাকরি থেকে বরখাস্ত সৈন্যেরা এই সর্বস্বান্ত কৃষকদের সঙ্গে হাত মেলাল। বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের রাজারাও চড়া হারে খাজনা দিতে অপারগ হল। বাকি খাজনার দায়ে বিষ্ণুপুরের রাজাকে হাজতবাস করতে হল।

অসন্তুষ্ট বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীর প্রতিরোধ ক্রমশ বিদ্রোহের আকার ধারণ করতে থাকল। হাণ্টার সাহেব এই সম্পর্কে লিখেছেন (২৪)—১৭৮৫ সালে মে মাসে মুর্শিদাবাদের কলেক্টর জানালেন যে 'বিরাট সশস্ত্র জনতার' সঙ্গে অ-সামরিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব। তাই তিনি সামরিক বাহিনী পাঠাবার জন্তে সুপারিশ করেন। এই সশস্ত্র জনতার সংখ্যা তিনি হাজারেরও বেশি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে জানাচ্ছেন—বীরভূমে রাজকীয় রাজস্বের উপর মাঝপথে হামলা করে বিদ্রোহীরা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। নীলকুঠিগুলো ছেড়ে সাহেব মালিকরা চম্পট দিয়েছে। ইত্যাদি।

বীরভূমের মত বিষ্ণুপুরেও কৃষকদের বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। সর্বসমেত বিদ্রোহী কৃষকদের হাণ্টার সাহেব সংখ্যা হিসাব করেছেন—"পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি।" (২৫) বিষ্ণুপুরের বিশৃংখলাকে হাণ্টারের মতে রীতিমত একটি বিদ্রোহ বলাই সঙ্গত।

এই বিদ্রোহের ফলে কোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ কি হয়েছিল তারও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর হিসাব মত ১৭৮২ সালে মাত্র দু'মাসে কোম্পানীর লোকসান হয় ৬৬৬,৬৬৬ ঃ ১০ ঃ ১০ সিক্কা টাকা। তিনি লিখেছেন—দুমাসে যদি ক্ষতির পরিমাণ এই হয়, তাহলে হিসাব করে দেখ দুবছরে কি ধরনের ক্ষতি হয়েছে কোম্পানীর? (২৭)

চোয়ার বিদ্রোহ

চোয়ার বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কয়েকটি অঞ্চল। চোয়ারেরা ছিল প্রধানত নিম্নশ্রেণীর লোক, জঙ্গলের অধিবাসী, কৃষক। মেদিনীপুরের রাণীর জমিদারীতে যে পাইকান জমি ছিল যুগ যুগ ধরে এই অঞ্চলের পাইকরা ঐ জমি ভোগ-দখল করত। কোম্পানীর আমলে এই জমি কেড়ে নেওয়া হল। আবার এই সময়ে জমির দেয় খাজনা অনেক চড়া হারে ধার্য হল। ফলে স্থানীয় কৃষক, পাইক, সর্দার এবং জমিদার প্রত্যেকের স্বার্থে আঘাত লাগে। কৃষক, পাইক, সর্দার ও জমিদারদের এই বিক্ষোভ ফেটে পড়েছিল চোয়ার বিদ্রোহের (১৭৯৯) মধ্য দিয়ে।

এই বিদ্রোহটির প্রধান কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুর পরগণা। মেদিনীপুর শহর ও তার পার্শ্ববর্তী প্রায় ১২৪টি গ্রাম এই বিদ্রোহের আগুনে জ্বলে উঠেছিল। (২৮) মেদিনীপুরের ট্রেজারী ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারির উপর চোয়ারদের হামলা আশঙ্কা করা হয়েছিল।

মেদিনীপুরের নিকটবর্তী শালবনী গ্রামে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপের অল্প একটু পরিচয় নিচে দেওয়া হল—

"চোয়ারেরা গ্রামটিতে এবং গ্রামের গোলাগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিল।··· গ্রামের সম্পত্তিশালী লোকমাত্রেই গ্রাম ছেড়ে পালাল।··· গ্রামের হিসাব-পত্র যা ছিল সরবরাকর ভক্তরামের বাড়িতে তা নিয়ে অগ্ন্যুৎসব করা হল। এই সময়ে শালবনী ও অন্যান্য গ্রামের জমাবন্দী করার জন্যে পাঠানো হয়েছিল রামচরণ চক্রবর্তী নামে এক আমীনকে। গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে ৫৫ জন তাকে ঘিরে ফেলল এবং তাকে হত্যা করার ভয় দেখাল। আমীন কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচল।" (২৯)

জেলার কালেক্টর সন্দেহ করলেন যে মেদিনীপুরের জমিদার রাণী শিরোমণি এবং নারাজোলের রাজার আত্মীয় চুনীলাল খাঁ চোয়ারদের উৎসাহ দিচ্ছেন। (৩০) তিনি সংবাদ পাঠালেন যে নারাজোল থেকে কর্ণগড়ে রাণীর কেল্লায় মহিষের গাড়িতে করে বার গাড়ি অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলা বারুদ পাঠানো হয়েছে। উপরোক্ত কালেক্টরের মতে রাণী শিরোমণি এই বিদ্রোহে উস্কানি দিচ্ছেন দুটি উদ্দেশ্য থেকে। প্রথমত, তিনি পাইকান জমিগুলি ফিরে পেতে চান। দ্বিতীয়ত, তিনি ভাবছেন এই বিদ্রোহের ফলে কোম্পানী শিক্ষা পাবে এবং কম খাজনায় জমিদারী বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত কর্ণগড়-কেল্লা অধিকারের জন্যে সামরিক কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়। রাণী শিরোমণি, চুনীলাল খাঁ ও নিরু বকসী নামে তিনজন প্রধান ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় পাঠানো হয়। পরে কলকাতা থেকে রাণী শিরোমণি ও তাঁর সঙ্গীদের মেদিনীপুরে বিচারের জন্য ফেরৎ পাঠানো হয়। তাঁরা মেদিনীপুরে ফিরে এসে পুনরায় বিদ্রোহে ইন্ধন জোগাতে থাকেন।

সামরিক বলের সাহায্যে মেদিনীপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে বিদ্রোহের

শক্তি খর্ব করতে পারলেও মফঃস্বল এলাকায় চোয়ারদের বিদ্রোহ পূর্ববৎ চলতে থাকে।

মেদিনীপুরের নিকটবর্তী বাঁকুড়া ও বীরভূমে এই বিদ্রোহ ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হয়।

বীরভূমের সীমান্তে লাল সিং নামে এক চোয়ার সর্দারের নেতৃত্বে প্রায় ৪০০০ কৃষক সমবেত হয়।

বাঁকুড়ায় রায়পুর থানায় এই বিদ্রোহ রীতিমত ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৭৯৮ সালে জুন মাসে ১,৫০০ হাজার চোয়ার রায়পুরে হাজির হয়ে স্থানীয় বাজার ও কাছারীতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং শহরটি দখল করে নেয়। এই অঞ্চলে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে থাকেন রায়পুরের পূর্বতন জমিদার দুর্জন সিং। কোম্পানীর আমলে তাঁর পৈতৃক জমিদারী হাতছাড়া হয়ে পড়ে। তিনি নতুন জমিদারকে এই জমিদারী ভোগ করতে দেবেন না এই প্রতিজ্ঞা করেন। তাঁর নেতৃত্বে চোয়ারেরা অন্তত পক্ষে ৩০টি গ্রামের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়। (৩১) একবার দুর্জন সিংকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁকে বিচারের জন্যে আদালতে হাজির করা হয়। কিন্তু তাঁর বিপক্ষে একটি লোকও সাক্ষী দিতে রাজী হয়নি। ফলে তাঁকে বেকসুর খালাস করে দিতে হয়। জনৈক ইউরোপীয় অফিসারের নেতৃত্বে এই অঞ্চলেও বিদ্রোহ দমনের জন্যে কোম্পানীকে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করতে হয়েছিল।

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, ধলভূম প্রভৃতি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এই বিদ্রোহ দেখা দেয়। চোয়ারদের এই বিদ্রোহ ছিল নিম্ন শ্রেণীর লোকের স্বতস্ফূর্ত অথচ ব্যাপক এক বিদ্রোহ।

এই বিদ্রোহের মূল শক্তি ছিল কৃষক, কিন্তু এই বিদ্রোহে চোয়ার জমিদারেরাও অধিকাংশই সমর্থন জানিয়েছিল। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাঁর রিপোর্টে মন্তব্য করেন—এমন কি তহশীলদার, ইজারাদার, স্থানীয় কর্মচারী, পুলিশ ও দারোগাদেরও আর পুরোপুরি বিশ্বাস করা সমীচীন নয়। (৩২)

এই ব্যাপক বিদ্রোহের ফলে এই অঞ্চলে কোম্পানীর খাজনা আদায় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কোম্পানী পাইকান জমি দখল করার নীতি আপাতত বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

উত্তর বঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ চোয়ার বিদ্রোহের চেয়েও ব্যাপক আকার ধারণ করে। মোটামুটি ১৭৬০ থেকে ১৮০০ অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এই বিদ্রোহ চলেছিল।

১৭৬০ সালে বর্ধমান ও কৃষ্ণনগর থেকে ওয়াট ও হার্ডউইট অনুযোগ করেন যে তাঁরা বর্গীর হাঙ্গামা ও সন্ন্যাসীদের হামলার জন্যে খাজনা আদায় করতে পারছেন না। (৩৩)

১৭৬৩ সালে ক্লাইভ লেখেন যে একদল ফকির ঢাকার কুঠি আক্রমণ করেছে এবং ঐ কুঠি তারা দখল করে নিয়েছে।

১৭৬৯ সালে সন্ন্যাসীরা রংপুর আক্রমণ করে এবং লেফটেনান্ট কীনের নেতৃত্বে পরিচালিত এক সৈন্যবাহিনীকে তারা পরাস্ত করে। কীন তাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন।

১৭৭০ সাল থেকে এই বিদ্রোহ অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১৭৭২ সালে ডিসেম্বর মাসের ৩০শে তারিখে প্রায় ১৫০০ হাজার সন্ন্যাসী রংপুর সহরের সন্নিকটে শ্যামগঞ্জ নামে এক স্থানে জড়ো হয়। ক্যাপ্টেন টমাসের নেতৃত্বে একদল সিপাহী সন্ন্যাসীদের আক্রমণ করলে সন্ন্যাসীরা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে। টমাস সিপাহীদের বেয়নেটের আঘাতে সন্ন্যাসীদের জখম করার আদেশ দিলে তারা সেই আদেশ পালন করতে অস্বীকার করে। সন্ন্যাসীরা ক্যাপ্টেন টমাসকে আক্রমণ করে ও তরবারির আঘাতে তার দেহ ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কিছুদিন পরে সন্ন্যাসীরা ঢাকা শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলে তারা ঢাকায় প্রবেশ করতে পারল না। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কোম্পানী-সৈন্যের যুদ্ধ হয়। এবারেও দেশীয় সিপাই ও তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইংরেজ ক্যাপ্টেনকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে। পরে দেশীয় সেনাপতি এবং তাঁর সমকর্মীকে 'অসৎ আচরণের' দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং কামানের মুখে দাঁড় করিয়ে তোপ দেগে তাদের জীবন নাশ করা হয়। (৩৪)

এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা হিসাবে মজনু শাহ ও তাঁর অনুচরদের যেমন, মুশা শাহ (মজনুর ভাই বা ভাইপো), চেরাগ আলি শাহ, পরাগল শাহ

(মজনুর পুত্র) প্রভৃতির নাম করা চলে। মজনুর সহকর্মীরা ছিলেন প্রধানত মুসলমান ফকির। অপর দিকে এই বিদ্রোহের নেতা হিসাবে হিন্দু সন্ন্যাসীদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

মুসলমান ফকীর ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের সংগঠন আলাদা হলেও এবং কখন কখন তাদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হলেও তারা অনেক সময় মিলিতভাবে আক্রমণ করত। রাজশাহীর কালেক্টর এক রিপোর্টে লেখেন—"ফকিরেরা নিকটে অবস্থিত সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।" (৩৫) ফকিরদের নেতা মজনুর সঙ্গে সন্ন্যাসী নেতা ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ফকির ও সন্ন্যাসীদের কাজের মধ্যে এতই মিল ছিল যে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাদের মধ্যে সব সময়ে পার্থক্য প্রদর্শন করা প্রয়োজন বোধ করত না। তাই তারা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই ধরনের আক্রমণকারী মাত্রকেই 'সন্ন্যাসী' এই সাধারণ নামে অভিহিত করত। সন্ন্যাসীরা স্থানীয় জমিদার ও বণিকদের ওপর মাঝে মাঝে হামলা করলেও তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল কোম্পানী রাজ।

মজনু শাহ নাটোরের রাণী ভবানীর কাছে যে আবেদনপত্র পেশ করেন তাতে তিনি লেখেন—"আমরা বহুদিন যাবৎ বাঙলা দেশে ভিক্ষা করে বেড়াই এবং জনসাধারণের কাছে ভিক্ষা পেয়ে থাকি। আমরা অনেক দিন ধরে বিভিন্ন ধর্মস্থানে ও বেদীতে খোদার উপাসনা করে আসছি এবং আমরা কখনও কাউকে নিন্দা করিনি বা কাউকে নির্যাতন করিনি। তবুও গত বছর ১৫০ জন ফকিরকে বিনা কারণে হত্যা করা হয়েছে।.........ইংরেজরা আমাদের (দল বেঁধে) ধর্মস্থান ও অন্যান্য জায়গায় যেতে দিতে বাধা দেয়। (ইংরেজদের) এই কাজ যুক্তিযুক্ত নয়। আপনি দেশের শাসক। আমরা ফকির। আমরা সর্বদা আপনার মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করে থাকি। আমরা আপনার সাহায্যের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছি।"

এই আবেদন থেকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ব্রিটিশ বিরোধী চরিত্রটি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কার্যক্ষেত্রে সন্ন্যাসীরা স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে যে নানাভাবে সাহায্য পেত তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

বগুড়া জেলায় সিলবারিস পরগণায় লেফটেনাণ্ট টেলর জমিদারদের সমর্থন আছে মনে করে স্থানীয় কয়েকজন জমিদারকে গ্রেপ্তার করেন।

পুর্ণিয়ার অন্তর্গত রামগঞ্জকুঠি আক্রমণের সময় সন্ন্যাসীরা স্থানীয় একজন জমিদারের সাহায্য পায়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করে—এই জমিদার ফকির দলের লোকদের খাদ্য সরবরাহ করে এবং হামলার আগের দিন দিনের বেলায় তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে রাখে। অথচ এই জমিদারই সিপাইদের একটি ছোট দলকেও খাদ্য দিয়ে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিল। (৩৮)

তবে সন্ন্যাসী বিদ্রোহে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সমর্থন ছিল সবচেয়ে বেশি। সন্ন্যাসীদের গতিবিধি এত গোপন থাকে কি করে তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করেছেন—"জনগণের ব্যাপক অংশের উপর তাদের বিরাট প্রভাব রয়েছে।"

ওয়ারেন হেস্টিংস সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে লিখেছেন—"তারা দস্যুগিরি চালায় দাক্ষিণ্যের ভান করে।"

রংপুরের নিকটবর্তী শ্যামগঞ্জের হাঙ্গামার সময় "কৃষকেরা (সিপাইদের) কোন সাহায্য দেয় নি, বরং তারা লাঠি নিয়ে সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দেয় এবং সিপাইদের অস্ত্র শস্ত্র কেড়ে নেয়।" (৩৯)

দিনাজপুর জেলায় মুশা শাহের নেতৃত্বে ফকিরেরা যখন আক্রমণ চালায় তখনও কোম্পানী-কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের কাছ থেকে কোন সাহায্য পায়নি। একটি রিপোর্টে তাই আক্ষেপ করা হয়েছে—"স্থানীয় গ্রামবাসীরা সাহায্য করলে মুশা শাহকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হত। কিন্তু তারা সাহায্য করা দূরে থাকুক—লুটের কাজে অংশ নিয়েছে। গ্রামবাসীরা ফকিরদের রীতিমত সহকর্মী হিসাবে কাজ করেছে।" (৪০)

ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা সন্ন্যাসীদের 'দস্যু' বলে অভিহিত করেছেন। একথা সত্য যে একদল সন্ন্যাসী মুঘল আমলের যুগ থেকেই ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা (military adventurers) হিসাবে কাজ করত। শান্তির সময়ে মহাজনী ব্যবসা বা ধান চালের দালালি করা এবং অশান্তির সময়ে যুদ্ধ করা—এটাই ছিল তাদের কাজ। জমিদারেরা অনেক সময় এই সন্ন্যাসীদের দিয়ে পুলিসের কাজ করাত, তাদের নিজেদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করত।

তবুও উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে শুধুমাত্র এক দস্যু হাঙ্গামা হিসাবে দেখলে ভুল হবে। একথা ঠিক মজনু শাহ বা ভবানী পাঠকের সহকর্মীদের মধ্যে একদল রাজপুত বা পাঠান ছিল। কিন্তু মজনু শাহ, দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠকের শক্তির আসল উৎস ছিল স্থানীয় জনসাধারণ। মজনু এবং ভবানী পাঠকের সহকর্মী ছিল প্রধানত বাঙলার "ছোট লোকেরা"। তাঁরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকেই তাঁদের দলে লোক সংগ্রহ করতেন।

সন্ন্যাসীদলের মধ্যে শৃংখলা ও সন্ন্যাসীদলের নেতা ও সৈন্যদের মধ্যে সদ্ভাব—এই আন্দোলনের জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে। জনৈক বৃটিশ কর্মচারী তাঁদের সম্পর্কে তাই মন্তব্য করেন—ফরাসী প্রজাতন্ত্রের মত তারাও গড়ে তুলেছিল এক শৃংখলাবদ্ধ সন্ত্রাসবাদ। দলের সর্দারদের সৈন্যরা খুব মান্য করত এবং তাদের সম্মান প্রদর্শনার্থে 'হাকিম' বা শাসনকর্তা বলে অভিহিত করত। (৪১)

মোট কথা, কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী আচরণে উত্তরবঙ্গের জনসাধারণের মনে দারুণ বিক্ষোভ জমাট বেঁধে ছিল। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের চোখে কোম্পানী ছিল প্রধান শত্রু, আর এই সন্ন্যাসীরা ছিল কোম্পানীর শত্রু অর্থাৎ শত্রুর শত্রু। এই হিসাবে তারা সন্ন্যাসীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। জনসাধারণের সাহায্য না পেলে ৪০ বছর ধরে এত ব্যাপক বিদ্রোহ সন্ন্যাসী-দের পক্ষে পরিচালনা করা কিছুতেই সম্ভব হত না।

* * * *

কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে বাঙলার জনগণের বিভিন্ন অংশের এই সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই।

বাঙলার জনগণের কাছে সেদিন কোম্পানীর শাসন বিদেশীর শাসন বলে প্রতিভাত হয়েছিল। সিরাজদ্দৌলা ছিলেন দেশের শেষ স্বাধীন নবাব, তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে আপ্রাণ সংগ্রাম করেন। বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের মুক্তি সাধনের জন্যে প্রথম সংগ্রাম ঘোষণা করেন মীরকাশিম। কাজেই তাঁর এই সংগ্রাম তদানীন্তন ঐতিহাসিক পর্বে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃত পক্ষে, মীরকাশিমের সময় থেকেই বাঙলা দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত।

মীর কাশিমের সংগ্রামের আগে বা পরে যে সব স্বাধীনতাপ্রিয় কারিগর ও কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিল, সেগুলির মূল্যও বাঙলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। এই সংগ্রামগুলিও বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন পরিমাণে বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সংগ্রাম এবং সেই হিসাবে এইগুলিও স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত।

অবশ্য আধুনিক অর্থে 'স্বাধীনতা' বলতে আমরা যা বুঝি, সেই ধরনের স্বাধীনতার মর্ম এই পূর্বগামীদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না। এই সংগ্রামগুলির লক্ষ্য (অর্থাৎ বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আঘাত হানা) এক হলেও এই সংগ্রামগুলির মধ্যে কোনো যোগসূত্র ছিল না। মীরকাশিম কোম্পানীর সিপাইদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে পারলেও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি।

কৃষক ও কারিগরদের সংগ্রাম ছিল স্বতস্ফূর্ত, স্থানীয় সংগ্রাম। তদানীন্তন ঐতিহাসিক পর্বে যখন বিদেশী আক্রমণকারীরা লুণ্ঠনকারী দস্যু মাত্র, যখন রাস্তা-ঘাট ও যাতায়াতের ব্যবস্থার একান্ত অভাব, যখন জনসাধারণ মৃতপ্রায় সামন্ত-সমাজের জাঁতাকলে পিষ্ট, যখন আধুনিক সমাজ গঠনের কোনো উপকরণের আবির্ভাব হয়নি, ঠিক সেই অন্ধকার মুহূর্তে এই সংগ্রামগুলির আবির্ভাব হয়েছিল। কাজেই তদানীন্তন ঐতিহাসিক অবস্থায় এই সংগ্রামগুলির মধ্যে অনগ্রসরতা ও সীমাবদ্ধতা অনিবার্য ছিল। এইসব দুর্বলতা সত্ত্বেও এই সংগ্রামগুলি প্রমাণ করল—বাঙলার জনসাধারণ স্বেচ্ছায় কখনও ব্রিটিশ আক্রমণকারীর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। ইংরেজ অনায়াসে বাঙলা জয় করেছিল, বাঙলায় ইংরেজ এসে শান্তিস্থাপন (Pax Britannica) করেছিল, এই ধরণের কতই না গল্প প্রচার করা হয়েছে। বাঙালীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের জন্যে ইংরেজ ঐতিহাসিক বহু চেষ্টাই করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আসল ইতিহাসকে চিরতরে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বাঙলার জনসাধারণ ব্রিটিশ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যে একটানা প্রতিরোধ চালিয়েছিল তা বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় অধ্যায় হিসাবে ভারতবাসী চিরদিন স্মরণ করবে।

॥ গ্রন্থ নির্দেশিকা ॥

(১) অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়—সিরাজদ্দৌলা, পৃঃ ৩১-৩২
(২) ঐ পৃঃ ১০৩-৪

(৩) অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়—সিরাজদ্দৌলা, পৃঃ ১১৩-.৪
(৪) ঐ পৃঃ ২৫৮
(৫) K. K. Datta—History of Bengal Subah, P. 319
(৬) ঐ পৃঃ ৩২০
(৭) ঐ পৃঃ ৩২৩
(৮) Radha Kamal Mukherjee—The Economic History of India, 1600-1800, P. 147
(৯) ঐ পৃঃ ১৪৬
(১০) N. K. Sinha—Economic History of Bengal, P. 168
(১১) ঐ পৃঃ ১৫৮
(১২) ঐ পৃঃ ১৬৯
(১৩) Rohinimohan Chaudhury—The Evolution of Indian Industries, P.22
(১৪) Midnapur Salt Paper, P. 34
(১৫) ঐ পৃঃ ৬৪
(১৬) Midnapur Salt Paper, P. 62
(১৭) ঐ
(১৮) S. B. Choudhuri—Civil Disturbances during the British Rule in India, 1765-1857 P. 61
(১৯) ঐ পৃঃ ৬১
(২০) ঐ পৃঃ ৬৩
(২১) ঐ পৃঃ ৬৪
(২২) ঐ পৃঃ ৬০
(২৩) District Gazetteer, Rangpur.
(২৪) Hunter—"Annals of Rural Bengal", Vol. 1 P. 15.
(২৫) ঐ পৃঃ ৭১
(২৬) ঐ পৃঃ ৭৮
(২৭) ঐ পৃঃ ৮৩
(২৮) J. C. Price—The Chuar Rebellion of 1799
(২৯) ঐ
(৩০) ঐ
(৩১) District Gazetteer—Bankura.
(৩২) Price—The Chuar Rebellion of 1799
(৩৩) J. M. Ghose—"Sannyasi & Fakir Raiders in Bengal"—P. 36
এই বিদ্রোহের অধিকাংশ ঘটনাই উপরোক্ত পুস্তক থেকে গৃহীত।
(৩৪) ঐ পৃঃ ৫৯
(৩৫) ঐ পৃঃ ৬২
(৩৬) ঐ পৃঃ ১০৮-৯
(৩৭) ঐ পৃঃ ৪৭
(৩৮) ঐ পৃঃ ১২৪
(৩৯) ঐ পৃঃ ৫০-৫১
(৪০) ঐ পৃঃ ১০২
(৪১) ঐ পৃঃ ১০
—মারাঠা শিবির থেকে লিখিত ব্রাউটনের পত্রাবলী।

তৃতীয় অধ্যায়

কোম্পানীর আমল (২)

(১৮১৩-১৮৫৭)

১৮১৩ সাল থেকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্রে এক বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হতে থাকে। এই বছরে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটে ব্যবসার অধিকার শেষ হয়ে যায়। অপর পক্ষে, ব্রিটিশ শিল্প পুঁজির দ্বারা ভারত শোষণের এক নতুন পর্যায়ের সূচনা হয়।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে এই দুই পর্যায়ের পার্থক্যটা কি ধরনের?

এই প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে আমাদের এই সময়ে খাস ব্রিটেনের অর্থনৈতিক বিকাশের মূল ধারাটির সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হতে হবে।

কোম্পানী আমলের মূল ভিত্তি ছিল ইংলণ্ডের বাণিজ্যগত পুঁজিতন্ত্র (Merchant Capital)। ইংলণ্ডে তখনও শিল্পগত পুঁজিতন্ত্রের (Industrial Capital) বিকাশের স্তর দেখা দেয়নি।

শিল্পগত পুঁজিতন্ত্রের স্তরে অগ্রসর হতে গেলে যে পরিমাণ পুঁজি জমে ওঠা দরকার, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে তা ছিল না। ফলে, বণিক পুঁজিপতিদের স্বার্থই এই সময় পর্যন্ত প্রধান ছিল।

বণিক পুঁজিপতিদের একচেটে কোম্পানী প্রতিষ্ঠার যে বিশিষ্ট লক্ষ্য থাকে, ভারতে বাণিজ্য করার সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরও লক্ষ্য ছিল ঠিক তাই। সেই উদ্দেশ্য হল—সাগর পারের দেশে একচেটে ব্যবসার অধিকার অর্জন করে যথাসম্ভব মুনাফা করা। ব্রিটিশ পণ্যের জন্যে বাজার খুঁজে বার করা তখন উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল—ইউরোপ ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতে উৎপন্ন

পণ্য (বিশেষ করে মশলা, তুলার কাপড়, ও সিল্ক) চালান দেওয়া। ইংলণ্ডে ও ইওরোপে এই সমস্ত জিনিসের তৈরি বাজার পড়েই ছিল এবং সেজন্য যে কোনো বাণিজ্য অভিযানেই বিদেশ থেকে মাল নিয়ে ঘরে ফিরতে পারলেই লাভও ছিল অবধারিত। কোম্পানীর আমলে ভারতের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করার এটাই ছিল প্রধান ধারা। (১) এ্যাডাম স্মিথ এই ধারাটির আখ্যা দিয়েছেন—'পুরোনো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা।'

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রিটেনে শিল্পপুঁজির প্রসার হতে থাকে। ভারত থেকে কোম্পানী যে অর্থ লুণ্ঠন করতে থাকে (পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে এই লুণ্ঠন বাধাহীনভাবে চলতে থাকে) সেই লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যের ফলে ব্রিটেনের নগদ পুঁজি বেশ ভালভাবেই বেড়ে যাওয়ায় ইংলণ্ডের মজুত শক্তির পরিমাণই শুধু বৃদ্ধি পেল না, তার প্রসার ক্ষমতা ও চলাচলের গতিবেগও বেড়ে গেল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব গড়ে তোলার কাজে যে মূলধন সঞ্চয় এক অত্যাবশ্যক ভূমিকা পালন করে, তার গোপন উৎস ছিল ভারত থেকে লুঠ করা সম্পদ। (২)

কিন্তু ভারতে লুণ্ঠিত সম্পদের সাহায্যে ইংলণ্ডে একবার যখন শিল্প-বিপ্লব ঘটে গেল, তখন ইংলণ্ডে নতুন প্রতিষ্ঠিত বড় বড় কারখানাগুলিতে যে প্রচুর পণ্য উৎপন্ন হতে লাগল তার জন্যে বিশ্বব্যাপী একটা বাজার খোঁজাই সব চেয়ে বড় কাজ হয়ে দাঁড়াল। ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে ক্রমশ শিল্পপতিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল।

ফলে বিরোধ উপস্থিত হল দুই দলে—একদিকে বাণিজ্যপতি আর একদিকে শিল্পপতিরা। (৩) বাণিজ্যপতিদের স্বার্থ উপনিবেশগুলিতে একচেটে ব্যবসার অধিকার বজায় রাখা। শিল্পপতিদের স্বার্থ হল এই উপনিবেশগুলিকে ইংলণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যের খোলা বাজারে পরিণত করা এবং শিল্পপতিদের স্বার্থে উপনিবেশগুলিকে কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত করা।

দুই পক্ষই ক্ষমতা লাভের জন্যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল। ১৭৭০ থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত এই ক'বছর ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনে প্রধান হয়ে উঠল এই সংগ্রাম—বাণিজ্যগত পুঁজিতন্ত্র বনাম শিল্পগত পুঁজিতন্ত্রের সংগ্রাম।

ভারতের রাজনীতির উপরে এই সংগ্রামের প্রভাব পড়ল। ভারতে খোলা বাজারের পক্ষপাতী ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটে ব্যবসার উপর দারুণ আক্রমণ শুরু করল। তারা কোম্পানীর কর্মচারীদের নিয়মবিহীন ও ধ্বংসাত্মক শোষণ নীতির বিরোধিতা করে এক বিরাট আন্দোলন শুরু করল। কোম্পানী আমলের বিরুদ্ধে বার্ক-ব্রাইট-শেরিডনের বক্তৃতায় এই শিল্পপতিদের স্বার্থই প্রতিফলিত হয়েছিল। কোম্পানীর লুণ্ঠন-ব্যবস্থার সব চেয়ে কঠোর সমালোচক ছিলেন খোলা বাজারী পুঁজিতন্ত্রের পিতা এডাম স্মিথ। ভারতের বাজারের উপর ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের লোভ অনেক আগে থেকেই পড়েছিল। মনে রাখা দরকার, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রতি বছরে প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য ইংলণ্ডে ও ইওরোপে চালান দেওয়া হত। ভারতের এই শিল্প সমৃদ্ধিতে ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা ছিল ঈর্ষান্বিত। তাই তারা এই সময় থেকেই ভারতের শিল্প যাতে ইংলণ্ডে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে। ১৭০১ সালে এবং পরে ১৭২০ সালে তাদের চেষ্টায় ইংলণ্ডে ভারতে প্রস্তুত শিল্প ও ক্যালিকো আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ভারতে প্রস্তুত তুলাজাত দ্রব্যের উপর ক্রমশ অত্যধিক শুল্ক চাপানো হতে থাকে। (৪)

শিল্প-বিপ্লবের পরে শিল্পপতিরা ইংলণ্ডের সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় এবং এখন থেকে তাদের স্বার্থে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ভারতের শিল্প ধ্বংস করার জন্যে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট কোম্পানীর একচেটে ব্যবসার উপর হস্তক্ষেপ করে। কোম্পানীই এই সময়ে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য ইংলণ্ডে ও ইউরোপে চালান দিত। তাই প্রথমেই কোম্পানীর একচেটে কর্তৃত্ব বন্ধ করার প্রয়োজন হল। কোম্পানীর রাজনৈতিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৭৭৩ সালে লর্ড নর্থের রেগুলেটিং এ্যাক্ট ও ১৭৮৪ সালে পিটের ইণ্ডিয়া আইন পাশ করা হয়। (৫) শেষে ১৮১৩ সালে ভারতে কোম্পানীর একচেটে ব্যবসার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তবুও পুরোনো ব্যবস্থার জের হিসাবে কোম্পানীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব রয়ে যায়। ১৮৫৭ সালে জাতীয় বিদ্রোহের পরে শিল্পপতিদের সম্পূর্ণ

জয় হয়। এই বছরে পার্লামেণ্ট ভারত শাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানীর শাসনে ছেদ পড়ে।

এই খোলা বাজারী পুঁজিতন্ত্রের শোষণের চরিত্র বাণিজ্যগত পুঁজিতন্ত্রের শোষণের চরিত্র থেকে আলাদা। শোষণের এই নতুন ধারাটিকে এ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞা অনুযায়ী নতুন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বলা চলতে পারে।

এই নতুন ব্যবস্থায়, একদিকে ব্রিটিশ পণ্যের খোলা বাজার আর একদিকে বিলাতে ব্রিটিশ কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের উৎস হিসাবে ভারতকে গড়ে তোলার চেষ্টা হতে থাকে।

ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের স্বার্থে ভারতের অর্থনৈতিক মর্মমূলে আরও গভীরভাবে প্রবেশের জন্যে রেলপথ প্রতিষ্ঠা, পথ-ঘাটের উন্নতি, কোম্পানীর আমলে যে সেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল তারও প্রতি মনোযোগ প্রদানের সূচনা, ইলেকট্রিক-টেলিগ্রাফ ও সর্বত্র একই ধরণের ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন, কেরানী ও অনুগত ভৃত্য যোগাড় করবার জন্যে ইংরেজী শিক্ষার সীমাবদ্ধ প্রথম সূচনা, ইওরোপীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রচলন—ইত্যাদি অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বলাই বাহুল্য, ভারতে 'সভ্যতার আলো' বিকীরণ করার জন্যে এই রেলপথ, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়নি, এইগুলির সৃষ্টি হয়েছিল ভারতবাসীর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে আরও বিজ্ঞান-সম্মত কায়দায় ভারত শোষণের প্রয়োজনে।

শোষণের নয়া রূপ

আধুনিক অর্থে একটি পরাধীন উপনিবেশ বলতে যা বোঝায় ভারতে তারই সূত্রপাত হয় এই ১৮১৩ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে। ১৮১২ সালের প্রদত্ত কোম্পানীর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে—প্রত্যক্ষ কর বা লুণ্ঠনের উৎস হিসাবেই ব্রিটেনের কাছে ভারতের মূল্য। অর্থাৎ ১৮১২ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসাবে ভারতকে গড়ে তোলার কোনো সরকারী পরিকল্পনা ছিল না।

কিন্তু ১৮৪০ সালে পার্লামেণ্টের তদন্তে দেখা যায় অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই সময়ে দেখা গেল ব্রিটেনের শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসাবে ভারত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

ভারতে ব্রিটিশ শোষণের এই কায়দা পরিবর্তনের জন্মে ভারতকে যে মূল্য দিতে হল তা অবর্ণনীয়।

আগেই দেখেছি ব্রিটেন যখন বাঙলার দেওয়ানী লাভ করে তখন পর্যন্ত ভারত ছিল পৃথিবীর মধ্যে প্রধান একটি শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনকারী দেশ। ভারতের তখন পৃথিবীর কারখানা বলে বিদেশে সুখ্যাতি ছিল। ভারতের শিল্প-জাত পণ্যের, বিশেষ করে ভারতে প্রস্তুত তুলাজাত দ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য, পশ্চিম ভারতের ক্যালিকো, কাশ্মীরের শাল, বিহারের গন্ধক, কার্পেট, এমব্রয়ডারি প্রভৃতির প্রচুর চাহিদা ছিল বিদেশে, বিশেষ করে ইওরোপে।

ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা এই শিল্পগুলো আমূল ধ্বংস করে ভারতের বিরাট বাজারটি ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের জন্ম সংগ্রহ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

ভারতের উপর ব্রিটেনের এই সময়ে যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল সেই কর্তৃত্বের জোরে এই কাজ সম্পন্ন করতে ব্রিটেন মনস্থ করল। এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার এক অসম শুল্ক-নীতির প্রবর্তন করল।

এই অসম শুল্ক-নীতির অন্যায্যতা তদানীন্তন যুগের হৃদয়বান ইংরেজদের পর্যন্ত বিচলিত করেছিল। ১৮৪০ সালে মণ্টগোমারী মার্টিন সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন—

"গত পঁচিশ বছর ধরে আমরা ভারতকে ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য গ্রহণ করতে বাধ্য করেছি। আমাদের পশম-জাত দ্রব্য বিনা শুল্কে, তুলাজাত দ্রব্য শতকরা আড়াই ভাগ শুল্কে এবং অন্যান্য দ্রব্য এই অনুপাতে ভারতকে নিতে বাধ্য করেছি; অথচ ঠিক এই পঁচিশ বছর ধরে আমরা ব্রিটেনে রপ্তানীকৃত ভারতের পণ্যের উপর অত্যধিক শুল্ক চাপিয়ে দিয়েছি, এই শুল্ক ১০% থেকে ২০%, ৩০%, ৫০%, ১০০%, ৫০০%, এমনকি ১০০০% পর্যন্ত উঠেছে কাজেই ভারতের সঙ্গে খোলা বাজার স্থাপনের চেষ্টা চলছে বলে যে রব উঠেছে সেটা একটা ধূয়া মাত্র। আসলে ইংলণ্ড ভারতে খোলা বাজারের অধিকার পেয়েছে, ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে খোলা বাজারের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।" (৬)

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস রচয়িতা উইলসন সাহেব বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"ভারতের বাজারে ম্যাঞ্চেস্টারের আধিপত্য সৃষ্টি হয়েছে ভারতের শিল্পের আত্মত্যাগে।...ভারত যদি স্বাধীন দেশ হত, তাহলে সেও পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করত, ব্রিটেনের শিল্পজাত দ্রব্যের উপর অত্যধিক শুল্ক প্রবর্তন করত এবং এইভাবে নিজের উৎপাদন শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করত। আত্মরক্ষার এই ব্যবস্থা তাকে অবলম্বন করতে দেওয়া হয়নি। ভারত তখন বিদেশীর দয়ার উপর নির্ভরশীল।" (৭)

এইভাবে প্রত্যক্ষ সরকারী সাহায্যে এক পক্ষের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে ভারতের বাজারে ব্রিটেনের পণ্যদ্রব্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং ভারতের শিল্পগুলি নষ্ট হয়ে যেতে লাগল।

ইংলণ্ড থেকে আমদানী মেশিনে তৈরি তুলাজাত জিনিসপত্র যেমন তাঁতী-দের ধ্বংস ডেকে আনে, তেমনি মেশিনে তৈরি সূতা জোলাদের জীবিকা নষ্ট করে দেয়। ১৮১৮ সাল থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে ইংলণ্ড থেকে ভারতে সূতা রপ্তানী ৫২০০ গুণ বেড়ে যায়। সিল্ক ও পশমজাত দ্রব্য, লোহা, মৃৎ-শিল্প, কাঁচ ও কাগজের বেলাতেও দেশীয় শিল্পের ধ্বংস শুরু হল। (৮)

এইভাবে ভারতের শিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর তার ফল কি দাঁড়াল তা কল্পনা করা মোটেই কঠিন নয়।

সমসাময়িক যুগের সংবাদপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'র একজন লেখক এই ভাঙন লক্ষ্য করে মন্তব্য করেন—

"এদেশে যে প্রকারের কৃষিকর্ম শিল্পকর্ম চলিতেছে ইহা এদেশীয়ের পক্ষে পরম মঙ্গল। তাহার অন্যথা হইলে মহাদুঃখ হইবেক। তাহার এক সাধারণ প্রমাণ এ-দেশের দীন-দরিদ্রের স্ত্রীসকল চরকার সূতা কাটিয়া কালযাপন করিত। বিলাত হইতে শিল্পযন্ত্র নির্মিত সূতার আমদানী হওয়াতে তাহাদিগের অন্নাভাব হইয়াছে। অতএব বিবেচনা কর শিল্পকর্মকারীরা বিলাতে থাকিয়া এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে তাহারা এদেশে আইলে কি রক্ষা আছে।" পশ্চিম ভারতের সুরাট, আর বাঙলা দেশের ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রিক শহরগুলোর অধিবাসীদের দুর্দশা চরমে উঠল। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ যে মুর্শিদাবাদ শহরকে লণ্ডনের সঙ্গে তুলনা করেন ১৮৪০ সালের

মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের কৃপায় সেই শহর এক মহাশ্মশানে পরিণত হয়। ১৮৪০ সালে স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ান পার্লামেণ্টারী তদন্ত কমিটির কাছে ঢাকার দুর্দশার বর্ণনা করে বলেন—

"ব্রিটিশ আমলে ঢাকার লোক সংখ্যা ১৫০,০০০ থেকে ৩০,০০০—৪০,০০০ এসে ঠেকেছে। ১৭৮৭ সালে ঢাকা থেকে ইংলণ্ডে মসলিন চালান যেত ৩০ লক্ষ টাকার। ১৮১৭ সালে এই চালান একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। যুগ যুগ ধ'রে তাঁত শিল্পের উপর নির্ভর করে যে হাজার হাজার কারিগর বেঁচে থাকত তারা হয়েছে নিশ্চিহ্ন। এককালে যে-সব পরিবার সঙ্গতিপন্ন ছিল তারা আজ শহর ছেড়ে গ্রামে জীবিকার খোঁজে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে··· এটা কেবল ঢাকা শহরের কথা নয়, সমস্ত জেলাতেই এই একই ধ্বংসের কাহিনী"। (১০)

শিল্প-প্রধান দেশ থেকে কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ

এই ভাবে শিল্পদ্রব্য রপ্তানীকারী দেশে থেকে ভারতকে ইংলণ্ডের শিল্পদ্রব্য আমদানীকারী দেশে পরিণত করার ষড়যন্ত্র চলতে লাগল।

কিন্তু এখানে ব্রিটেনের শিল্পপতিদের সামনে একটা বড় প্রশ্ন দেখা দিল। তারা ত ভারতে নিজেদের পণ্যদ্রব্যের জন্য বাজার চায়। কিন্তু জমিদারেরা ধ্বংসপ্রায়, শিল্পপতিরা ধ্বংসপ্রায়, কারিগরেরা বেকার, কৃষকদের অবস্থা তথৈবচ। এই যখন ভারতের জনগণের অবস্থা—তখন ব্রিটিশ পণ্য কিনবে কে? এই বৃহৎ প্রশ্নটি ব্রিটেনের শিল্পপতিদের চিন্তিত করে তুলল। তারা দেখল ভারতের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কিছুটা বাড়াতে না পারলে ব্রিটিশ পণ্যের জন্যে ভারতে বাজার সৃষ্টি করা যাবে না। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে তাই তারা ভারতের আর্থিক সম্পদ সৃষ্টির জন্যে কোনো কোনো 'ক্ষেত্রে চেষ্টা করতে থাকেন। অবশ্য তারা ঠিক সেই ক্ষেত্রগুলি বেছে নিল যাতে তাদের শিল্প-স্বার্থটি সবচেয়ে রক্ষিত হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তারা ইংলণ্ডের শিল্পের পক্ষে অপরিহার্য কয়েকটি কাঁচামাল উৎপাদনের জন্যে ভারতকে প্রস্তুত করতে চেষ্টা করল।

কার্ল মার্কস ব্রিটেনের শিল্পপতিদের এই উভয় সংকটটি অনুধাবন করে মন্তব্য করেন—

ইংলণ্ডের শিল্প-পতিরা যতই ভারতের বাজারের উপর নির্ভরশীল হতে থাকল ততই তারা ভারতের উৎপাদন শক্তিকে নতুন করে সৃষ্টি করার প্রয়োজন বোধ করতে লাগল।" (১১)

ভারতে ইওরোপীয় প্রতিষ্ঠিত প্রথম কুঠি-শিল্প হল নীল। নীল-চাষ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই গড়ে ওঠে। যন্ত্রে চালিত বস্ত্র শিল্পের উদ্ভবের ফলে এবং ব্রিটেনের নাবিকদের পোশাকের জন্য নীল রঙ গৃহীত হবার পর থেকে ব্রিটেনে নীলের চাহিদা খুব বাড়তে থাকে। ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নীল-চাষের ব্যাপক প্রচলন হয় এবং ১৮৫০ সালে ভারত থেকে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মধ্যে নীল একটী প্রধান দ্রব্য হয়ে ওঠে।

ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ১৮৩৩ সাল থেকে ভারতে ইংরেজদের জমি-জায়গা কিনতে ও ক্ষেত-খামার গড়ে তুলতে সুযোগ দেওয়া হতে থাকে। এই সব খামারে চা, কফি, রবারের চাষ শুরু হয়। ১৮৩৩ সালের পর থেকে কাঁচা তুলা, পশম, তিসি, পাট ও খাদ্যশস্যের রপ্তানিও বেড়ে চলতে থাকে।

এই উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের বস্ত্র-শিল্পের বড় কর্তারা ভারতে কাঁচা তুলা রপ্তানির ব্যাপারে উৎসাহ দিতে থাকে। এই তুলার সাহায্যে তারা নিজের দেশের শিল্প গড়ে তুলতে চাইল। ১৮২৯ সালে হেনরী টাকার এই বিষয়ে কোর্ট অব ডিরেক্টরদের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এই স্মারকলিপিতে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে—'জাতীয় উদ্দেশ্যে'র দিক থেকে খুবই সমীচীন হবে সেই ধরনের তুলা উৎপন্ন করা যা ব্রিটেনের শিল্পকে বিস্তৃত করতে ও উন্নত করতে সাহায্য করবে। (১২) এই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে (গুজরাট, ধারওয়ার) ইওরোপীয় বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে কতকগুলি ফার্ম খোলা হয় এবং প্রতি বছরে হাজার হাজার বস্তা তুলা ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হতে থাকে।

ইংলণ্ডের লৌহ ও ইস্পাত কারখানার মালিকেরা ভারতে রেলপথ, রাস্তাঘাট, ব্রিজ প্রভৃতি তৈরি করা বিষয়ে উৎসুক হতে থাকে। তাদের স্বার্থে এবং সেই সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সামরিক স্বার্থে ১৮৫৩ সালে বোম্বে থেকে থানা পর্যন্ত রেলপথ খোলা হয়। ১৮৫৪ সালে কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জের কয়লা খনি অঞ্চল পর্যন্ত রেলপথ বিস্তার লাভ করে।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে ব্রিটেনের শিল্পপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে ভারতকে একটি কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত করার চেষ্টা শুরু হয়।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা

এই স্থানে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটা মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ঠিক এই প্রশ্নটিই কার্ল মার্কসের মনে গভীর কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল এবং তিনি এই প্রশ্নটির সদুত্তর দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন।

১৮৫৩ সালে মার্কস নিউ ইয়র্কের একটি পত্রিকায় 'নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউনে' ভারত সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে এবং ভারতের উপর ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করেন। (১৩)

এই প্রবন্ধগুলিতে মার্কস বিশ্লেষণ করে দেখান যে—ব্রিটিশ শাসনের ভারতে দুটি দিক আছে—একটি ভাঙার দিক, আর একটি পুনর্জীবন সঞ্চারিত করার দিক। ভাঙার দিক থেকে তার কাজ পুরানো এশীয় সমাজের ধ্বংসসাধন করা। পুনর্জীবন সঞ্চারিত করার দিক থেকে তার কাজ এশিয়াতে পশ্চিমের সমাজের বস্তুগত ভিত্তি স্থাপন করা।

ভাঙার কাজটি ইংরেজ কিভাবে সম্পন্ন করল মার্কস তা পুংখানুপুংখভাবে আলোচনা করেছেন।

ইংরেজ-শাসনের পূর্বে-প্রচলিত ভারতের গ্রামকেন্দ্রিক সামন্ত সমাজের নিস্পন্দ মৃতকল্প জীবনধারা মার্কসের মনে পীড়া দিয়েছিল। তাঁর মতে একমাত্র এক সমাজ-বিপ্লব ছাড়া নতুন সমাজ গঠনের বৈষয়িক উপকরণগুলি সঞ্চারিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

মার্কসের মতে ইংরেজ-শাসন নিজের অজানিতে এই সমাজ-বিপ্লবের কাজটি সম্পন্ন করল। ইংরেজ-শাসনে বিদেশী শিল্পপতিদের আঘাতে ভারতের গ্রাম-কেন্দ্রিক সামন্ত সমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

মার্কস লিখেছেন—"ব্রিটিশ স্টীম ও ব্রিটিশ বিজ্ঞান সারা হিন্দুস্থানে কৃষি ও শিল্পের সমন্বয় ভেঙে দিয়ে এশিয়ার বৃহত্তম ও একমাত্র সমাজ-বিপ্লবের গোড়াপত্তন করেছে।"

ব্রিটিশ শিল্পপতিদের সংকীর্ণ স্বার্থবাদী আচরণ সম্পর্কে মার্কসের মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। তাই তিনি এই প্রসঙ্গে আরও লিখলেন—"একথা সত্য যে ইংলণ্ড তার জঘন্য স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হয়েই হিন্দুস্থানে সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত করেছে এবং যেভাবে সে এই কাজে এগিয়েছে তা বর্বরোচিত। কিন্তু সেটাই আসল প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল—এশিয়ার সমাজসংগঠনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হলে মানব জাতি কি তার অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে ?"

বিশ্ব-সভ্যতার অগ্রগতির বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মার্কস ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের এই ঐতিহাসিক ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রিটিশ শাসনের করাল মূর্তিটি যতটা নগ্নভাবে উন্মোচন করেছেন ততটা তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে আর কেউ করেননি। তাই ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে তিনি 'বর্বরোচিত' আখ্যা দেন এবং অত্যন্ত কঠোর ও তীক্ষ্ণ ভাষায় ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক ভূমিকাটি উন্মোচন করেন।

মার্কস ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক ভূমিকাটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। প্রথমে বিচার করেছেন ব্রিটিশ বণিক-পুঁজির শোষণের ধারাটি এবং পরে ব্রিটিশ শিল্প-পুঁজির শোষণের ধারাটি।

বণিক-পুঁজির শোষণের যুগে কোম্পানী ভারতের কণ্ঠরোধ করার জন্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল তিনি তার উল্লেখ করেছেন—

(১) কোম্পানীর প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন।

(২) সেচব্যবস্থা ও অন্যান্য জনহিতকর কার্যে অবহেলা।

(৩) জমিদারী প্রথার প্রবর্তন।

(৪) ভারতের পণ্য ইংলণ্ডে রপ্তানী বন্ধ করার জন্যে শুল্ক প্রবর্তন।

তিনি শিল্প-পুঁজি ও বাণিজ্য-পুঁজির প্রতিযোগিতা, শিল্প-পুঁজির জয় এবং ভারতের অর্থনীতির উপর তার সর্বনাশা ফলাফল বিবৃত করেছেন। তিনি প্রসঙ্গত নিম্নলিখিত ফলাফলগুলি লক্ষ্য করেছেন—

(১) শিল্প-প্রধান সহরগুলোর ধ্বংস-সাধন।

(২) কৃষির উপরে অত্যধিক চাপ সৃষ্টি।

(৩) নির্দয়ভাবে কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ।

মোট কথা, মার্কসের মতে—ইংরেজ এ-দেশে ইতিহাসের যন্ত্র হিসাবে কাজ করল বটে, তবে তার জন্যে ভারতকে দিতে হল অজস্র মূল্য। এই জন্যেই মার্কসের মন হিন্দুস্থানের এই দুঃখে গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন হিন্দুস্থানের মুখের উপর বিষাদের কালো ছায়া।

কিন্তু তাই বলে মার্কস কি ভারতের এশীয় সংগঠন-ব্যবস্থাটি ভেঙে যাওয়ার জন্যে অশ্রু বিসর্জন করেছেন? বরং তিনি বর্তমানের এই ধ্বংসলীলার মাঝেও ভারতের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে উপযোগী কোনো কোনো উপকরণ সঞ্চারিত হতে দেখে উৎসাহ বোধ করেছেন।

মার্কস লক্ষ্য করলেন—ভারতকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শোষণ করার তাগিদে ইংরেজকে এমন সব উৎপাদন-যন্ত্রের সঙ্গে ভারতবাসীকে পরিচিত করতে হবে যার প্রভাবে ভারতে উন্নততর সমাজ বিকাশের উপকরণগুলি কিছু কিছু জন্মলাভ করতে পারবে। কোম্পানীর শাসনে, বিশেষ করে ১৮১৩ সালের পর থেকে নতুন সমাজ গঠনের যে-সব বস্তুগত উপাদান সঞ্চারিত হতে শুরু করেছিল মার্কস তার বিবরণ দিয়েছেন। মার্কসের মতে এই উপাদানগুলি নিম্নরূপ—

(১) মুঘলদের আমলের চেয়েও দৃঢ়সংবদ্ধ এবং বিস্তৃত রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের সহায্যে এই ঐক্য দৃঢ়তর ও চিরস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

(২) দেশীয় সৈন্যবাহিনী গঠন (১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর এই বাহিনী ভেঙে ফেলার আগের কথা)।

(৩) স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা। এশীয় সমাজে সংবাদপত্রের এটাই প্রথম আবির্ভাব।

(৪) জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা—এশিয়ার সমাজ বিকাশেরর পক্ষে যার প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিহার্য।

(৫) শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং যতদূর সম্ভব অল্প পরিমাণে হলেও, শাসন চালাবার গুণাবলী-সম্পন্ন এবং ইওরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত এক শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম।

(৬) বাষ্পযানের সাহায্যে ইওরোপের সঙ্গে নিয়মিত এবং দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন।

(৭) সর্বোপরি, রেলপথ প্রবর্তন।

এই রেলপথ প্রবর্তনের উপরে কার্ল মার্কস সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন।

তাঁর মতে ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের স্বার্থে ভারতে-প্রস্তুত কাঁচামাল চালান দেওয়ার প্রয়োজনেই ইংরেজ এদেশে রেলপথ ও রাস্তাঘাট নির্মাণে মন দিয়েছে। কিন্তু ইংরেজ যে-উদ্দেশ্যেই এই কাজে হাত দিক না কেন, ভারতের পক্ষে তার ফল শুভ হবে এই বিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন। তাই লিখলেন—রেলপথের জন্তে নানা শিল্প প্রক্রিয়ার প্রচলন হবে এবং তার ফলে রেলপথের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সব শিল্পতেও যন্ত্রের ব্যবহারের স্থত্রপাত হবে। এই রেলপথই হবে ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত। এই রেলব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত আধুনিক শিল্প পারিবারিক শ্রম-বিভাগ ধ্বংস করে দেবে এবং কাজটি ভালই হবে, কেননা এই ধরনের শ্রম-বিভাগের উপর নির্ভর করেই ভারতের অগ্রগতি ও শক্তির পক্ষে প্রধান অন্তরায় ভারতীয় বর্ণগুলি বেঁচে রয়েছে।

ভারতের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপরোক্ত উপকরণগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে মার্কস নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু তার মানে কি এই যে মার্কস ভাবতেন যে বৃটিশ কর্তৃত্বে ভারত তার ঈপ্সিত মুক্তি ও সামাজিক প্রগতি লাভ করতে সক্ষম হবে? বরং মার্কস জানতেন যে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ ছাড়া ভারতের ঐ মুক্তি বা সামাজিক প্রগতি কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

মার্কস্ তাই স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন—সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য ঐ বস্তুগত উপাদানগুলিকে কিভাবে, কতদূর, প্রগতি ও উন্নতি অর্জনের কাজে ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করবে একমাত্র ভারতের জনসাধারণের উপরে।

মার্কসের নিজের কথায়—"ইংরেজ বুর্জোয়ারা যাই করতে বাধ্য হোক তাদের কাজকর্ম ভারতের জনগণের মুক্তিও আনবে না, বা ব্যাপক জনগণের সামাজিক অবস্থার কোনো বিশেষ পরিবর্তনও সাধন করবে না। কেননা উৎপাদন শক্তির বিকাশ এবং এই উৎপাদন শক্তি জনসাধারণের কতটা উপভোগে লাগছে তার উপর এই পরিবর্তন নির্ভর করবে। তবে ব্রিটিশ

বুর্জোয়াদের কাজ-কর্মের ফলে যা নিশ্চিতভাবে ঘটবে তা হল—এই উভয় কাজের জন্যে বস্তুগত ভিত্তি রচিত হবে।"

তাই তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন—যতদিন গ্রেট ব্রিটেনে বর্তমান শাসকশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত না হবে অথবা ভারতীয়রা সবল হয়ে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব পরিহার করতে সক্ষম না হবে, ততদিন ব্রিটিশ শিল্পপতিরা সমাজ গঠনের যে নতুন উপাদান ভারতীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে ভারতবাসী তার ফললাভ করতে পারবে না।

দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ শাসনকে পরিহার করে ভারতের জনগণকে রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের দায়িত্ব নিজেদের হাতেই তুলে নিতে হবে—ভারতের অতি বড় দুর্দিনে ভারতবাসীকে এই কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিলেন তদানীন্তন কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতবন্ধু কার্ল মার্কস্।

॥ গ্রন্থ নির্দেশিকা ॥

(১) R. P. Dutt—India To-day, P. 86

(২) Brooke Adams—"The Law of Civilisation and Decay," P. 259-60

(৩) 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' ও 'ইণ্ডিয়া বিল' সম্পর্কে কার্ল মার্কসের প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

(৪) Radhakamal Mukherjee—The Economic History of India, 1600-1800, P. 153

(৫) R. P. Dutt—India To-day, P. 98-99

(৬) R. C. Dutt—The Economic History of India—in the Victorian Age, Vol II P. 112

(৭) ঐ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৩

(৮) R. P. Dutt—India To-day, P. 101

(৯) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা

(১০) R. C. Dutt—Economic History of India, Vol. II, P. 105

(১১) Karl Marx—The East India Company, Its History & Results

(১২) Rohini Mohan Chaudhuri—The Evolution of Indian Industries P. 74

(১৩) Marx & Engels on India—Socialist Book Club Publication

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম
(১৮১৩—১৮৫৭)

১৮৫৭ সালে মার্কস ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেন—ভারতের চারদিকে কেবল ধ্বংসস্তূপ—(১) এই পর্বে বস্তুগতভাবে নব-জাগরণের পক্ষে অপরিহার্য কোনো কোনো উপকরণ সঞ্চারিত হলেও ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক ভূমিকাটিই ছিল প্রধান।

কুটীর-শিল্প ও কারিগরশ্রেণীর ধ্বংসলীলা এই সময়ে চরম সীমায় উপস্থিত। ফলে বাঙলার গ্রামসমাজের মূল কাঠামোটি—যার প্রধান অবলম্বন ছিল কুটীর-শিল্প ও কৃষির সমন্বয়—তা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) প্রবর্তনের পর থেকে কৃষকদের উপরেও অত্যাচারের মাত্রা বাড়ল বৈ কমল না। আগের দিনের ইজারাদারী অত্যাচারের বদলে এখন থেকে নতুন জমিদারী ব্যবস্থার অত্যাচার আরম্ভ হল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল জমিদারদের রক্ষাকবচ—সত্যিই জমিদারদের "মহাসনদ" ("ম্যাগনা কার্টা")। এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদারেরা হল জমির মালিক। রাষ্ট্রকে দেয় নির্দিষ্ট খাজনার পরিবর্তে জমির উপর জমিদারদের মালিকানা সাব্যস্ত হল। পরে জমির দাম বেড়ে গেল; কিন্তু জমির খাজনা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট থাকায়, জমিদারেরা রাষ্ট্রের দেয় অংশ বাদ দিয়ে যে পরিমাণ খাজনা আদায় করত তার সবটুকুই তারা ব্যক্তিগত আয় হিসাবে আত্মসাৎ করার অধিকার পেল। এইভাবে

জমিদার সম্প্রদায় ধনসঞ্চয়ের প্রচুর সুবিধা অর্জন করল এবং ধন-সঞ্চয়ের সুযোগে সমাজেও অভূতপূর্ব প্রতিপত্তি অর্জন করল। বস্তুত, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর তখনও জন্ম না হওয়ায় এই জমিদারেরাই ছিল তখনকার সমাজের সবচেয়ে গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। শুধু তাই নয়। এখন থেকে জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্যে রাষ্ট্র তার আইন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে লাগল। ১৭৯৭ সালে লর্ড ওয়েলেসলি 'হপ্তম আইন' (সপ্তম আইন) নামে এক আইন জারি করেন। এই আইন অনুযায়ী জমিদারদের প্রজার উপর জুলুম করার অধিকার দেওয়া হয়। জনৈক লেখক এই আইন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—এই আইন অনুযায়ী আদালতের সাহায্য ছাড়াই জমিদারেরা যে শুধু বাকী খাজনার দায়ে প্রজাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারত তাই নয়, আদালতের সাহায্য নিয়ে বাকী খাজনা না দেওয়া পর্যন্ত জমিদারেরা প্রজাদের আটক করে রাখতে পারত। (২)

এই আইনের প্রয়োগে যে-সব জুলুম চলত রায়তেরা অনেক সময় আদালতে তার বিরুদ্ধে নালিশ করত। সেই নালিশ বন্ধ করতে আর একটি আইন পাশ হল। তার নাম হল ১৮১২ সালের 'পঞ্চম আইন'। এই আইনে জমিদারের গোমস্তাদের বিরুদ্ধে অথবা জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করাটাই দণ্ডনীয় বলে গণ্য হল।

বোধ হয় এতেও জমিদারেরা সন্তুষ্ট হতে পারল না। তাই ১৮১৯ সালে আর একটি নতুন আইন অনুযায়ী-জমিদারদের নিজ জমিদারী অধস্তন পত্তনিদার, দরপত্তনিদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার অধিকার দেওয়া হল। জমিদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার প্রত্যেকটি স্তরের স্বত্বাধিকারী প্রজাদের যথাসম্ভব শোষণ করতে থাকল। প্রজাদের উপর শোষণের মাত্রা সর্বদিক থেকেই কেবল বেড়েই চলল।

আইনের সাহায্যে এই জুলুম ছাড়াও বে-আইনী জুলুম ত ছিলই। জমিদারেরা নানা অজুহাতে কৃষকদের কাছ থেকে আবয়াব বা বে-আইনী কর আদায় করত। এই বে-আইনী কর উপলক্ষ করে কৃষকেরা যে কতবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তার ইয়ত্তা নেই।

মোট কথা, কৃষকদের উপর কখনও আইনসঙ্গত উপায়ে, কখনও বে-আইনী

উপায়ে জমিদারেরা অনবরত যে অত্যাচার চালাত তার ফলে বাঙলার কৃষি অর্থনীতিতে এক তীব্র সংকট উপস্থিত হল। এখানে-সেখানে কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কখনও মানভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে, কখনও নদীয়া ও ২৪ পরগণায়, কখনও ফরিদপুর, দিনাজপুরে, কখনও ময়মনসিংহে, কখনও আবার সিউড়ী-পাকুড়-ভাগলপুরে বর্তমান বাঙলা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে এই কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। বড়-ছোট অসংখ্য এই কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির কথা নীচে উল্লেখ করা হল।

গঙ্গানারায়ণ-হাঙ্গামা

আগেই দেখেছি—১৭৯৯ সালে মেদিনীপুরে ও বাঁকুড়া জেলায় চোয়ার বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়। তারপর থেকে চোয়ারদের বিদ্রোহের ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস পায়। কিন্তু ১৮৩২ সালে মানভূমে প্রাক্তন জমিদার গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে চোয়ারেরা পুনর্বার বিদ্রোহ করে এবং কিছুদিনের মত তারা এই অঞ্চলের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। গঙ্গা-নারায়ণ এই অঞ্চলের 'রাজা' ব'লে নিজেকে ঘোষণা করেন। গঙ্গানারায়ণ চোয়ার কৃষকদের দলে টানতে সক্ষম হয়েছিলেন এই কারণে যে তারা স্থানীয় দেওয়ান মাধবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। দেওয়ান মাধব রাজস্ব আদায়ের নামে কৃষকদের উপর অকথ্য জুলুম চালাত, তাছাড়া নিজেই সে মহাজনী ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। কাজেই উত্যক্ত কৃষকেরা গঙ্গানারায়ণের ডাকে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিয়েছিল। ১৮৩২ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে তারা দেওয়ানকে ঘেরাও করে তাকে খুন করল। স্থানীয় বড় শহর বড়বাজারে প্রবেশ করে জনতা মুনসেফের কাছারী, থানা, লবণ দারোগার কাছারী প্রভৃতি সরকারী অফিস প্রভৃতিতে আগুন ধরিয়ে দিল। সর্বোপরি, তারা সরকারী ফৌজকেও আক্রমণ করল। সমগ্র অঞ্চল বিদ্রোহীদের অধিকারভুক্ত হল। ১৮৩২ সালের নভেম্বর মাসে সামরিক বাহিনী নিয়োগ করে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ এই বিদ্রোহ দমন করে। এই বিদ্রোহটি "গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা" (১৮৩২) নামে বিখ্যাত। (৩)

পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ

প্রায় একই সময়ে বাঙলার অপর প্রান্তে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত শেরপুর অঞ্চলের কৃষকেরাও অনুরূপ জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (১৮৩৩) ঘোষণা করে।

শেরপুরের পার্বত্যজাতি, যেমন গারো ও হাজং—তারাই ছিল এই বিদ্রোহের নায়ক।

শেরপুর পরগণার জমিদারেরা ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী। তারা হাজং ও গারো কৃষকদের কাছ থেকে 'খরচা' 'আবয়াব' প্রভৃতি নানা ধরনের বে-আইনী কর আদায় করত। দশসালা বন্দোবস্ত সংক্রান্ত সরকারী কাগজপত্রে দেখা যায় যে জমিদারেরা নামমাত্র খাজনায় এই জমিদারী উপভোগ করত, অথচ বে-আইনী কর হিসাবে তারা কুড়ি হাজার টাকা কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করেছিল। জনৈক ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে কৃষকেরা এই অত্যাচারের প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

করম শাহ নামে জনৈক দরবেশ হাজংদের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। করম শাহের মৃত্যুর পরে তার পুত্র টিপু এই সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সাধারণ লোকে বিদ্রোহী টিপুকে 'পাগল' বলে অভিহিত করত এবং টিপুর শিষ্যেরা পাগলপন্থী বলে পরিচিত হল। টিপুর শিষ্যদের সংখ্যা ৫ হাজারের কম ছিল না। টিপু প্রচারিত সাম্য ও মৈত্রীর বাণী কৃষকদের মনে সাড়া জাগাল। তারা টিপুর কাছে এসে তাদের বিক্ষোভ জানাতে থাকল। টিপু তাদের নিয়ে অত্যাচার বন্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হল। তারা প্রতিজ্ঞা করল—কুড় প্রতি (১এর ⅓ একর) বার আনার উর্ধ্বে তারা খাজনা দেবে না। টিপুর শিষ্যেরা শেরপুরের জমিদারদের কাছারী আক্রমণ করল, থানায় আগুন ধরিয়ে দিল, শহর লুণ্ঠন করল, শেরপুরে উপস্থিত মৈমনসিংহের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে তারা ঘেরাও করল। কিছুদিনের মত গারো পর্বত ও শেরপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ স্থাপিত হল। টিপু রাজা বলে নিজেকে ঘোষণা করল। বিদ্রোহীদের স্বাধীন রাজত্ব স্থাপিত হল।

স্থানীয় শাসক মহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সৈন্য আমদানি করা হল। বহু পরিশ্রমে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করা হল। (৪)

তিতুমীরের বিদ্রোহ

কলকাতা থেকে মাত্র একুশ মাইল দূরে বারাসত সহরের উপকণ্ঠে এই বিদ্রোহের (১৮৩১) প্রথম স্থচনা। ক্রমশ নদীয়া জেলার কোনো কোনো অংশেও এই বিদ্রোহ বিস্তৃতি লাভ করে।

এই বিদ্রোহের যেটি ঘটনাস্থল সেটি ছিল নীলকুঠির দ্বারা সমাকীর্ণ। নিকটবর্তী বাগুন্দিতে কোম্পানীর একটি লবণের গোলাও অবস্থিত ছিল।

এই অঞ্চলে নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচার, লবণ ঠিকাদারদের অত্যাচার ইত্যাদি স্থানীয় কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। তার ওপরে জমিদারী উৎপীড়ন ত ছিলই। কোম্পানীর আমলে স্থানীয় দারোগা প্রভৃতির সঙ্গে জমিদারদের যোগসাজস থাকার ফলে স্থানীয় চাষীরা অসহায় বোধ করত। চাপা অসন্তোষে তারা গুমরে মরত।

১৮৩১ সালে তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহবী প্রচারকেরা এই অসন্তোষের উৎসমুখ খুলে দিল। অনেকটা যেমনভাবে একদিন ইংলণ্ডের কৃষকদের বিক্ষোভের পথ খুলে দিয়েছিল ললার্ড নামধারী একদল ধর্ম প্রচারক।

বারাসতের ওয়াহবীদের নেতা ছিলেন তিতুমীর। (৫) সঙ্গতিপন্ন চাষীর ঘরে তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন কুস্তিগীর, লাঠিয়াল সম্প্রদায়ের নেতা। পরে তিনি ধর্মচর্চায় মন দেন এবং মক্কায় তীর্থভ্রমণে গমন করেন। মক্কায় অবস্থিতিকালে তিনি উত্তর ভারতের বিখ্যাত ওয়াহবী ধর্ম-প্রচারক সৈয়দ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিধর্মী শিখ ও ইংরেজকে পরাস্ত করে এই দেশে ওয়াহবীদের নেতৃত্বে পুনর্বার মুসলমান-রাজ পুনঃসংস্থাপন করাই ছিল সৈয়দ আহমদের লক্ষ্য।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে তিতুমীর গোপনে ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে সৈয়দ আহমদের বাণী প্রচার করতে থাকেন। ক্রমশ, তাঁর প্রচারে হাজার হাজার স্থানীয় মুসলমান কৃষক সাড়া দিতে থাকে। (৬) ১৮৩০ সালে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ওয়াহবীরা পেশোয়ার দখল করে। এই সংবাদে বারাসতের ওয়াহবীরা আরও সাহসী হয়ে ওঠে এবং তারা কোম্পানী-রাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

ওয়াহবী প্রচারিত ধর্মে সাম্য ও মৈত্রীর উচ্চ আদর্শ ঘোষিত হয়েছিল। জমিদার, নীলকর, কুঠির গোমস্তা, দারোগাদের দ্বারা উৎপীড়িত গরীব

মুসলমান কৃষকদের মনে সাম্য ও মৈত্রীর এই উচ্চ আদর্শ সাড়া জাগাল। দলে দলে তারা তিতুর পতাকাতলে সমবেত হল।

ওয়াহবী কৃষকদের এই সম্মেলন স্থানীয় জমিদারদের আতঙ্কিত করে তুলল।

ইছামতী নদীর তীরস্থ পূর্ণা গ্রামের জমিদার কৃষ্ণ রায় ওয়াহবীদের কার্য-কলাপে, বিশেষ করে স্থানীয় কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে ভীত হয়ে পড়েন এবং তাদের শক্তি খর্ব করার উদ্দেশ্য নিয়ে ওয়াহবী প্রজামাত্রকে বাধ্য করলেন মাথা-পিছু আড়াই টাকা করে কর দিতে। শুধু তাই নয়, তিনি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে ওয়াহবীদের উপর ধার্য এই করটিকে 'দাড়ির উপর কর' (ওয়াহবীদের দাড়ি রাখা বাধ্যতামূলক ছিল) বলে অভিহিত করেন। পূর্ণা গ্রাম থেকে এই কর আদায় করার পরে উপরোক্ত জমিদার নিকটবর্তী আর একটি গ্রাম সরফরাজপুর থেকেও এই কর আদায় করতে চেষ্টা করেন। তখন স্থানীয় ওয়াহবী কৃষকেরা একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

বিদ্রোহীরা স্থানীয় জমিদারের কাছারী আক্রমণ করে। নিকটবর্তী নীলকুঠি পুড়িয়ে দেয়। নীলকুঠির সাহেবদের নাজেহাল করে। স্থানীয় দারোগা জমিদারের কাছে ঘুষ খেয়ে তাদের মিথ্যা মামলায় জড়াতে চেষ্টা করে। তারা উপরোক্ত দারোগাটিকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

হিন্দু জমিদারেরা এই কৃষক বিদ্রোহটিকে সাম্প্রদায়িক ঘটনা বলে প্রচার করতে থাকে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্থানীয় জমিদার একটি মসজিদ পুড়িয়ে দেয়। ওয়াহবীরা প্রতিবাদে একটি স্থানীয় হিন্দু মন্দিরে ঢুকে গো-হত্যা করে। এইভাবে বিদ্রোহটিকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পথে পরিচালিত করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ওয়াহবী আন্দোলনটি মূলত কৃষক সংগ্রাম হওয়ায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জমিদারেরাই ওয়াহবীদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। এই কারণে ওয়াহবীদের বিরোধিতা করেছিল যে সব ধনী মুসলমান তারাও রেহাই পায় নেই। জনৈক স্থানীয় মুসলমান জমিদারের বাড়ী ওয়াহবীরা আক্রমণ করে ও তার সমস্ত সম্পত্তিও তারা লুণ্ঠন করে। (৭)

বিদ্রোহী ওয়াহবীরা কয়েকটি সশস্ত্র বাহিনীতে বিভক্ত ছিল। তাদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন গোলাম মাসুল। প্রধান সেনাপতির অধীনে থাকত

'সর্দার'। প্রতিটি সর্দারের অধীনে থাকত একদল সশস্ত্র কৃষক। কিছুদিনের জন্যে বিদ্রোহীরা নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা জানিয়ে দিল যে—ইওরোপীয়েরা বে-আইনীভাবে এ-দেশের কর্তৃত্ব দখল করেছে। কাজেই এই বে-আইনী দখল অবসান করে আইন-সঙ্গত অধিকারে তারা আবার মুসলমান-রাজ প্রতিষ্ঠা করবে। (৮)

বারাসত ও নদীয়ার রাজকর্মচারীরা কলকাতায় এই বিদ্রোহের খবর পাঠালেন এবং তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে জানালেন পুরোদস্তুর সৈন্যবাহিনী ছাড়া এই বিদ্রোহ দমন করার কোনো উপায় নেই। ১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর ক্যালকাটা মিলিশিয়ার একটি বাহিনী এই অঞ্চলে পাঠানো হয়। কিন্তু এই বাহিনী বিদ্রোহীদের হাতে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়। তখন কলকাতা থেকে বেশী সংখ্যায় পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী পাঠানো হয়। বিদ্রোহীরা নারিকেলবেড়িয়া নামক স্থানে একটি বাঁশের কেল্লা তৈরি করে এবং এই কেল্লাকে প্রধান কেন্দ্র করে যুদ্ধ চালাতে থাকে।

তুমুল যুদ্ধের পরে কোম্পানীর সৈন্যবাহিনী বাঁশের কেল্লাটি দখল করে। বিদ্রোহের প্রধান নেতা তিতু মীর যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। অবরুদ্ধ কেল্লা থেকে ৩৫০ জন ওয়াহবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিতুর প্রধান সহকর্মী হিসাবে জনৈক নেতাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিতুর অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে ১৪০ জনকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ফরাজী আন্দোলন

তিতু মীরের বিদ্রোহ দমনের পরেও মুসলমান কৃষকদের মধ্যে ওয়াহবী আন্দোলনের প্রচার চলতে থাকল। ১৮৩৮ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে প্রায় একটানা এক সংগ্রাম ওয়াহবীরা চালিয়ে যায়। এই সময়ে এই আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে ফরিদপুর।

ফরিদপুরের আন্দোলনকারীরা 'ফরাজী' নামেই সমধিক খ্যাত। (৯) বারাসতের ওয়াহবী আন্দোলনের মতই এই আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল নিম্নশ্রেণীর লোকেরা। (১০)

ফরাজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে জনৈক হাজী শরিয়ৎউল্লার নাম শোনা যায়। ইনিও তিতু মীরের মত মক্কায় যান এবং সেখান থেকে ফিরে

মুসলমান কৃষকদের মনে সাম্য ও মৈত্রীর এই উচ্চ আদর্শ সাড়া জাগাল। দলে দলে তারা তিতুর পতাকাতলে সমবেত হল।

ওয়াহবী কৃষকদের এই সম্মেলন স্থানীয় জমিদারদের আতঙ্কিত করে তুলল।

ইছামতী নদীর তীরস্থ পুর্ণা গ্রামের জমিদার কৃষ্ণ রায় ওয়াহবীদের কার্য-কলাপে, বিশেষ করে স্থানীয় কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে ভীত হয়ে পড়েন এবং তাদের শক্তি খর্ব করার উদ্দেশ্য নিয়ে ওয়াহবী প্রজামাত্রকে বাধ্য করলেন মাথা-পিছু আড়াই টাকা করে কর দিতে। শুধু তাই নয়, তিনি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে ওয়াহবীদের উপর ধার্য এই করটিকে 'দাড়ির উপর কর' (ওয়াহবীদের দাড়ি রাখা বাধ্যতামূলক ছিল) বলে অভিহিত করেন। পুর্ণা গ্রাম থেকে এই কর আদায় করার পরে উপরোক্ত জমিদার নিকটবর্তী আর একটি গ্রাম সরফরাজপুর থেকেও এই কর আদায় করতে চেষ্টা করেন। তখন স্থানীয় ওয়াহবী কৃষকেরা একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

বিদ্রোহীরা স্থানীয় জমিদারের কাছারী আক্রমণ করে। নিকটবর্তী নীলকুঠি পুড়িয়ে দেয়। নীলকুঠির সাহেবদের নাজেহাল করে। স্থানীয় দারোগা জমিদারের কাছে ঘুষ খেয়ে তাদের মিথ্যা মামলায় জড়াতে চেষ্টা করে। তারা উপরোক্ত দারোগাটিকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

হিন্দু জমিদারেরা এই কৃষক বিদ্রোহটিকে সাম্প্রদায়িক ঘটনা বলে প্রচার করতে থাকে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্থানীয় জমিদার একটি মসজিদ পুড়িয়ে দেয়। ওয়াহবীরা প্রতিবাদে একটি স্থানীয় হিন্দু মন্দিরে ঢুকে গো-হত্যা করে। এইভাবে বিদ্রোহটিকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পথে পরিচালিত করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ওয়াহবী আন্দোলনটি মূলত কৃষক সংগ্রাম হওয়ায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত জমিদারেরাই ওয়াহবীদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। এই কারণে ওয়াহবীদের বিরোধিতা করেছিল যে সব ধনী মুসলমান তারাও রেহাই পায় নেই। জনৈক স্থানীয় মুসলমান জমিদারের বাড়ী ওয়াহবীরা আক্রমণ করে ও তার সমস্ত সম্পত্তিও তারা লুণ্ঠন করে। (৭)

বিদ্রোহী ওয়াহবীরা কয়েকটি সশস্ত্র বাহিনীতে বিভক্ত ছিল। তাদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন গোলাম মাসুম। প্রধান সেনাপতির অধীনে থাকত

'সর্দার'। প্রতিটি সর্দারের অধীনে থাকত একদল সশস্ত্র কৃষক। কিছুদিনের জন্যে বিদ্রোহীরা নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা জানিয়ে দিল যে—ইওরোপীয়েরা বে-আইনীভাবে এ-দেশের কর্তৃত্ব দখল করেছে। কাজেই এই বে-আইনী দখল অবসান করে আইন-সঙ্গত অধিকারে তারা আবার মুসলমান-রাজ প্রতিষ্ঠা করবে। (৮)

বারাসত ও নদীয়ার রাজকর্মচারীরা কলকাতায় এই বিদ্রোহের খবর পাঠালেন এবং তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে জানালেন পুরোদস্তুর সৈন্যবাহিনী ছাড়া এই বিদ্রোহ দমন করার কোনো উপায় নেই। ১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর ক্যালকাটা মিলিশিয়ার একটি বাহিনী এই অঞ্চলে পাঠানো হয়। কিন্তু এই বাহিনী বিদ্রোহীদের হাতে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়। তখন কলকাতা থেকে বেশী সংখ্যায় পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী পাঠানো হয়। বিদ্রোহীরা নারিকেলবেড়িয়া নামক স্থানে একটি বাঁশের কেল্লা তৈরি করে এবং এই কেল্লাকে প্রধান কেন্দ্র করে যুদ্ধ চালাতে থাকে।

তুমুল যুদ্ধের পরে কোম্পানীর সৈন্যবাহিনী বাঁশের কেল্লাটি দখল করে। বিদ্রোহের প্রধান নেতা তিতু মীর যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। অবরুদ্ধ কেল্লা থেকে ৩৫০ জন ওয়াহবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিতুর প্রধান সহকর্মী হিসাবে জনৈক নেতাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিতুর অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে ১৪০ জনকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ফরাজী আন্দোলন

তিতু মীরের বিদ্রোহ দমনের পরেও মুসলমান কৃষকদের মধ্যে ওয়াহবী আন্দোলনের প্রচার চলতে থাকল। ১৮৩৮ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে প্রায় একটানা এক সংগ্রাম ওয়াহবীরা চালিয়ে যায়। এই সময়ে এই আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে ফরিদপুর।

ফরিদপুরের আন্দোলনকারীরা 'ফরাজী' নামেই সমধিক খ্যাত। (৯) বারাসতের ওয়াহবী আন্দোলনের মতই এই আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল নিম্নশ্রেণীর লোকেরা। (১০)

ফরাজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে জনৈক হাজী শরিয়ৎউল্লার নাম শোনা যায়। ইনিও তিতু মীরের মত মক্কায় যান এবং সেখান থেকে ফিরে

এসে ধর্ম সংস্কারক হিসাবে প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র দুদু মিঞা ফরাজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

তদানীন্তন কালের জনৈক পুলিস কমিশনার তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন দুদু মিঞা প্রচণ্ড প্রভাবশালী ব্যক্তি, ৮০ হাজার শিষ্য এই দুদু মিঞার নির্দেশ অনুসারে যে কোনো কাজ করতে সর্বসময়ে প্রস্তুত।

দুদু মিঞা ছিলেন আন্দোলনের প্রধান নেতা। তাঁর অধীনে থাকতেন খলিফা, সর্দার প্রভৃতিরা। তারা জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াত এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ধর্মান্দোলন চালানোর জন্যে অর্থ সংগ্রহ করত। ফরাজীরাও প্রচার করত তারা এ-দেশ থেকে কোম্পানী রাজত্বের উচ্ছেদ করবে ও মুসলমান রাজত্ব পুনঃসংস্থাপন করবে। (১১)

দুদু মিঞা ও তাঁর শিষ্যেরা প্রচার করতেন—মানুষ মাত্রেই সমান, ভগবানের জগতে উচ্চ নীচ ভেদ নেই, তাই বড়লোকদের গরীবদের উপর কোনো রকমের কর বসাবার অধিকার নেই। (১২) জমিদারদের জুলুম থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে দুদু মিঞা ছিলেন অগ্রণী। এই সময়ে জনৈক হিন্দু জমিদার পুজা-পার্বণের জন্যে বে-আইনী কর আদায় করতেন। দুদু মিঞার নেতৃত্বে কৃষকেরা এই বে-আইনী কর দিতে অস্বীকার করে। স্থানীয় নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচার থেকেও দুদু মিঞা স্থানীয় কৃষকদের রক্ষা করতে সচেষ্ট হন। দুদু মিঞার নেতৃত্বে কৃষকেরা ১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৪৬ সালের মধ্যে কয়েকবার জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। এইজন্যে দুদু মিঞাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু দুদু মিঞার প্রভাব প্রতিপত্তি এত বেশি ছিল যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজী হল না। ফলে তাঁকে বে-কসুর খালাস করে দিতে হয়। ১৮৪৬ সালে ডিসেম্বর মাসের ৫ই তারিখে দুদু মিঞার নেতৃত্বে ফরাজীরা পঞ্চচরের নীলকুঠি এবং জমিদার বাড়ি লুঠ করে। নীলকর ও জমিদার দুদু মিঞার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে।

সংগ্রামে বার বার নেতৃত্ব দেওয়ায় দুদু মিঞাকে সারা জীবন দুঃখবরণ করতে হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারেন এই অভিযোগে দুদু মিঞাকে জেলে আটক রাখা হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ

সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫—৫৭) প্রারম্ভ ১৮৫৫ সালে। (১৩) যে অঞ্চলে বিদ্রোহ প্রসারিত হয়েছিল সেটি ছিল তদানীন্তন বাঙলার অন্তর্গত। বর্তমানে যাকে আমরা সাঁওতাল পরগণা বলি সেই অঞ্চল, বর্তমান বীরভূম জেলাস্থিত কোনো কোনো অঞ্চল, ভাগলপুর জেলাস্থিত অঞ্চল, ও মুর্শিদাবাদের একাংশ, এই বিস্তৃত স্থান জুড়ে এই বিদ্রোহ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। কলকাতা থেকে একশো মাইলের মধ্যে এই বিদ্রোহের ঘটনাস্থল ছিল অবস্থিত।

১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে ভাগনাদিহির মাঠে দশ হাজার সাঁওতাল সিধু ও কানুর নির্দেশ শোনার জন্যে জড়ো হয়েছিল। সেই থেকে বিদ্রোহ যতই ব্যাপক আকার ধারণ করে, ততই হাজারে হাজারে (কখনও ১০ হাজার, কখনও ৩০ হাজার) সাঁওতালেরা যোগ দিতে থাকে।

প্রথম দিকে এই বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে ভাগলপুর থেকে মুঙ্গের—এই অঞ্চলটি। এই অঞ্চলে ডাক চলাচল একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়। এই ব্যাপক বিদ্রোহের সামনে ইংরেজ সেনাবাহিনী বার বার নাজেহাল হতে থাকে।

একই সঙ্গে গোদা, পাকুড়, মহেশপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভুমের বিভিন্ন অংশেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই অঞ্চলের জমিদারেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। দেওঘরের ম্যাজিস্ট্রেটও পলায়ন করেন। মহেশপুরে সিধুর নেতৃত্বে ৫০,০০০ হাজার সাঁওতাল কোম্পানীর সৈন্যের গতিরোধ করে।

কোম্পানীর বড়কর্তারা ভয়ার্ত হয়ে সাঁওতাল এলাকাগুলিতে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করলেন। বিদ্রোহের প্রধান নেতাদের ধরিয়ে দেবার জন্যে মাথা পিছু ১০,০০০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ৩৭শ, ৭ম, ৩১শ রেজিমেণ্ট, হিল রেঞ্জার্স এবং ৪০, ৪২, ও ১৩ রেজিমেণ্ট প্রভৃতিকে এই বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ করা হল।

কিন্তু তবুও বিদ্রোহ পুরোপুরি দমন করা সম্ভব হল না। ইংরেজ বড় কর্তারা আতঙ্কিত হয়ে লিখলেন—এখনও স্থানে স্থানে সাঁওতালেরা সশস্ত্র হয়ে ঘোরাফেরা করছে, তাদের সংখ্যা কম পক্ষে ৩০,০০০ হাজার। তাঁরা চিন্তিত হয়ে মন্তব্য করলেন—এখনও সাঁওতালদের আত্মসমর্পণ করার

চিহ্নমাত্র দেখছি না। আত্মসমর্পণ করা দূরে থাক, সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি আবার আগুন জ্বলে উঠল। ১২ হাজার থেকে ১৪ হাজার সাঁওতালের পদধ্বনিতে কোম্পানীর শাসন আবার নতুন করে টলে উঠল।

নিরুপায় হয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এই অঞ্চলে ঘোষণা করল সামরিক আইন। নিরঙ্কুশ সন্ত্রাস রাজত্ব সৃষ্টি করে কোম্পানী শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করল।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল মূলত কৃষক বিদ্রোহ। কোম্পানীর আমল শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত সাঁওতালদের জীবন যাত্রার ধারা ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন। কোম্পানীর রাজত্ব ক্রমেই দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করতে থাকল। সাঁওতালদের বাসভূমিও বাদ পড়ল না। ক্রমশ কোম্পানীর রাজত্বের অঙ্গ হিসাবে এই অঞ্চলে দেখা দিল একদল রক্তচোষা জমিদার, নীলকুঠির সাহেব, দালাল, মহাজন, সরকারী আমলা, দারোগা প্রভৃতি। এদের সকলকে নিয়ে কোম্পানীর আমলে যে অভিনব নির্যাতন ব্যবস্থা সৃষ্টি হল স্পষ্টভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসাবেই সাঁওতাল বিদ্রোহের সূত্রপাত। শুধু জনকয়েক বাঙালী মহাজনের অত্যাচারের জন্যে এই বিদ্রোহ ঘটেছিল মনে করলে ভুল হবে।

মহাজনেরা অত্যন্ত চড়া সুদ আদায় করত, হিসাবের ব্যাপারে দুর্নীতির আশ্রয় নিত, সাঁওতালদের তারা যখন ধান চাল ধার দিত তখন ওজনে কম দিত। অথচ যখন সাঁওতালেরা ধান চাল শোধ দিতে আসত তখন ওজনে বেশি নিত। সেইজন্যে ধান চাল শোধ নেওয়ার সময় তারা যে ওজন ব্যবহার করত তাকে বলা হত কেনারাম বা বড় বউ। আর সাঁওতালদের ধার দেওয়ার সময় যে ওজন ব্যবহার করা হত তাকে তারা বলত বেচারাম বা ছোট বউ। সাঁওতালেরা অভিযোগ করত তাদের মূল ঋণের দশগুণ তারা শোধ দিত, তবুও তাদের ঋণ থেকে মুক্তি ছিল না। বরং দশগুণ দিয়েও তারা দেখত মহাজনেরা তাদের ফসল ও গরু কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের পরিবারকে ঋণের দায়ে ক্রীতদাসে পরিণত করছে।

মহাজন ছাড়া দালালদের বিরুদ্ধেও তাদের ছিল তীব্র বিক্ষোভ। তারা অভিযোগ করল—বারহাইত নামক স্থান থেকে নামমাত্র মূল্যে মহাজন ও দালালেরা প্রচুর পরিমাণে চাল, বোরা, সরিষা ও অন্যান্য তৈল বীজ গরুর গাড়িতে করে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত জঙ্গীপুরে নিয়ে যায়, সেখান থেকে

এই সব জিনিস প্রথমে মুর্শিদাবাদে ও পরে কলকাতায় চালান দেওয়া হয়। কলকাতা থেকে আবার প্রচুর সরিষা বিলাতে চালান দেওয়া হয়।

এ-ছাড়া অর্থলোভী জমিদারদের অত্যাচার ত ছিলই। অশিক্ষিত, নিরীহ সাঁওতালদের কাছ থেকে তারা আদায় করত চড়া হারে খাজনা, আর নানা ধরনের বে-আইনী আবয়াব, নজরানা প্রভৃতি।

নীলকুঠির সাহেবরা ছাড়া এই অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণের জন্যে আর একদল ইওরোপীয় বসবাস করত। উপরোক্ত সাহেব পুঙ্গবেরা সাঁওতাল মেয়েদের সতীত্বনাশের চেষ্টা করত, সাঁওতালদের জিনিসপত্র দাম না দিয়ে কেড়ে নিয়ে যেত, খুন জখম হল্লাবাজী করে সাঁওতালদের শায়েস্তা করতে চেষ্টা করত।

তাছাড়া স্থানীয় আমলা ও দারোগাদের জুলুম তাদের সর্বদা ধৈর্যচ্যুতি ঘটাত।

সাঁওতালদের মনের ব্যথা ও প্রতিজ্ঞা দুইই এক সঙ্গে গানের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছিল।

আমরা প্রজা, সাহেব রাজা, দুঃখ দেবার যম
তাদের ভয়ে হটবো মোরা এমনি নরাধম?
মোরা শুধু ভুখ্‌বো?
না, না মোরা রুখবো। (১৪)

বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সিধু ও কানুর সহিযুক্ত একটি ইস্তাহারের নকল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এই ইস্তাহারটিতে আবেদন হয়েছিল "সমস্ত গরীব জনসাধারণের কাছে।" ঠাকুরের নামে এই ইস্তাহারটি প্রচার করা হল। যুবা ঠাকুর নিজে যুদ্ধ করবে, কেষ্ট ঠাকুর ও রামচন্দ্র সহযোগী হবে,—এই মর্মে গরীব জনসাধারণকে আশ্বাস দেওয়া হল। আরও বলা হল ঠাকুরের নির্দেশে কৃষকেরা ভেরী বাজাবে এবং ঠাকুর ইওরোপীয় সৈনিক ও ফিরিঙ্গীদের মস্তক ছেদন করবে। সাহেবেরা যদি বন্দুক ও বুলেট নিয়ে যুদ্ধ করে, তাহলে সেই বন্দুক ও বুলেট ঠাকুরের ইচ্ছায় নিস্ফল হবে। (১৫)

ঠাকুরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সাঁওতালেরা গ্রাম থেকে গ্রামে বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়ে দিল। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্রোহের গান—

ও শিধো, শিধো ভাই, তোর কিসের তরে রক্ত ঝরে
কি কথা রইল গাঁথা, ও কানূহ তোর হুল হুল স্বরে,
দেশের লেগে অংগে মোদের রক্তে রাঙা বেশ
জান না কি দস্যু বণিক লুটলো সোনার দেশ।

সাঁওতাল নেতারা কোম্পানীর আমলের অবসান ঘোষণা করে এক স্বাধীন সাঁওতাল রাজ স্থাপনের কল্পনা করেছিল। তারা ঘোষণা করল আমলাদের অত্যাচারে সমস্ত আইন দোষদুষ্ট হয়ে পড়েছে এবং আমলাদের পাপে সাহেবরাও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। এই পাপের ফলে যে দেশ তারা বে-আইনী ভাবে দখল করেছে, তা তাদের হাতছাড়া হয়ে পড়বে।

সাঁওতালদের প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজ্যে কি ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরিকল্পনা ছিল তাও কিছুটা জানা যায়। তারা ঘোষণা করেছিল—তাদের রাজ্যে কাউকে খাজনা দিতে হবে না। প্রত্যেকে সাধ্যমত জমি চাষ করার অধিকার পাবে। তাছাড়া, সমস্ত ঋণ মকুব করে দেওয়া হবে। বলদ চালিত লাঙলের উপর এক আনা, আর মহিষ চালিত লাঙলের উপর ৬ আনা খাজনা ধার্য হবে। (১৭)

এই বিষয়গুলি থেকেই সাঁওতাল বিদ্রোহের কৃষক চরিত্র পরিষ্কার ফুটে উঠছে। এই বিদ্রোহের সময়ে স্থানীয় কুমোর, তেলি, কর্মকার, মোমিন (মুসলমান তাঁতী), চামার, ডোম প্রভৃতিরা সাঁওতালদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলঃ। এই বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার অপরাধে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল ২৫১ জনের মধ্যে ১৯১ জন সাঁওতাল, ৩৪ জন দ্বাস, ৫ জন ডোম, ৬ জন ধাঙড়, ৭ জন কোল, ১ জন গোয়ালা, ৬ জন ভুঁইয়া, ও ১ জন রাজওয়ার। এই বন্দীদের মধ্যে ছিল ৯ থেকে ১০ বছর বয়স্ক ৪৬ জন বালক।

বিদ্রোহীরা আক্রমণ ও খুন করেছিল মহাজন ও জমিদারদের, নীলকুঠির সাহেবদের এবং দারোগাদের। ছ'মাসের জন্যে এই বিদ্রোহ বাঙলা, বিহার ও ছোট নাগপুরের কয়েকটি অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের মূলোচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছিল। এতবড় ব্যাপক স্থানীয় কৃষক বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এর পূর্বে আর হয়নি।

১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান

উপরোক্ত কৃষক বিদ্রোহগুলির পাশাপাশি বাঙলায় তথা ভারতে অনেকগুলি সেনাবিদ্রোহের সংবাদও পাওয়া যায়।

১৭৬৪ খ্রীঃ যখন ইংরেজরা নবাব মীর কাশিমের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ঠিক সেই সময়ে দেশীয় সিপাইদের একটি ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নবাবের পক্ষে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিদ্রোহীদের ২৪ জনকে কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। (১৮)

তারপরে ১৮২৪ খ্রীঃ ব্যারাকপুরে দেশীয় সিপাহীদের আর একটি বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া যায়। এই বিদ্রোহের নেতাদেরও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

কাজেই দেখা যায় ১৮৫৭ সালের আগেই জনসাধারণের দুটি প্রধান অংশ—কৃষক ও সৈনিক বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিল। এই সঙ্গে স্মরণীয় যে কৃষক পরিবার থেকেই সৈন্যবাহিনী সংগৃহীত হত। কাজেই কৃষক বিদ্রোহগুলির প্রভাব যেমন সৈনিকদের উপর পড়ত, তেমনি সেনাবিদ্রোহের প্রভাব আবার কৃষকদের উপরেও পড়ত।

১৮৫৭ সালের অব্যবহিত পূর্বে উত্তর ভারতে কৃষক ও সিপাইদের অবস্থা কতকগুলি কারণে সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল।

১৮৫৭ সালের আগে অযোধ্যার নবাবকে ইংরেজরা সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে। ইংরেজরা পূর্বেকার নবাবের সেনা-বাহিনীর অন্তর্গত ৬০ হাজার লোককে বরখাস্ত করে। (২০)

তাছাড়া, অযোধ্যায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে রাজস্বের চাপও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিদ্রোহের আগে ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন রাজস্ব-ব্যবস্থার অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ৭৫,০০০ হাজার সিপাই ১৪,০০০ হাজার আবেদন-পত্র পেশ করে। (২১) তাছাড়া, ২৫,০০০ ব্রাহ্মণ সিপাহীর দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। (২২)

উপরোক্ত ঘটনাগুলি অযোধ্যার সিপাহীদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল। অথচ অযোধ্যাই ছিল 'বেঙ্গল আর্মির' প্রধান রিক্রুট কেন্দ্র। এই 'বেঙ্গল আর্মির' অন্তর্ভুক্ত সিপাইরা মীরাট, দিল্লী, কানপুর, রোহিলখণ্ড, আগ্রা, পাটনা, কলকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে কাজে নিযুক্ত থাকত। কাজেই অযোধ্যা থেকে

এই বিক্ষোভ সমস্ত 'বেঙ্গল আর্মিতে' অর্থাৎ সুদূর মীরাট থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংক্রামিত হল। এই সিপাইরা অধিকাংশ ছিল অশিক্ষিত, পশ্চাৎপদ। কাজেই এই অসন্তোষ অনেক সময় অত্যন্ত স্থূলভাবে প্রকাশ পেতে থাকল। ইংরেজ শাসনে ধর্মনাশ জাতিনাশের ভয় উপস্থিত—এই বলে তারা দেশের লোককে উত্তেজিত করল। তাদের প্রচারে এবং অগণিত কৃষকদের সমর্থনে দেশে গোরা-বিদ্বেষ, পাদরী-বিদ্বেষ, চরমে উঠল। এমন সময় চর্বি মিশ্রিত টোটার কথা প্রচারিত হল, ধূমায়িত আগুনে যেন দেশলাইয়ের কাঠি পড়ল।

বিদ্রোহী সিপাইরা উত্তর ভারতে কৃষক, কারিগর ও নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন লাভ করল। অনেক সময়ে কৃষকেরা সুযোগ বুঝে নিজেরাই কোনো কোনো অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তাছাড়া সিপাইরাও ছিল অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন কৃষক পরিবারের সন্তান। কাজেই তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সমগ্র কৃষক সমাজের মনে প্রেরণা জাগাল। কৃষকদের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন—মীরাটে যখন সিপাইরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে "তখন মীরাটের বাজার ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের উত্তেজিত লোকে উন্মত্ত সিপাহীদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল।···ইহারাও ইংরেজের সর্বনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।" (২৩)

মীরাটের বিদ্রোহী সিপাইরা যখন দিল্লী অভিযান করে তখন স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে। এই সময়ে মথুরার সন্নিকটে একটি অঞ্চলে কৃষকেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। জনৈক কৃষক নিজেকে 'রাজা' বলে ঘোষণা করে। কিন্তু এই দাবি কাজে পরিণত করার মত সামরিক শক্তি ঐ কৃষকের ছিল না। ফলে তাকে আগ্রার দুর্গে বহুদিন যাবৎ বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল। (২৪)

কানপুরেও বিদ্রোহী সিপাইদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিল স্থানীয় জনসাধারণ। "নগরের অনভিজ্ঞ ও উত্তেজিত জনসাধারণ ইংরেজের অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার আশায়, সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে সঙ্কুচিত হয় নাই। এই বিপ্লবে প্রধানত জনসাধারণই সিপাহীদিগের

দল পরিপুষ্ট করিয়াছিল।" (২৫) জনসাধারণের সাহায্য পেয়ে সিপাইরা কানপুরের সন্নিকটে নবাবগঞ্জের ট্রেজারী আক্রমণ করে, জেল-গেট খুলে দিয়ে সহকর্মীদের মুক্ত করে; ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিস ও আদালত গৃহে রক্ষিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত দলিলগুলি নিয়ে বহ্নুৎসব করে। (২৬)

লক্ষ্ণৌতেও সিপাইদের পক্ষে কৃষক ও জনসাধারণের সক্রিয় যোগদানের সংবাদ পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌতে রাজপুত জাতীয় বহু তালুকদার বাস করত। তাদের সশস্ত্র অনুচর থাকত। এদের বলা হত 'রাজওয়ারা'। বিদ্রোহের সময় তালুকদারদের সঙ্গে এই 'রাজওয়ারা' বাহিনীও সিপাইদের পাশে এসে দাঁড়ায়। রাজওয়ারা বাহিনী ছিল প্রধানত হিন্দু, অথচ তারা মুসলমান সেনাপতিদের নেতৃত্বে অসীম বীরত্বের সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। (২৭)

রোহিলখণ্ড, আগ্রা, সাহারানপুর, কাশী ও বিহারের সাহাবাদ জেলাতেও স্থানীয় জনসাধারণ ও কৃষকদের বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে যোগদানের সংবাদ পাওয়া যায়। জনৈক ইংরেজ লেখক মন্তব্য করেছেন—উপস্থিত বিপ্লব যদি কেবল সৈনিকদের অভ্যুত্থান বলে পরিগণিত হত, অধিকারচ্যুত রাজারা এবং দেশের কৃষিজীবী, পল্লীবাসী রাইয়তগণ যদি সিপাইদের সঙ্গে এক উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হয়ে না উঠত, তাহলে সিপাইদের অতি অল্প সংখ্যকই ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করত। (২৮)

মোট কথা, এই কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে উত্তর ভারতে পল্লীতে পল্লীতে গ্রামবাসীরা ও শহরের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এই বিদ্রোহের রিজার্ভ বাহিনী হিসাবে কাজ করেছিল। কৃষক ও জনসাধারণের সমর্থনের ফলেই এই বিদ্রোহ এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

অবশ্য, কৃষক ও জনসাধারণের সোৎসাহ যোগদান সত্ত্বেও ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহটিকে মূলত একটি কৃষক বিদ্রোহ বলে অভিহিত করা মোটেই সঙ্গত হবে না। তখনকার কালে কৃষক ও সিপাইদের চেতনা ছিল নিম্নস্তরের। তাদের বিক্ষোভ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কৃষক ও সিপাইদের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহকে স্থানীয় সামন্ত প্রভুরা—দেশীয় রাজা, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতিরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগিয়েছিল।

অনেক সময়ে সিপাহীরা নিজেরাই নিজেদের অক্ষমতার দরুন এই সামন্ত-প্রভুদের নেতৃত্ব বরণের জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

বিদেশী ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজা, জমিদার ও তালুকদার-দেরও বিক্ষোভ ছিল। বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বে ইনাম কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন অযোধ্যার তালুকদারদের নিজ স্বত্ব প্রমাণের জন্যে দলিল পত্র দাখিল করতে আদেশ দেয় এবং এই দলিল পত্র দাখিল করতে না পারায় প্রায় ২০,০০০ হাজার তালুকদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। (২৯) কাজেই বিদ্রোহ যখন ঘনীভূত হয়ে উঠল তখন অযোধ্যার তালুক-দারেরাও তাদের সশস্ত্র অনুচর বাহিনী নিয়ে যোগদান করে।

তাছাড়া, ১৮৫৭ সালের আগে এই অঞ্চলে বহু জমিদার বংশপরম্পরায় নিষ্কর জমি ভোগ করত। ইংরেজ রাজস্ব কর্মচারীরা এই সম্পত্তির ভোগদখলের সপক্ষে প্রমাণাদি দাখিল করতে আদেশ দেয়। প্রমাণাদি উপস্থিত করতে না পারায় অনেকের জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

তখনকার দিনের প্রভাবশালী দেশীয় রাজাদেরও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে নানারকমের অভিযোগ ছিল। এই সময়ে লর্ড ডালহৌসী স্বত্ব বিলোপ নীতি অনুযায়ী সাতারা, ঝাঁসী, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তারপরে অযোধ্যার দেশীয় রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। নানা সাহেবেরও রাজকীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়। দিল্লীর বাদশা বাহাদুর শাহের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। তাঁর উত্তরাধিকারীদের দিল্লীর কেল্লা ও রাজপ্রাসাদ থেকে অপসারিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কাজেই দেশীও রাজারাও ইংরেজের বিরুদ্ধে যোগদানের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন।

সিপাইরা যখন দিল্লী অধিকার করে সম্রাট বাহাদুর শার সম্মুখে গিয়ে বলল —আপনি আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। তখন দ্বিধাচিত্ততা সত্ত্বেও বাহাদুর শাহ সিপাইদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হন।

ঠিক এইভাবেই কানপুরে দেশীয় অফিসার ও সিপাইরা নানা সাহেবের কাছে গিয়ে বলল—মহারাজা, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন তবে আপনি সাম্রাজ্যের অধিকারী হতে পারেন। আর যদি আপনি শত্রুপক্ষে যোগদান করেন তবে মৃত্যু আপনার সম্মুখে। নানাসাহেবের পক্ষে উত্তর দিতে

বিলম্ব হয়নি—"ব্রিটিশের সঙ্গে আমি যোগ দিতে যাব কেন? আমি সম্পূর্ণ তোমাদের।" (৩০)

দেশীয় রাজা ও সামন্তপ্রভুদের যোগদানের ফলে উত্তর ভারতে বিদ্রোহটি সর্বশ্রেণীর সর্বস্তরের মানুষের একটি জাতীয় অভ্যুত্থানে পরিণত হতে পেরেছিল।

অবশ্য, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলতে যা বোঝায় সেই ধরণের আন্দোলন এটি নয়। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পূর্ব শর্তগুলি তখনকার ভারতীয় সমাজে উপস্থিত ছিল না। কাজেই এটি জাতীয় অভ্যুত্থান এই অর্থে যে শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমগ্র দেশের মানুষ বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, তাঁদের ধারণা অনুযায়ী দেশের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল।

এই বিদ্রোহের সময় যে-সব ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয়েছিল তার থেকেই পরিষ্কার হয় যে বিদ্রোহের নেতারা বিদেশী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জমিদার, বণিক, সরকারী কর্মচারী কারিগর, পণ্ডিত, ফকির, এক কথায়—সমস্ত দেশের মানুষকে একজোট করার চেষ্টা করেছিলেন। (৩১) এই ঘোষণাপত্রগুলিতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উপরও যথেষ্ট জোর দেওয়া হত। একটি ঘোষণাপত্রে হয়েছে বলা "হিন্দু ও মুসলমানদের এই সংগ্রামে মিলিত হতে হবে। বিদ্রোহীদের প্রভাবশালী লোকদের উপদেশ অনুযায়ী দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে, গরীব শ্রেণীর লোকেরা যাতে সন্তুষ্ট থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে, গরীবদের উচ্চতর সম্মান ও পদবী দান করে তাদের মানসিক বল উন্নত করতে হবে।" (৩২)

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য অক্ষুন্ন রাখার জন্যে গো-হত্যা বে-আইনী করা হয় এবং এই আইন ভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। কানপুরে জনৈক মুসলমান কসাই গো-হত্যা করে। শাস্তি হিসাবে তার অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছিল। আরও কয়েকজনকে অন্যায় উপায়ে জীবিকা অর্জনের জন্যে শাস্তি প্রদান করা হয়। (৩৩)

এই বিদ্রোহের সময় ইংরেজ শাসকেরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ঘটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। স্যার হেনরী লরেন্স লর্ড ক্যানিংকে লেখেন—"আমি দুটি সম্প্রদায়ের ভেদ-বুদ্ধির দিকে তাকিয়ে আছি। কিন্তু অযোধ্যার

লেফটেনাণ্ট গভর্ণর রাসেল কলভিল আক্ষেপ করে বলেছেন—বিদ্রোহের সময়ে…হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের সুযোগ নিতে পারা যায়নি। (৩৪)

হিন্দু-মুসলমান সৈন্যেরা একযোগে শুধু লড়াই করেনি। হিন্দু সৈন্যেরা মুসলমান সেনাপতি বা মুসলমান মৌলবীর নেতৃত্বে যুদ্ধ করছে—এই ধরনের ঘটনারও অভাব নেই।

তখনকার দিনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ছিল অতি অল্প। তাছাড়া হিন্দুস্থানী, মারাঠি, রাজপুত, জাঠ, রোহিলা প্রভৃতিদের মধ্যে নানা রকমের রেষারেষি ছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহের সময়ে জাঠ, রোহিলা, হিন্দুস্থানী, রাজপুত, মারাঠি, প্রভৃতি সকলেই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক সম-স্বার্থবোধের সন্ধান পেয়েছিল।

জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—"ভারতের মানুষের মধ্যে যেহেতু নানা জাতি, নানা ধর্ম, নানা মনোভাব ও নানা স্বার্থ, তাই অনেক সময়ে ধরে নেওয়া হয় যে কোন অবস্থাতেই 'ভারতের জনগণের' পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। ইওরোপীয় প্রভুত্বের বেলায় এই কথাটি খাটে না—নিজেদের মধ্যে বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতীয়দের এমন কতকগুলি বিশিষ্ট স্বার্থ, ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা বর্তমান যেগুলি তাদের পশ্চিমী জাতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে। তাদের নিজেদের যতই পার্থক্য থাকুক, আমাদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ভিন্ন জাতের। নিজেদের মধ্যে তাদের ঐক্য-সূত্র হাজার রকমের। তারা এই দেশের অধিবাসী, আর ব্রিটিশেরা হল বিদেশী, ফিরিঙ্গী।" (৩৫)

সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তরের মানুষের এই অভ্যুত্থানটি ইংরেজ শাসনকে জোর নাড়া দিল। সিপাইরা ১০,০০০ হাজার বর্গমাইলের ওপর তাদের প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। বিদ্রোহীদের দখলীকৃত অঞ্চলে অন্ততপক্ষে ৩৮,০০০,০০০ লোকের বসতি ছিল। বিশ্ব ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এতবড় আঘাত সেদিন আর কোনোও উপনিবেশ দিতে পারেনি। তাই এই অভ্যুত্থান শুধু ভারতের মানুষকেই উজ্জীবিত করেনি, সারা দুনিয়ায় যারাই ঔপনিবেশিকতার দ্বারা নিষ্পেষিত হয়েছিল তাদের সবার মনেই প্রেরণা জুগিয়েছিল। বস্তুত এই সময়ে চীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ প্রভৃতি দেশে

বিশ্ব ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেসব বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল তার সঙ্গে ভারতের এই জাতীয় অভ্যুত্থানটি ছিল একসূত্রে বাঁধা।

ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতার বশে শুধু রাশিয়ার জার, আর ইরাণের শাহ এই বিদ্রোহের প্রতি আকৃষ্ট হননি, বিদেশী শাসনে নিষ্পেষিত; স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষের যাঁরা ছিলেন আন্তরিক বন্ধু— জার্মানীতে কার্ল মার্কিন, ইংলণ্ডে (কবি আর্ণেষ্ট জোন্স প্রভৃতি), রাশিয়ায় (চেরনিশেভস্কি, দব্রুলুবভ প্রভৃতি) তাঁরাও এই বিদ্রোহের প্রতি জানিয়েছিলেন তাঁদের নৈতিক সমর্থন।

এই বিদ্রোহ যদি সফলতা লাভ করত তাহলে ভারতের ইতিহাসে একটি নবযুগের সূচনা হত। কেউ কেউ বলে থাকেন—এই বিদ্রোহ সফলতা লাভ করলে ভারত নাকি রসাতলে যেত, ভারতে দেখা দিত আবার স্বাধীন বিকাশের নামে মুঘল আমলের সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচার। উপরোক্ত ধারণাটি ভুল।

দেশীয় রাজা ও সামন্তপ্রভুদের হাতে নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহের প্রাণশক্তি ছিল ভারতের জনসাধারণ। এই অভ্যুত্থানটির সময়ে গণ-উদ্যম অবারিতভাবে মুক্ত হয়েছিল। এই জন্যেই এই বিদ্রোহের পরিচালনায় এক ধরনের স্থূল ও কাঁচা গণতান্ত্রিক চেতনার পূর্বাভাস দেখা যায়। এই চেতনার উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে বাহাদুর শাহ সম্রাট বলে ঘোষিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেনসৈন্যদের দ্বারা নির্বাচিত বাদশা। বাদশা হয়েও পুরানো দিনের স্বৈরাচারী ক্ষমতা তিনি ফিরে পাননি। বরং তাঁকে সিপাহীদের বিদ্রোহী সমিতির পরামর্শ অনুযায়ীই চলতে হত। (৩৬) কানপুরে নানা সাহেবকেও নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত করে সিপাইরা। নানা সাহেবও সৈনিক ও নগরবাসীর পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন তার প্রমাণ আছে। নানা কানপুরে যে পৌর সংগঠন গড়ে তোলেন তার প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট পদে জনৈক হুলাস সিং নিযুক্ত হন। এই হুলাস সিংকে নিয়োগ করা হয়েছিল শহরের প্রধান প্রধান অধিবাসীদের একটি ডেপুটেশনের উপদেশ অনুযায়ী। (৩৭) কানপুরে দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্যে যে আদালত গঠন করা হয়েছিল তারও স্বাধীনভাবে চলার যথেষ্ট অধিকার ছিল। বিদ্রোহী পরিচালিত এই আদালতটি_জনপ্রিয় আদালত হিসাবে কাজ করতে সচেষ্ট ছিল। (৩৮) অযোধ্যায় উর্ধতন অফিসারেরা সাধারণ

সিপাইদের দ্বারা নির্বাচিত হত। অফিসারেরা আবার সেনাপতি মনোনয়ন করত। (৩৯)

এই ঘটনাগুলি ছাড়া বিদ্রোহের প্রকৃতি বিচারের সময়ে এই কথাটিও অবশ্যই মনে রাখার প্রয়োজন যে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পর্বে এই অভ্যুত্থানটির হয়েছিল আবির্ভাব।

এই সময়ে বিশ্বে সামন্ততন্ত্রের বদলে পুঁজিতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে এবং পুঁজিতন্ত্রের অগ্রগতি আরম্ভ হয়েছে।

অত্যন্ত খণ্ডিত আকারে বিদেশী প্রভুত্বে এই নতুনতর পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার কতকগুলি উপকরণ (যেমন ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা, রেলপথ, টেলিগ্রাফ প্রবর্তন, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন, বুর্জোয়া ভাবধারায় উদ্দীপ্ত এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উত্থান ইত্যাদি) ভারতের মাটিতেও তখন দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায়, বিদ্রোহ সফলতা লাভ করলে ভারতে সামন্ততন্ত্র ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না; বরং এই বিদ্রোহের সাফল্যে ভারতে উন্নততর সমাজ বিকাশের ধারাটি অর্থাৎ পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের ধারাটিই কথঞ্চিৎ অগ্রসর হতে পারত। (৪০)

কিন্তু রীতিমত ঐতিহাসিক কারণেই এই সম্ভাবনা দানা বাঁধতে পারেনি।

ভারতের মাটিতে ধনতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় কতকগুলি উপকরণের জন্ম হলেও, এই সময়ে নতুন বুর্জোয়া ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত যে বুদ্ধিজীবীদের জন্ম হয়েছিল তারা ছিল অত্যন্ত দুর্বল, অনেক দিক থেকে ব্রিটিশের উপর নির্ভরশীল। অথচ এই শ্রেণীটি এই অভ্যুত্থানের যদি নেতৃত্ব নিতে পারত তাহলে বিদ্রোহের সফলতার সম্ভাবনা অনেক বাড়ত। কিন্তু তখনকার ঐতিহাসিক পর্বে এই শ্রেণীটির পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এই অবস্থায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবার কাজটি এসে পড়ল তখনকার দিনের সমাজের নেতা দেশীয় রাজা ও সামন্ত প্রভুদের উপর।

এই দেশীয় রাজা ও সামন্ত প্রভুরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিজ নিজ স্বার্থে এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। দুচারটি ক্ষেত্রে ব্যতীত এই নেতাদের কোনো উচ্চ দেশপ্রেমিক ভাবাদর্শ ছিল না। এবং সেইজন্যই তারা যখন ইংরেজের জয়ের সম্ভাবনা দেখতে পেল তখন অনেকেই বিদ্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পশ্চাৎপদ হয়নি। লক্ষ্মী বাঈ, তাঁতিয়া তোপী, কুমার সিংহের মত

বীর সামন্ত নেতা থাকলেও বেশির ভাগ সামন্ত প্রভু পদে পদে দ্বিধাচিত্ততা দেখিয়েছিল। এবং শেষ মুহূর্তে কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

তাছাড়া, ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে এই সামন্ত প্রভুরা নেতা থাকার ফলেই বিদ্রোহ আশানুরূপ গভীরতা অর্জন করতে পারেনি। দেশীয় রাজা, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি ছিল অত্যাচারী শ্রেণী। কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাত তারা। এই অত্যাচারী শ্রেণীগুলির নেতৃত্বে বিদ্রোহ পরিচালিত হওয়ার ফলে কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের উদ্যম অবারিত গতিতে প্রকাশের সুযোগ পায়নি। সাময়িকভাবে উচ্চ নীচ উভয় শ্রেণীই বিদেশী ইংরেজের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলেও বিদ্রোহের অভ্যন্তরে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যে বিরোধ ছিল তা বিদ্রোহের গতিকে নিঃসন্দেহে অনেকটা আড়ষ্ট করে রেখেছিল। (৪১) অনেক সময়ে জনতার শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনায় ভীত হয়ে উচ্চশ্রেণীভুক্ত নেতারা ব্রিটিশের সঙ্গে আপোষ করতেও অগ্রসর হত।

তাছাড়া, সামন্ত নেতা ও মৌলবীরা জাতি, ধর্ম ইত্যাদির নামে জনতার কাছে আবেদন জানাত। সাময়িকভাবে জাতি, ধর্ম ইত্যাদির আবেদন কার্যকরী হলেও চরম বিচারে এইগুলি বিদ্রোহের সম্ভাব্য শক্তিকে অনেকটা রুদ্ধ করে রেখেছিল।

নিম্নশ্রেণীগুলির চেতনার অভাব ও উচ্চ শ্রেণীগুলির সংকীর্ণতা এই বিদ্রোহের বিপর্যয় করে তুলেছিল অবধারিত।

১৮৫৭ ও বাঙলা

১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থানের সময়ে বাঙলা দেশ ঝড় ঝাপটার বাইরে ছিল—একথা মনে করলে ভুল হবে।

একথা ঠিক, বাঙলা দেশে তখনকার দিনের শহুরে সমাজের যারা নেতা সেই ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা এই বিদ্রোহের সময়ে যথাসম্ভব নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে চলেছিল।

একথাও ঠিক যে বাঙলা দেশে বহরমপুরে, ব্যারাকপুরে, জলপাইগুড়ি ও চট্টগ্রামে যখন সিপাইরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে তখন স্থানীয় সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের সোৎসাহ সমর্থনেরও কোনো বিশেষ নজির নেই।

তবুও একটা কথা অনস্বীকার্য যে ফরাজী, চোয়াড়, সাঁওতাল প্রভৃতি যারা

বহুদিন ধরে বাঙলা দেশের কৃষক সংগ্রামের এক গৌরবময় ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল তারা এই অভ্যুত্থানের মুহূর্তটিতে পুনরায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল এবং এই জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রতি সমর্থন জানাতে চেষ্টা করেছিল।

ফরাজী নেতারা সিপাহীদের সমর্থনে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্যে রাত্রে সভা করছে, ঘন ঘন মিলিত হচ্ছে, বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে —এই মর্মে বহু বেনামী চিঠি দিনাজপুর, ফরিদপুর ও যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে এসে পৌঁছাতে থাকে।

এই সময়ে ফরাজী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন দুদু মিঞা। তখন তিনি ছিলেন আলিপুরে জেলে বন্দী। পূর্বোক্ত বেনামী চিঠিগুলির মধ্যে একটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে দুদু মিঞা তাঁর জামাইয়ের কাছে বিদ্রোহে যোগদানের সংকল্প জানিয়ে একখানি চিঠি দিয়েছেন। দুদু মিঞার সমর্থনকারী হিসাবে প্রায় ২০ জন জমিদার স্থানীয় লোকের নামোল্লেখ করা হয়েছে। (৪২)

গরীবুল্লা নামে জনৈক ব্যক্তি ফরাজীদের কার্যকলাপ নিজে যা লক্ষ্য করেন তার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখলেন—মাহেদিগঞ্জ থানার অন্তর্গত চরপায়া (?) গ্রামের অধিবাসী গোলাম নবী কাসেদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হই। ঐ দিন রাত্রি এগারোটার সময় ২ জন হিন্দুস্থানী ঐ বাড়ীতে আসে। গোলাম কাসেদ নিজের ঘরে তাদের নিয়ে যায় এবং ১০।১২ জন ফরাজীকে ডেকে পাঠায়। সকলে ঐ ঘরে সমবেত হল এবং তারা সিদ্ধান্ত করল বৈঁচা ও মাহেদিগঞ্জ থানার অন্তর্গত সমস্ত ফরাজী (যাদের দলে রয়েছে ৫০০০ লাঠিয়াল ও সশস্ত্র মানুষ—যাদের খলিফা হল গোলাম নবুচাঁদ কাজী এবং ফকরুদ্দী মহম্মদ) হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঢাকা ও বাখরগঞ্জ জেলা থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন উচ্ছেদ করবে। (৪৩)

মালিকান্দার "সমস্ত খ্রীষ্টান অধিবাসী" আর একটি বেনামী আবেদনপত্রে ঢাকার কর্তৃপক্ষকে জানালেন—এই জেলার জনৈক ধনী জমিদার (নাম গরীব হোসেন চৌধুরী—জেলে অবরুদ্ধ দুদু মিঞা তাঁর আত্মীয়) ২৫০০০ হাজার লোক সংগ্রহ করেছে। এই ব্যক্তি বহুদিন যাবৎ দিল্লীরাজের বন্ধুস্থানীয়। এই ব্যক্তিটি সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ এবং এই উদ্দেশ্যে নিজের বাড়ীতে বন্দুক প্রস্তুত করছে। তাঁরা আরও জানালেন—এই

চৌধুরীকে জব্দ করার জন্যে যদি কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয় তাহলে বিষম ক্ষতি হবে। (৪৪)

উপরোক্ত বেনামী চিঠিগুলিতে হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপদটি একটু বড় করে দেখানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষও যে ফরাজীদের কার্যকলাপে ভীত হয়ে ওঠেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ফরাজী নেতা দুদু মিঞাকে (দুদু মিঞার পূর্বনির্ধারিত জেলের মেয়াদ এই সময়ে ফুরিয়ে এসেছিল) ১৮১৮ সালের রেগুলেশন-৩ বন্দী হিসাবে আলিপুর জেলে আটক রাখা হয়।

বিদ্রোহের সময়ে জুন মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ঢাকায় একটানা উত্তেজনা চলেছিল। ১২ই জুন তারিখে ঢাকায় সিপাহীদের মধ্যেও দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয়। এই সময়ে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ব্রেনান সাহেব একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেন—ঢাকার বে-সামরিক নাগরিকেরা বেশ শান্ত, তবে তাদের 'ভাইবোনেরা' যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তাতে তাদের উপর বেশি ভরসা করা যায় না। (৪৫) ঢাকা শহরে সিপাহীরা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করে নভেম্বর মাসের ২৬শে তারিখে।

চট্টগ্রামে ১৮ই নভেম্বর সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে, জেল ও অস্ত্রাগার দখল করে নেয়। বিদ্রোহীরা তারপরে ত্রিপুরা প্রবেশ করে। বিদ্রোহী সিপাইরা স্থানীয় পার্বত্য অধিবাসীদের কাছ থেকে সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করে। এই পার্বত্য অধিবাসীরা বিদ্রোহী সিপাইদের পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করেছিল।

পশ্চিম বাঙলার বাঁকুড়া, মেদেনীপুর ও মানভূম জেলায় চোয়ার ও সাঁওতালদের মধ্যে বিক্ষোভের খবর পাওয়া যায়।

হাজারীবাগ অঞ্চলে রামগড় ব্যাটালিয়নের বিদ্রোহের পরে এই অঞ্চলের চোয়ার ও সাঁওতাল অধিবাসীদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা যায়। ছোট-নাগপুরে কোল ও হাজারীবাগে সাঁওতালেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় অবস্থিত সাখাবতী ব্যাটালিয়নের মধ্যে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। বাঁকুড়া অঞ্চলে চোয়ার ও সাঁওতালদের মধ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দেয়। (৪৭) নভেম্বর মাসে মেদিনীপুরে অবস্থিত কোনো কোনো অঞ্চলে সাঁওতালদের মধ্যে আবার বিদ্রোহের আশঙ্কা অনুভূত হতে থাকে।

মানভূমেও সাঁওতালদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয়। জয়পুরের জমিদার বিক্ষুব্ধ সাঁওতালদের দ্বারা আক্রান্ত হন। (৪৮)

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ফরাজী, চোয়ার বা সাঁওতালদের বিক্ষোভ সম্মেলনের লক্ষ্যস্থল ছিল একদিকে কোম্পানীরাজ আর একদিকে স্থানীয় জমিদার, নীলকর প্রভৃতি। ব্রিটীশ-বিরোধী, জমিদার-বিরোধী বাঙলার কৃষকদের এই সংগ্রামগুলি একান্ত বিক্ষিপ্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত হলেও ১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থানের ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য।

আরও লক্ষ্যণীয় যে উত্তর ভারতের বিদ্রোহ যখন ইংরেজের চণ্ডনীতির আঘাতে থেমে গেল, বাঙলার কৃষকেরা তখনও বিদ্রোহের পতাকা নামায়নি। ১৮৫৯ সালে বাঙলায় যে নীল বিদ্রোহ হয়েছিল তার উপরেও ১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থানটির যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। একজন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন—"সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নানা সাহেব ও তাঁতীয়া তোপীর নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ; নীল বিদ্রোহী কৃষকেরাও তাহাদিগের নেতাদিগকে এইসব নামে অভিহিত করিল"। (৪৯)

মোট কথা, মীরকাশিমের সময় থেকে একশো বছর ধরে একটানা জাতীয় মুক্তির জন্যে ভারতবাসী যে সংগ্রাম চালিয়েছিল তার চরম পর্যায় হল ১৮৫৭ সালের এই জাতীয় অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানটি ব্যর্থ হলেও দেশপ্রেমের যে উজ্জ্বল আদর্শ ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরল সেই আদর্শটি অক্ষয় হয়ে রইল। পরবর্তীকালে এই আদর্শটি আরও পুষ্টিলাভ করায় ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।

॥ গ্রন্থ নির্দেশিকা ॥

(১) Karl Marx—The Future Results of British Rule in India—P. 59
(২) Abhoy Charan Das—The Indian Ryot—P. 32-44
(৩) S. B. Chaudhuri—Civil Disturbances during the British Rule in India (1765-1857)—P. 101-2
(৪) ঐ পৃঃ ১০৪-৮
(৫) তিতুমীরের বিদ্রোহ সংক্রান্ত ঘটনাগুলি প্রধানত নিম্নলিখিত প্রবন্ধ থেকে গৃহীত— "The Wahabis"—Calcutta Review, Vol. LI—1870
(৬) হাণ্টার তিতুমীরের বিদ্রোহটিকে 'an infuriated peasant rising' বলে ঘোষণা করেছেন—Hunter—Indian Musalmans—P, 38

(৭) হাণ্টার তিতুমীরের বিদ্রোহটিকে 'an infuriated peasant rising' বলে ঘোষণা করেছেন—Hunter—Indian Musalmans—P. 38
(৮) The Wahabis—Cal. Review, Vol. LI, 1870
(৯) T. E. Ravenshaw—Memorandum on the Connection between the Wahabis and Ferazie Sects
(১০) ঐ
(১১) ঐ
(১২) S. B. Chaudhuri—Civil Disturbances in India—P. 113
(১৩) এই বিদ্রোহের বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে K. K. Datta—The Santal Insurrection of 1855 নামক গ্রন্থ থেকে।
(১৪) 'Man in India'—Rebellion Number Vol. XXV, No. 4, Dec. 1945 Santhal Rebellion Songs—মূল সাঁওতালী গান থেকে W. G. Archer ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। আর্চারের অনুবাদের অনুবাদ।
(১৫) বিদ্রোহের ম্যানিফেষ্টো
(১৬) আর্চারের সংগ্রহ থেকে গৃহীত
(১৭) Bihar Historical Records Commission
(১৮) Mill—History of British India—Vol. II P. 208-9
(১৯) District Gazetteer—24 Parganas
(২০) Satindra Singh—Sociological Interpretation of Indian Mutiny, Calcutta Review—Nov. 1946
(২১) ঐ
(২২) ঐ
(২৩) রজনীকান্ত গুপ্ত—সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৩৪
(২৪) সুরেন্দ্রনাথ সেন—ভারতীয় বিদ্রোহ বিষয়ক রচনাবলী, 'ইতিহাস' প্রথম সংখ্যা ১৩৬৩
(২৫) রজনীকান্ত গুপ্ত—সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৭৯
(২৬) Sir George Trevelyan—'Cawnpore', 1886, পৃঃ ৯৭-৯৮
(২৭) Innes—The Sepoy Revolt—A Critical Narrative, 1897, P. 211
(২৮) Red Pamphlet
(২৯) Satindra Singh—Sociological Interpretation of Indian Mutiny, 'Calcutta Review' Nov. 1946
(৩০) Trevelyan—'Cawnpore' পৃঃ ৯৭ ৯৮
(৩১) Asoka Mehta—1857, The Great Rebellion, P. 26-27
(৩২) Trevelyan—Cawnpore, পৃঃ ১৭০-৭২
(৩৩) ঐ পৃঃ ১৮৪-৮৬
(৩৪) Asoka Mehta—1857, The Great Rebellion পৃঃ ৪২
(৩৫) Innes—The Sepoy Revolt, পৃঃ ৯-১০
(৩৬) Satindra Singh—Calcutta Review 1946
(৩৭) Trevelyan—Cawnpore, পৃঃ ১৮৪-৮৬
(৩৮) ঐ পৃঃ ১৮৪-৮৬
(৩৯) Satindra Singh—Calcutta Review 1946
(৪০) Reisner—Article in 'Soviet Land' May, 1957

(৪১) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : বিদ্রোহের সময় যে সমস্ত ইস্তাহার প্রচার করা হত, তাতে রাজা, বণিক, কারিগর, ফকীর, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিদের কাছে আবেদন করা হত, অথচ কৃষকদের এতে নামোল্লেখ ছিল না।
—Asoka Mehta. 1857 The Great Rebellion, P. 65

(৪২) ভারতের গভর্ণর জেনারেলের কাছে লেখা বেনামী চিঠি—অপ্রকাশিত দলিল, Proceedings of the Judicial Dept, 1857

(৪৩) অপ্রকাশিত দলিল, ঐ ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৭

(৪৪) অপ্রকাশিত দলিল, ঐ ৭ই জানুয়ারী, ১৮৫৮

(৪৫) District Gazeteer—Dacca

(৪৬) Minute, dated the 30th Sept., 1858, by Sir F. Halliday as Lt. Governor of Bengal

(৪৭) ঐ

(৪৮) District Gazetteer—Manbhum

(৪৯) সতীশচন্দ্র মিত্র—'যশোহর-খুলনার ইতিহাস', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৮১

পঞ্চম অধ্যায়

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারার সূচনা
(১৮১৩—১৮৫৭)

১৮১৩ থেকে ১৮৫৭ সালের অন্তবর্তীকালীন বছরগুলিতে বাঙলা তথা ভারতের শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরানো দিনের সামন্তপ্রভুদেরও ব্রিটিশ-বিরোধী দেশপ্রেমিক কার্যকলাপের পরিচয় আমরা পেয়েছি।

ঠিক এই ঐতিহাসিক পর্বেই ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে আরও একটি নতুন শক্তির উন্মেষ হতে থাকে। সেই শক্তিটি হল—ভারতের ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ইংরেজ আমলে নবসৃষ্ট জমিদার, মুন্সী, মুৎসুদ্দী, সেরেস্তাদার প্রভৃতি বংশে এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের জন্ম। সরকারী চাকরী, সওদাগরী অফিসের কেরাণীগিরি, শিক্ষকতা প্রভৃতি এই সম্প্রদায়টির ছিল প্রধান পেশা। ইওরোপের প্রগতিশীল বুর্জোয়া ভাবধারার দ্বারা তাঁরা ছিলেন গভীরভাবে অনুপ্রাণিত। এঁরা ছিলেন ভারতে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অগ্রদূত। আমরা আগেই দেখেছি এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ১৮১৩ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যবর্তীকালীন বছরগুলিতে যে সব কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল সেগুলি সম্পর্কে, এমন কি ১৮৫৭ সালের বিরাট জাতীয় অভ্যুত্থানের মুহূর্তটিতেও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিল। কিন্তু তবুও এই বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-ভাবনা, তাদের কাজ-কর্ম ভারতের সমাজ-বিকাশের ক্ষেত্রে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

—৭

কি অবস্থায় কোন্ উদ্দেশ্যে এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছিল তা জানতে পারলে বোঝা যাবে কেন এই প্রগতিশীল ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থানটির সময়ে দেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়াতে পারে নি।

ইংরেজী শিক্ষার সূচনা

ব্রিটিশ বাণিজ্যপতিদের স্বার্থে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রচলন। কিছুটা বাণিজ্যগত প্রয়োজনে আর কিছুটা রাজনীতি ও শাসন সংক্রান্ত কারণে ব্রিটেন ভারতে ইংরেজী শিক্ষিত, ইংরেজী আদবকায়দা-দুরস্ত একদল কর্মচারী সৃষ্টির কথা ভাবতে থাকেন।

ধর্ম প্রচারের আবরণে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্য নিয়ে একদল ইংরেজ মিশনারী সর্বপ্রথম 'নেটিভদে'র সঙ্গে ভাব বিনিময়ের কাজে হাত দেয়। উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান ও আলেকজাণ্ডার ডাফের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মিশনারীদের উদ্যোগে কলকাতা, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই কতকগুলি স্কুল খোলা হয়।

কোম্পানীর উদ্যোগে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ৪ঠা মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল বিলাত থেকে যে-সব কর্মচারী এদেশে কোম্পানীর কাজ চালাবার জন্য আসবে তাদের এ-দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে কথঞ্চিৎ পরিচিত করে তোলা।

দেশীয়দের কি ধরণের শিক্ষা দেওয়া হবে এই নিয়ে কোম্পানীর বড় কর্তাদের মধ্যে ছিল মতবিরোধ। ওয়ারেন হেষ্টিংস দেশীয়দের মধ্যে প্রাচ্য-বিদ্যা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। মেকলে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে মত জ্ঞাপন করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষার সমর্থনকারীদের জয় হয়।

প্রাচ্যবিদ্যা-বাদী আর ইংরেজী-শিক্ষা সমর্থনবাদী—এই দুই দলের বিতর্ক থেকেই বোঝা যায় যে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর এই দেশে শিক্ষা বিস্তারের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। কার্যক্ষেত্রে তাই কোম্পানী শিক্ষা-বিস্তারের কাজটিকে পুরোপুরি অবহেলা করে চলেছিল। ১৮৩৫ সালে শেষ পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। শাসন চালাবার বাস্তব

প্রয়োজন ছাড়া আর কোনো উচ্চতর আদর্শ যে এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল না, ইংরেজী-শিক্ষা সমর্থনবাদীদের নেতা মেকলের কথা থেকেই তা জলের মত পরিষ্কার। মেকলে বললেন—"আমাদের এখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করতে যারা হবে আমাদের এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানকারী। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হবে রক্তে ও রঙে ভারতীয়, আর রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।" (১)

১৮৫৪ সালে কোম্পানী একটী শিক্ষা সংক্রান্ত 'ডেসপ্যাচ' পাশ করে। এই ডেসপ্যাচটীতে এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের মোটামুটী একটি পরিকল্পনা হাজির করা হয়। এই ডেসপ্যাচের সুপারিশ অনুযায়ী কলকাতায় বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই 'ডেসপ্যাচটিতেও' কোম্পানীর শিক্ষানীতির সংকীর্ণতা খুবই পরিস্ফুট। এই 'ডেসপ্যাচে' ভারতকে ব্রিটেনের কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ ও ইংলণ্ডের পণ্যদ্রব্যের আহরণকারী দেশ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে এবং খোলাখুলিই ঘোষণা করা হয়েছে যে উপরোক্ত কাজ হাসিল করার জন্যেই নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার প্রবর্তন। (২)

এই ধরণের ছকে বাঁধা সংকীর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন হলেও, নব-প্রবর্তিত বিদ্যালয়গুলিতে যাঁরা শিক্ষালাভের সুযোগ পেলেন তাঁরা ইংলণ্ডের বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতির ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। কোম্পানীর বড় কর্তারা কেউ কেউ আশঙ্কা করতে থাকেন—ইওরোপের এই বিপ্লবী ভাবধারা ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীর মনে বিদ্রোহের আকাঙ্খা জাগরিত করবে। ১৮৫৮ সালে লর্ড এলেনবরা অভিযোগ করেন—১৮৫৭ সালের বিদ্রোহটি ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে উৎসাহ পেয়েছে এবং তিনি সুপারিশ করেন ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচটি এই কারণে প্রত্যাহার করা উচিত। (৩)

এইগুলি থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে ইংরেজ শাসকেরা এদেশে ইওরোপের প্রগতিশীল ভাবধারা প্রচারের জন্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের সিদ্ধান্ত নেননি। অর্ধশিক্ষিত একদল কেরাণী তৈরী করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় অনেক বড়লোকও তাঁদের সাহায্য করেন এই সংকীর্ণ বুদ্ধিতে। তাঁরাও

বোঝেন যে ইংরেজ যখন এদেশের রাজা, তখন তাদের ভাষা, তাদের রুচি, আদব-কায়দা অনুকরণ করা ছাড়া উপায় নেই—এই পথেই মিলবে চাকরী, প্রতিপত্তি সব কিছু।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ছাড়া আর একটি গোষ্ঠী ছিল যারা উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন দাবী করেন। এই দলের প্রধান পুরোহিত ছিলেন রামমোহন। এই কাজে রামমোহনের সঙ্গী ছিলেন উদারহৃদয়, আদর্শবাদী ইংরেজ ডেভিড হেয়ার।

রামমোহন এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন চেয়েছিলেন শুধুমাত্র চাকরী সংস্থানের জন্তে নয়। দেশের পুনর্জাগরণের মাধ্যম হিসাবে তিনি দেখেছিলেন ইংরেজী শিক্ষাকে। তাঁর চোখে ইংরেজী শিক্ষা ছিল—যুগোপযোগী প্রগতিবাদী ভাবধারার বাহন।

এই উদ্দেশ্য থেকে রামমোহন ও তাঁর সহকর্মীরা প্রতিষ্ঠা করেন হিন্দু কলেজ (১৮১৭)। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই বিদ্যালয়টি পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল ভাবধারা প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

এই কাজে আরও দুটি শিক্ষা-সমিতি অগ্রণী হয়েছিল—একটির নাম 'এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন' (১৮২৮) অপরটি 'সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অব জেনারেল নলেজ' (১৮৩৮)। ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের উদ্যোগে এই দুটি প্রতিষ্ঠানেরই উদ্বোধন হয়েছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা

মিশনারী, সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান যার উদ্যোগেই এই ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হোক না কেন বস্তুগতভাবে এই শিক্ষা ভারতে প্রগতিশীল ভাবধারা বিস্তারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। ইংলণ্ডের বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব—প্রভৃতি বুর্জোয়া বিপ্লবের ঐতিহ্য ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মনের উপর গভীর রেখাপাত করল। সামন্ততন্ত্রের তুলনায় পুঁজিবাদের প্রগতিশীলতা তাঁদের অভিভূত করল। পুঁজিবাদের পতাকাবাহী মধ্যবিত্তশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকাটি তাঁরা উপলব্ধি করলেন।

ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মুখপত্র "বঙ্গদূতে" মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই ভূমিকা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি লক্ষ্য করা যায়। "বঙ্গদূত" লিখলেন—

"এই নূতন শ্রেণী (মধ্যবিত্ত শ্রেণী) হইতে যে সকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত। ...ইহার অধিক দৃষ্টান্ত কি দিব ইংলণ্ডের পূর্ব বৃত্তান্ত দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইবেক। ...ওলিবর (অলিভার) ক্রামওয়েল নামক এক কসাইয়ের পুত্র প্রথম চার্লস নামক রাজাকে শিরচ্ছেদপূর্বক রাজ্যচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের প্রজার প্রভুত্ব দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও ধন্যবাদ দিলেন।" (৪)

ভারতের ক্ষেত্রেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে "বঙ্গদূত" লিখলেন—ভারতেও ইংরেজ আমলে এই প্রকারের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হওয়াতে নতুন সম্ভাবনা দেখা দেবে, এমন কি এই শ্রেণী দেশের "স্বাধীনতা" অর্জনের ব্যাপারেও অগ্রদূত হবে। "বঙ্গদূত" লিখলেন—"এই নতুন শ্রেণী হইতে.........অসংখ্যোপকার কেবল গৌড়দেশস্থ প্রজার প্রতিই এমত নহে কিন্তু ইংলণ্ডপতির এতদ্দেশীয় রাজ্যের সৌভাগ্য ও স্থৈর্য্য প্রতিও বটে। অতএব যেহেতুক লোকেরদিগের যখন এ-প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক।" (৫)

"বঙ্গদূত" পত্রিকায় ভারতীয় শিল্পের উপর ইংরেজ প্রবর্তিত বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ভারতের স্বার্থে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে সমতাযুক্ত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের দাবি উত্থাপন করে এই পত্রিকায় লেখা হল—

"যে সকল লিবারপুল ও গ্লাসগো প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের সুযোগ বিষয়ে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহারাই বিতর্ক করিয়াছেন যে এতদ্দেশের বাজারে বিলাতী জিনিষের অনেক প্রয়োজন আছে। কিন্তু যাঁহারা এ-দেশ হইতে সে-দেশে বাণিজ্যার্থে কোন দ্রব্য লইয়া গিয়াছে তাহাদিগের উপচয় না হইয়া অপচয় হইয়াছে।" (৬)

এই অপচয়ের কারণ বিশ্লেষণ ক'রে "বঙ্গদূত" লিখলেন—

"এই ঘটনার কারণ এই যে দ্রব্যের মূল্য লাঘব হইলেই ক্রেতার ক্রয়করণের ইচ্ছা জন্মে। অথবা কোন নূতন অদৃষ্ট দ্রব্য দৃষ্ট হইলে গ্রাহকের গ্রাহকতা হয়। এমতে দ্রব্যাদির যথোপযুক্ত মূল্যলাভ সম্ভাবনায় এ-দেশীয়

দ্রব্য সেদেশে এবং সে-দেশীয় দ্রব্য এদেশে গমনাগমনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অতএব উভয় দেশীয় দ্রব্য দ্বারা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে অধিকতর বাণিজ্য বিস্তার অবশ্য কর্তব্য। ইহাতে যদি ইংলণ্ড ভারতবর্ষীয় উৎপন্ন দ্রব্যের সাপেক্ষিত হয়েন তবে এতদ্দেশীয় দ্রব্য প্রেরণের প্রতিবন্ধক মাশুলরূপ ত্রিশূল সংহরণ না করিলে পহুঁছিতে পারে না।" (৭)

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকেই প্রকাশ যে ভারতের 'স্বাধীনতা' ও ভারতের স্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা উপরোক্ত বুদ্ধিজীবীদের উপলব্ধিতে থাকলেও তাঁরা ভারতের মাটি থেকে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদের কথা কল্পনায়ও আনতে পারেননি। বরং কোম্পানীর শাসনকে তাঁরা বিধাতার আশীর্বাদ বলেই প্রচার করতেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে—ইওরোপের প্রগতিশীল ভাবধারা ও দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েও এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় পিছিয়ে রইল কেন?

উত্তরে বলা চলে—ভারতের সামন্তসমাজের জড়তা ও বিদেশী ইংরেজ শাসনের বাধা ঠেলে দিয়ে পুনর্জাগরণ সৃষ্টি করার ব্যাপারে এই সম্প্রদায়টির যে ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল তা অবশ্য স্বীকার্য। পরবর্তী যুগে এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এই ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষমও হয়েছিল।

কিন্তু ১৮১৩-১৮৫৭ এই ঐতিহাসিক পর্বটিতে কোম্পানীর আমলের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের লোকদের রুজি-রোজগার ছিল বাঁধা। এই সম্প্রদায়টি তখন ছিল সমগ্র সমাজের একটি মুষ্টিমেয় অংশ। এই সম্প্রদায়টি তখনও একটি সংহত শক্তিতে পরিণত হয়নি। জনসাধারণ থেকে তারা ছিল বিচ্ছিন্ন।

তবুও এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা অবশ্য-স্বীকার্য যে এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম অবিষ্কার করেন যে ভারতের উন্নততর সমাজ বিকাশের সম্ভাবনা পুরানো সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ভিতরে পুনরুজ্জীবিত হবার নয়। এর জন্যে প্রয়োজন নতুনতর এক অগ্রগামী উৎপাদন ব্যবস্থার পত্তন, ভারতের জনগণের নতুন উৎপাদন যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচয় ও পাশ্চাত্যের ভাবধারায় দীক্ষা।

বলাই বাহুল্য, তদানীন্তন ঐতিহাসিক স্তরে ভারতের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী উৎপাদন-ব্যবস্থা ছিল দেশীয় পুঁজিবাদের বিকাশ। রাজনীতি ক্ষেত্রে

এই পুঁজিবাদের ধ্বজাধারী হিসাবে প্রয়োজন ছিল একটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারা।

ভারতে স্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের অপরিহার্য উপকরণ হিসাবে এই বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্য ভাবধারা, সমাজ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রচার দাবি করেন।

পুস্তক ও সংবাদপত্র মারফৎ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্রিটিশ রাজের কাছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দাবি করেন।

স্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের অন্তরায় হিসাবে সতীদাহ, বহুবিবাহ, ও অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনগুলির নিরাকরণে উদ্যোগী হন।

ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ না করেও তাঁরা উপরোক্ত প্রগতিশীল ভাবধারা প্রচারে মনোযোগী হন।

এই ভাবেই এই বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে বাঙলা দেশের মাটিতে প্রথম গজিয়ে ওঠে এক উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারা। এই ধারার প্রধান পথ-প্রদর্শক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তারপরে ডিরোজিও ও 'ইয়ং বেঙ্গল', আরও পরে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি এই ভাবধারাকে আরও পরিপূর্ণ ভাবে রূপ দেবার কাজে অগ্রসর হন।

রাজা রামমোহন রায়

রামমোহন (১৭৭৪-১৮৩৩) হুগলী জেলায় এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ক্ষুদ্র জমিদার। তাঁর পিতামহ সিরাজ-উদ্দৌল্লার আমলে সরকারী কর্মচারী ছিলেন। তাই যথেষ্ট বৈষয়িক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় রামমোহনের শিক্ষানবীশীর কাজটা ভালই হয়েছিল। তদানীন্তন কালের শিক্ষা-রীতি অনুযায়ী তিনি পার্শী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল। উভয়বিধ শিক্ষার ফলে তিনি একদিকে সুফী দর্শন আর একদিকে বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতির সার সংগ্রহ করার সুযোগ পান।

ইংরেজ শাসনের সংস্পর্শে এসে তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের সঙ্গেও পরিচিত হলেন এবং স্বভাবসুলভ খোলা মন নিয়ে এই ধর্মের সারমর্ম অনুধাবন করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

সবার চেয়ে বড় কথা, ইংরেজের সংস্পর্শে এসে রামমোহন ইওরোপের নতুন উৎপাদন-পদ্ধতি, নতুন সমাজ ব্যবস্থা, নতুন ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

ইওরোপে সামন্ততন্ত্রের পতন, পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভব, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা—এই বিষয়গুলি রামমোহনের মনের উপর গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্স, স্পেন, নেপলস, ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশ ছিল গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। উপরোক্ত দেশগুলিতে যে আন্দোলন চলছিল রামমোহন তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করলেন।

ফরাসী বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যে তিনি যথেষ্ট অসুবিধা সত্ত্বেও একটি ত্রিবর্ণপতাকা-রঞ্জিত ফরাসী জাহাজে বিলাত যাত্রার জন্মে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। (৮)

নেপলসের জনগণের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পরাজয়-বার্তা শ্রবণ করে তিনি আক্ষেপ করেন—নেপলসের জনগণের পরাজয় আমার নিজের পরাজয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন—জনগণের এই পরাজয় সাময়িক—"স্বাধীনতার যারা শত্রু স্বেচ্ছাতন্ত্রের যারা মিত্র, তারা কখনও জয়ী হয় নি, কখনও শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে না।" (৯)

ইংলণ্ডের সংস্কার বিল আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন—"অভিজাত শ্রেণীর বিরাট প্রতিপক্ষতা ও রাজনীতিক সুবিধাবাদ সত্ত্বেও সংস্কার বিল আন্দোলন যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে এতে আমি অতীব আনন্দিত।" (১০)

উপরোক্ত উক্তিগুলি থেকে পরিষ্কার যে রামমোহন শুধু সময়ের দাস হিসাবে ইংরেজ আমল ও তার প্রবর্তিত নিয়মকানুন মেনে নেন নি। তিনি ইংরেজকে, ইওরোপকে দেখেছিলেন এক নতুন অগ্রগামী সমাজের অগ্রদূত হিসাবে।

ইওরোপ থেকে শেখা এই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রামমোহন ভারতের প্রতিটি জাতীয় সমস্যাও বিচার করতে লাগলেন।

শিক্ষার মাধ্যম ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কে তিনি লর্ড আমহার্স্টের কাছে যে পত্র (১১) লেখেন তাতেও তাঁর এই উপলব্ধি পরিষ্কার। এই চিঠিতে তিনি ক্ষেত্রে

লিখলেন—ব্রিটেনে এক সময়ে যেমন পুরানো জীবনদর্শন বর্জন করে বেকনের নতুন জীবনদর্শন প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল, ঠিক তেমনি ভারতেরও বর্তমান অবস্থায় মধ্যযুগের পিছুটান অতিক্রম করে নতুনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রয়োজন।

সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতা করে তিনি লিখলেন—এই শিক্ষা ভারতকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখবে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ—এই দর্শন নেতিবাদী। তিনি এই ধরণের নেতি-বাদী শিক্ষার বদলে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচলনের সুপারিশ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অঙ্ক, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়ন বিদ্যা, শরীর বিদ্যা প্রভৃতি চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আরও মনে করতেন যে ইংরেজীকে এই নতুন শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

রামমোহন-প্রচারিত ভাবধারা রক্ষণশীল পণ্ডিতদের তীব্র আক্রমণের বস্তু হ'য়ে দাঁড়াল। শঙ্কর শাস্ত্রী, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য্য, গোস্বামী প্রভৃতি রক্ষণশীল মতবাদের প্রতিনিধির মত খণ্ডন করে রামমোহন প্রবন্ধ লিখলেন। সতীদাহ, বহু-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে, এককথায়, সামন্ততান্ত্রিক জীবন দর্শনের ভিত্তিমূলে তিনি আঘাত করলেন।

অপরদিকে খ্রীষ্টান মিশনারী প্রচারিত অবৈজ্ঞানিক, রহস্যবাদী ভাব-ধারারও তিনি ঘোর বিরোধিতা করেন। এই কারণে তাঁকে মার্শম্যান, টাইটলার প্রভৃতি মিশনারী সাহেবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল।

উপরোক্ত হিন্দু ও খ্রীষ্টান গোঁড়ামী পরিহার করে, প্রগতিশীল ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে, রামমোহন একটি সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তন করলেন। এই আন্দোলনটিই ব্রাহ্ম আন্দোলন বলে পরিচিত।

প্রথমে রামমোহন ও তাঁর কয়েকজন অনুগামীর মধ্যে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। রামমোহন—অনুগামীদের মধ্যে এই সময়ে প্রধান ছিলেন—দ্বারকানাথ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন মজুমদার, ব্রজমোহন মজুমদার, কালীনাথ মুন্সী, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, নন্দকিশোর বসু, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি।

এই নব প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলন বেদান্ত ও উপনিষদের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—এটাই ছিল এই আন্দোলনের সারবস্তু। শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করে এই নতুনকেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছিল।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রামমোহনের কণ্ঠস্বর সজোরে ধ্বনিত হল। সতীদাহের বিরুদ্ধে তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানালেন। কৌলীন্য প্রথার কুফল সম্বন্ধেও তিনি প্রবন্ধ লিখলেন। জাতিভেদ সম্পর্কে তিনি লিখলেন—

..."জাতিভেদ...যাহা সর্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল।" আধুনিক রাজনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই কু-প্রথার বিচার করে তিনি লিখলেন—জাতিভেদের ফলে হিন্দুদের মধ্যে লক্ষ রকমের ভেদ-বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে স্বাদেশিকতা একেবারে নষ্ট হতে চলেছে। ...আমার মনে হয় অন্তত রাজনীতিক ও সামাজিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে হিন্দুধর্মের কিছু কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। (১২)

রাজনীতিক্ষেত্রেও রামমোহন ছিলেন সংস্কারবাদী। তিনি লিখলেন—

"স্থিরবুদ্ধি লোকমাত্রই ভারতের পরাধীনতা ও বিদেশী শাসনের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন।" কিন্তু বিদেশী শাসন হলেও তিনি সুপারিশ করলেন—ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আরও বেশ কিছুদিন থাকাই মঙ্গল—তার ফলে হারাতে হবেনা বেশি কিছু, অথচ ব্রিটিশের অভিভাবকত্বে ভারত রাজনীতিক স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে পারবে। (১৩)

ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে এইভাবে অভিমত জানালেও রামমোহন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধ স্তাবক ছিলেন ভাবলে ভুল হবে। প্রায়ই ভারতবাসীর মত উপেক্ষা করে ভারতস্থিত ব্রিটিশ শাসকেরা যেভাবে আইন ও বিধি প্রয়োগ করেন রামমোহন তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে বহুবার বহুক্ষেত্রে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলেন।

১৮২৩ সালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় সরকার যখন হস্তক্ষেপ করেন তখন প্রতিবাদস্বরূপ রামমোহন তাঁর পত্রিকা 'মিরাটের' প্রকাশ বন্ধ করে দেন।

ভারতবাসীকে যোগ্যতা অনুসারে সরকারী কাজে নিযুক্ত করা হোক —এই দাবিও তিনি উথাপন করেন।

তিনি কতকগুলি অর্থনৈতিক সংস্কারেরও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

১৮২৮ সালে রেগুলেশন ৩ নামে একটি আইন পাশ হয়। এই রেগুলেশন অনুযায়ী রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের নিষ্কর জমির মালিক-দের মালিকানা স্বত্ব কেড়ে নেবার অধিকার দেওয়া হয়। এই অধিকারের বলে অসংখ্য মালিককে স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়। রামমোহন এই সর্বস্বান্ত ভূস্বামীদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের কাছে প্রদত্ত একটি আবেদন-পত্রে উপরোক্ত রেগুলেশনটি প্রত্যাহার করার জন্যে অনুরোধ জানান।

১৮৩১ সালে ইংলণ্ডে থাকা কালে রামমোহনকে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার জন্যে আহ্বান করা হয়।

রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে মত জ্ঞাপন করেন। তাঁর ধারণা ছিল—এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরে জমির উন্নতির দিকে জমিদারদের নজর পড়েছে; বহু পতিত জমি জমিদারদের উদ্যোগে কর্ষণযোগ্য হয়ে উঠেছে; জমির মূল্য বহুগুণ বেড়েছে।

কিন্তু রামমোহন জমিদারদের একচোখো সমর্থক ছিলেন না। তাঁর সাক্ষ্যে তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন এই বন্দোবস্তের দুর্বলতার দিকটাও তিনি লিখেছেন—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের যে একতরফা সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তাতেই কৃষকের দুর্দশা বেড়েছে। জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির যে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তার কুফল বর্ণনা করে তিনি সুপারিশ করেছেন—সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের উপর খাজনার ভার লাঘব করার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ না করে বরং এই শাসনের আওতায় থেকেই স্বাধিকার অর্জন করা, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে অন্তরায় সামন্ততান্ত্রিক কু-শাসনগুলি পরিহার করা—এই ছিল রামমোহনের আদর্শ। বস্তুতঃ রামমোহন ছিলেন 'লিবারেল' জমিদার,

'লিবারেল' পলিটিসিয়ান, 'লিবারেল' সমাজ সংস্কারক। বাঙ্‌লায় বুর্জোয়া 'লিবারেল' ধারার রামমোহন ছিলেন প্রথম পথ-প্রদর্শক।

ডিরোজিও ও "ইয়ং বেংগল"

রামমোহনের পরে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বাহক হিসাবে যাঁরা প্রখ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের সাধারণত 'ইয়ং বেংগল' নামে অভিহিত করা হয়। "ইয়ং বেংগল" দলের মধ্যে প্রধান ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতি।

হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ছিলেন এই গোষ্ঠীর দীক্ষাগুরু। পেইন, হিউম, গিবন প্রভৃতির চিন্তাধারা ডিরোজিওকে সংশয়বাদী করে তুলেছিল। ডিরোজিও রামমোহনের আস্তিকতার গণ্ডীকে নির্দিষ্ট বলে মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলতেন—আস্তিকতা, নাস্তিকতা বিচার-সাপেক্ষ। রামমোহনের অনুগামী প্রসন্নকুমার ঠাকুর দুর্গাপূজা করতেন বলে ডিরোজিও তাঁকে বিদ্রূপ করতেন। (১৪)

ইউরেশীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ভারতের মাটির প্রতি ডিরোজিওর ছিল গভীর ভালবাসা। তাই তিনি লিখলেন—

"My country ! in the day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow'. ১৫

ইউরেশীয় সমাজের পক্ষ থেকে সম-মর্যাদা দাবি করে সেই সময়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, ডিরোজিও ছিলেন তার পুরোভাগে। কেন তিনি এই আন্দোলনে যোগ দেন তার কৈফিয়ৎ তিনি নিজেই দিয়েছেন—"I love my country and I love justice, and therefore, I ought to be here". (১৬)

ডিরোজিওর বস্তুবাদী ভাবধারা, প্রগতিশীল জীবনদর্শন, দেশপ্রেম প্রভৃতি হিন্দু কলেজের ইংরেজ ও দেশীয় কর্তৃপক্ষের একাংশের মনঃপূত হয় নি। তাঁর বিরুদ্ধে তারা 'নাস্তিকতা' প্রচারের এক মন-গড়া অভিযোগ আনলেন এবং সেই অভিযোগে তাঁকে হিন্দু কলেজ থেকে অপসারিত করা হল।

তবে ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হলেও ছাত্রদের মন থেকে তাঁর প্রভাব মুছে দেওয়া মোটেই সম্ভব হল না। হিউম ও পেইনের পুস্তকগুলি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এক বিরাট মানসিক বিপ্লবের সূচনা করল।

'ক্রিশ্চিয়ান অবজারভার' নামে একখানি সমসাময়িক কাগজে এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে—"হিউমের পুস্তকগুলি তখন গভীর আগ্রহের সঙ্গে পঠিত হত, তেমনি সমাদর লাভ করেছিল টম পেইনের বই—"এইজ অব রীজন"। এই বইখানির একখানি কপির জন্যে কোন কোন ছাত্র ৮৲ টাকা পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন।" (১৭)

সমাচার দর্পণও (জুলাই, ১৮৩২) বিষয়টির উল্লেখ করেছেন "আমরা খবর পেলাম কিছুদিন আগে, টম পেইনের অনেকগুলি বই, কমপক্ষে একশোখানি হবে, আমেরিকা থেকে বিক্রির জন্যে কলকাতায় পাঠানো হয়। জনৈক স্থানীয় পুস্তক-ব্যবসায়ী ভাল বিক্রির আশা নেই ভেবে বইখানির মাত্র ১ টাকা মূল্য ধার্য করেন; কয়েকখানি বই এই দামে বিক্রি হয়। এই বইগুলি ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের হাতে পড়ে এবং ক্রমশ এই বই কেনার জন্যে দারুণ আগ্রহ দেখা দেয়। পুস্তক-ব্যবসায়ী অবিলম্বে বইখানির দাম ৫৲ টাকা ধার্য করেন। আমরা অবগত হলাম এই চড়া মূল্যেও তাঁর মজুত সমস্ত বই মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে দেশীয়দের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। ক্রেতাদের মধ্যে একজন পেইনের "এজ অব রীজনে"র একটি অংশ বাঙলায় অনুবাদ করতে ও 'ভাস্করে' তা প্রকাশ করতে অগ্রসর হন।" (১৮)

ইওরোপের প্রগতিশীল চিন্তানায়কদের প্রভাবে ও ডিরোজিওর শিক্ষায় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বস্তুবাদী জীবনদর্শনের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখা দেয়। তাঁরা কেউ কেউ ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে একেবারে সংশয়বাদী হয়ে উঠলেন, আবার কেউ কেউ ধর্মের আশ্রয় নিলেও যুক্তিবাদের পথ যথাসম্ভব আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করলেন।

এই সময়ে ডিরোজিও শিষ্য হেয়ার স্কুলের শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচার করতেন—"পরকাল নাই এবং মনুষ্য ঘটিকা-যন্ত্রের ন্যায়।" (১৯) আর একজন ডিরোজিও-শিষ্য রসিককৃষ্ণ মল্লিক আদালতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন—"আমি গঙ্গা মানি না।" (২০) প্যারীচাঁদ মিত্র 'ইয়ং বেংগল' গোষ্ঠীর

পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—"ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না, অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত। তাহাদিগকে বলপূর্বক ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহারা সন্ধ্যা আহ্নিকের পরিবর্তে হোমরের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।" (২১)

শুধু দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনের বিরুদ্ধেই তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি। তাঁরা খ্রীস্টান পাদরীদের গোঁড়ামীও সহ্য করতেন না। পাদরী ডাফ তাই তাঁদের উপর বিরক্ত হয়ে লিখেছেন—"এদের মতে খ্রীস্টধর্ম হল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ-ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে এক উন্নততর চেষ্টা মাত্র। তাঁদের চোখে—পাদরীরা ছিলেন ধূর্ত দুশমন অথবা অশিক্ষিত গোঁড়ার দল। তাঁরা পাদরীদের 'ইওরোপের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়' বলে ঠাট্টা করতেন।" (২২)

আরও লক্ষণীয় গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কেও ইয়ংবেংগল গোষ্ঠীর যথেষ্ট সচেতনতা ছিল।

এইদলের একজন প্রধান নেতা কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১২ ৮৫) খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার পরে সেন্টপল ক্যাথিড্রাল নামে এক ধর্মমন্দিরে প্রথম ক্যানন নিযুক্ত হন। কিন্তু পরে এই নিয়োগ পরিবর্তন করা হয়। কারণ দেখানো হয়—কৃষ্ণমোহন বাঙালী, তাই তিনি বাঙালী খ্রীষ্টানের ক্যানন থাকবেন, আর একজন ইংরেজ ইংরেজ-সম্প্রদায়ের ক্যানন নিযুক্ত হবেন। ধর্মরাজ্যে সাদা-কালো বৈষম্যের প্রতিবাদে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন—"রাজাপরিষদের মানাপমান কি ধর্মজগতেও বর্ত্তমান? এখানেও কি পার্থিব জাক-জমক ও মান-সম্ভ্রম সমাদর করিতে হইবে? যদি তাহা হয় আমি তাহাতে অপারক।" (২৩)

মানুষের সমান অধিকার সম্পর্কে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১২-৮৭) লেখেন—"ভগবান নিরপেক্ষভাবে জন্মগত অধিকারে সকল মানুষকেই সমান করিয়া তৈয়ারী করিয়াছেন।" (২৪) স্ত্রী-স্বাধীনতার সমর্থনে লেখা হল—"জগদীশ্বর স্ত্রী-পুরুষ নির্মাণ করিয়া এমত কখনও মনে করেন নাই যে একজন অন্যজনের দাস হইবে। ·· মনুষ্যের শঠতাক্রমে এই সকল বাধাজনক শৃঙ্খল হইয়াছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে নহে।" (২৫]

দাস-প্রথা, নারী-নির্যাতন ও অন্যান্য, সামাজিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধেও ইয়ং বেংগল মত জ্ঞাপন করেন। আফ্রিকায় এই সময়ে যে দাস-ব্যবসা

চলত ইয়ং বেংগল তার তীব্র নিন্দা করেন। তাঁরা মরিশাস দ্বীপে ভারতীয় কুলী চালান দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। সরকারী দপ্তরে কুলিদের বেগার খাটাবার বিরুদ্ধেও তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ফৌজদারী বালাখানায় অনুষ্ঠিত দেশীয় ভদ্রলোকদের একটি সভায় (নভেম্বর ১৮৪৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন—হিন্দু ও মুসলমান আমলে জমির উপর স্বত্ব ছিল কৃষকদের, জমিদারদের কাজ ছিল খাজনা সংগ্রহ করা। আগে যারা ছিল খাজনা আদায়কারী তাদের জমির মালিকে পরিণত করে বিরাট ভুল করা হয়েছে। তার ফলে অসংখ্য লোক পূর্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। (২৬)

ইয়ং বেংগল বিদেশী শাসকদের বৈষম্যমূলক অবিচারের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। কালা কানুনের বিরুদ্ধে রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮) যে আন্দোলন আরম্ভ করেন তার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে ওঠে বিভিন্ন ইওরোপীয় স্বার্থ—চেম্বার অব কমার্স, ট্রেড এসোসিয়েশন, ইণ্ডিগো প্ল্যান্টার্স এসোসিয়েশন ইত্যাদি।

রামগোপাল রসিককৃষ্ণ মল্লিক সম্পাদিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি চিঠি লেখেন। ঐ চিঠিগুলিতে তিনি আভ্যন্তরীণ শুল্ক তুলে দেওয়ার পক্ষে মত জ্ঞাপন করেন।

চৌরঙ্গী জীবনের সংকীর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে মেকলে যখন সমস্ত বাঙালী জাতির উপর কটাক্ষ করেন তখন ইয়ং বেংগল মেকলের উক্তির বিরুদ্ধে এক ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলেন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০ ৫৮) ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনের অগণতান্ত্রিক ধারাগুলির কঠোর সমালোচনা করেন।

ইয়ং বেংগল পরিচালিত "সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অব জেনারেল নলেজ" নামক সমিতির উদ্যোগে যে সব আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হত তাতে রাজনীতি চর্চার বিশেষ স্থান ছিল। একটি সভায় দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ব্রিটিশ সরকারকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করলে এই সভায় জনৈক পৃষ্ঠ-পোষক হিন্দু কলেজের প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক ক্যাপটেন ডি, এল, রিচার্ডসন অত্যন্ত রুষ্ট হন। (২৭)

এমন কি এই কথাও শোনা যায় যে দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন এবং কলকাতায় নির্বাসিত অযোধ্যার নবাবের কোনো কোনো পরিকল্পনা নিয়ে তিনি গোপনে ঠাকুর পরিবরের কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ করেন। (২৮)

অবশ্য ইয়ং বেংগলও রাজনীতি ক্ষেত্রে চরম পন্থার বিরোধী ছিলেন। নিয়মতন্ত্রের পথে কিছু কিছু রাজনৈতিক সংস্কার আদায় করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

রামগোপাল ঘোষের নিম্নলিখিত বক্তৃতায় এই নিয়মতান্ত্রিক পন্থার প্রতি অনুরাগ সুস্পষ্ট—

"আমাদের মত দেশে এবং আমাদের মত সরকারের অধীনে ভারতবাসীর যোগ্যতা ও মৌলিকতা যে যথাযোগ্য পুরস্কার পাবে না—এতো জানা কথা। আমাদের দেশ স্বাধীন নয়। তাছাড়া, আমাদের সরকারও দেশের জনমতের প্রতিনিধিত্ব করে না।" সঙ্গে সঙ্গে সাবধানতা অবলম্বন করে আবার একই সঙ্গে তিনি বললেন—"অবশ্য বর্তমান সরকারের দোষ দিচ্ছি না। হয়তো বর্তমান পরিবেশে এর চেয়ে ভাল সরকার আশা করাও যায় না। তবে সরকারী চাকরী পাবার যেখানে এত বাধা ও যোগ্যতার মাপ কাঠিতে সরকারী চাকরীর উন্নতিতে যেখানে এত অসুবিধা, সেখানে ব্যক্তিমনের উন্নতিস্পৃহা ব্যাহত হবে—এতে আর আশ্চর্য কি? (২৯)

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও বললেন—"ভারতের দারিদ্রের কারণ তার পরাধীনতা", তবে তিনি একই সঙ্গে জানালেন ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতার আকাঙ্খা। দক্ষিণারঞ্জনের মনের কোণে জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রতি সহানুভূতি থাকলেও তিনি কোনোদিন তা প্রকাশ করেননি। বরং তিনি প্রকাশ্যে ব্রিটিশ সরকারের জয়ের কামনাই করেন এবং তার পুরস্কার হিসাবে তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। (৩০)

এই ধরনেই দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থা বিবেচনায় ইয়ং বেংগল জাতীয়তাবাদী ধারার উদ্বোধনে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার গুরুত্ব কোনোমতেই উপেক্ষা করা চলে না।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও অক্ষয়কুমার দত্ত

ইয়ংবেংগলের পাশাপাশি রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম আন্দোলনও ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করল। ব্রাহ্ম সমাজের মঞ্চ থেকেও প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারের দাবি উঠতে থাকল।

ব্রাহ্ম নেতাদের উদ্যোগে এই সময়ে 'তত্ত্ববোধিনী সভা', 'তত্ত্ব-বোধিনী পাঠশালা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অগ্রগামী ভাবধারা প্রচারে অগ্রণী ছিল। পত্রিকাটি ব্রাহ্ম ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমনি অনেক লোককেও টানতে সক্ষম হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্ম না হয়েও এই পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। বিধবা বিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ সর্বপ্রথম 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে ব্রাহ্ম আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্মসমাজ গঠনের কাজে তাঁর প্রধান সহচর ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় কুমার একই কাজে ব্রতী হলেও তাঁদের প্রবণতা ছিল ভিন্নধর্মী। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন। অক্ষয়কুমার ছিলেন বস্তুবাদী, তার্কিক। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্তর্গত একটি গোষ্ঠীকে স্বমতে আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমার-পরিচালিত এই যুবক গোষ্ঠীর প্রায়ই মতপার্থক্য দেখা দিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও দেবেন্দ্র-নাথের মত পছন্দ করতেন না। এই মতপার্থক্যের জন্যেই তিনি তত্ত্ব-বোধিনী আন্দোলনের সংস্রব ত্যাগ করেন। ৩১)

ক্রমশ দেবেন্দ্রনাথের ভাব-প্রবণ ভক্তিবাদী ভাবধারা এবং অক্ষয় কুমারের বস্তুবাদী-যুক্তিবাদী ভাবধারার মধ্যে পার্থক্য নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের অভ্যন্তরে দারুণ সংকট উপস্থিত হল। দেবেন্দ্রনাথ প্রথম দিকে বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করতেন। অক্ষয়কুমার বেদের অপৌরুষেয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে ধর্মমতের ব্যাখ্যা নিয়ে তাঁর প্রায়ই অক্ষয়কুমারের সঙ্গে বিবাদ বাধত। তিনি লিখেছেন —"আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের

সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ, আকাশ পাতাল প্রভেদ।" (৩২)

এই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-৮৬) চিন্তাধারার আরও একটু বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। অক্ষয়কুমারের রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার", "ধর্মনীতি", "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

প্লেটো, এ্যারিষ্টটল, বেকন, লক, কোঁতে, লাপলাস্, স্পেন্সার প্রভৃতির চিন্তার দ্বারা অক্ষয়কুমারের চিন্তাধারা ছিল অনুপ্রাণিত।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রচারে অক্ষয়কুমার সমসাময়িকদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। পদার্থ বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, প্রভৃতি পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন।

আধুনিক দৃষ্টি থেকে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের পুনর্বিচার হওয়া প্রয়ো-জন—এই মত তিনি পোষণ করতেন। বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা, প্রভৃতি মন্থন করে এই কথাই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, প্রেম ঘটিত বিবাহ, নারী-পুরুষ দুইয়ের পক্ষেই বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি প্রত্যেকটিই "বেদোক্ত ও মনুসংহিতা প্রোক্ত ধর্মব্যবহার।"

শ্রুতি, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতির তিনি তীব্র নিন্দা করেন ও জৈমিনী যিনি বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রচার করেন তাঁর যুক্তি খণ্ডন করে তিনি লিখলেন—

"বেদের যে অংশ যে ব্যক্তির কৃত তা স্পষ্টই লিখিত আছে এবং তন্মধ্যে নানা স্থানে ও নানা কালে বিদ্যমান লোক সমূহের ভক্তি, শ্রদ্ধা, রাগ, দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, বিপদ-আপদ, যুদ্ধ-বিবাদ, ব্যসন, বাণিজ্য ইত্যাদি অশেষ প্রকারের বিবিধ বৃত্তান্ত বিনিবেশিত রহিয়াছে। তথাপি জৈমিনি মহাশয়ের মত-প্রভাবে তাহা অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষের কৃত নয় স্বয়ংসিদ্ধ নিত্য পদার্থ......এরূপ দর্শনের কাল অতীত হইয়াছে যে, বিজ্ঞানের অধিকার বিস্তৃত হইতেছে ইহাতে বিশুদ্ধ বুদ্ধি সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা একপ্রকার নিস্তার পাইতেছেন। সাধে কি রামমোহন রায় সংস্কৃত

কলেজ সংস্থাপনের বিরোধী হইয়া তৎপরিবর্তে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ অনুরোধ করেন ?" (৩৩)

ধর্ম সম্পর্কেও অক্ষয়কুমারের মতামত প্রণিধানযোগ্য। শেষ জীবনে অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং অজ্ঞেয়-বাদী হয়ে ওঠেন। "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক প্রস্তাবে তিনি এটাই প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন যে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কাজ করাই ধর্ম, না করাই অধর্ম।

এই মনোভাব থেকেই অক্ষয় কুমার প্রার্থনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন। গণিতানুযায়ী তিনি এইরূপ সমীকরণ করেন—

পরিশ্রম = শস্য

প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য

অতএব

প্রার্থনা = ০

রাজনীতি ক্ষেত্রে রামমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত অক্ষয়কুমারও ছিলেন সংস্কারবাদী।

ব্রিটিশ শাসনের কুফল বর্ণনা প্রসঙ্গে ইংলণ্ডকে উদ্দেশ করে তিনি লিখেছেন—"তোমার অধিকারে আমাদের স্বাস্থ্যক্ষয়, বলক্ষয়, আয়ক্ষয় ও ধর্মক্ষয় ঘটিতেছে। তুমি অধিক বিতরণ কি সংহরণ করিতেছ কে বলিতে পারে ? তুমি শিক্ষাদান করিতে গিয়া স্বাস্থ্যহরণ করিতেছ, অর্থোপানের বিবিধ পথ প্রস্তুত করিতে গিয়া শ্রমাতিশয় ও তাহার বিষময় ফলপুঞ্জ উৎপাদন করিতেছ। বাণিজ্য বৃত্তি প্রসারণ করিতে গিয়া অশেষ দোষকর দুর্মূল্যতা-দোষ ও তৎসহকৃত অধর্ম বংশের বৃদ্ধি করিতেছ......

......"যাবতীয় জাগ্রতকাল পয়সা টাকা, দর-দাম, আকাল-আক্রা, দলিল-দস্তাবেজ, সাক্ষী-সাবুদ, উকল-কৌন্সলী, কোর্ট-মোকদ্দমা, জাল-জালিয়াত এই সমস্ত অভিচার মন্ত্রাদি জপ ও পুনশ্চরণ করাই কি মানব কুলের পরমার্থ হইল ?" (৩৪)

তদানীন্তন কালে ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে ঐক্যভাব জাগ্রত হতে আরম্ভ করে তার শুভ পরিণাম সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি লিখলেন—"ধনী দরিদ্র, বিজ্ঞ অজ্ঞ, বৃদ্ধ বালক,

ব্রাহ্ম পৌত্তলিক, সকল প্রকার ভিন্ন বর্ণস্থ, ভিন্ন মতস্থ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি এবিষয়ে একত্র হইয়াছেন। এই ঐক্য সংস্থায়ী হইলে কোন দুঃখ না মোচন হইতে পারে ?"

জাতীয় উন্নতির উদ্দেশ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও বাঙলা ভাষার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন।

তবে আগেই বলেছি তাঁর সমসাময়িকদের মত অক্ষয়কুমারও ছিলেন রাজনীতি ক্ষেত্রে সংস্কারবাদী। তিনি ধরে নেন যে ইংরেজ শাসন বিধাতার বিধান এবং সেই জন্যে ব্রিটিশ ব্যবস্থার মধ্যে যতটুকু স্বাধিকার অর্জন করা যায় ততটুকুই ছিল তাঁর কাম্য। তাই তিনি ইংরেজের কৃপাপ্রার্থী—"যাহা হউক, ইংলণ্ড! তোমার দয়া প্রকাশ ব্যতিরেকে আর আমাদের ভরসা নাই। আমরা কৃপাপাত্র; আমাদিগকে কৃপাদৃষ্টি কর এই প্রার্থনা।" (৩৫)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পশ্চিমের জীবনদর্শন, বস্তুবাদী ভাবধারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মনেও গভীরভাবে রেখাপাত করে। সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসন জনিত জড়তা যা ভারতবাসীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তিনি তার তীব্র নিন্দা করতেন। ইংরেজ জাতির কাছ থেকে তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতবাসীর শিক্ষার অনেক কিছু আছে—যেমন নিয়মানুবর্তিতা, সত্যনিষ্ঠা, কর্মোদ্যম ইত্যাদি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বলতেন—"খেতে, বসতে, শুতে, বেড়াতে সব বিষয়েই ইংরাজ শ্রেষ্ঠ।" (৩৬)

তাই বালক-বালিকাদের সামনে তিনি যে সমস্ত জীবন চরিতের আদর্শ তুলে ধরেন তার কোনোটি তিনি সংগ্রহ করেন ইংলণ্ড থেকে, কোনোটি ইতালি থেকে, কোনোটি বা আমেরিকা থেকে।

সংস্কৃত শিক্ষায় সুপণ্ডিত বিদ্যাসাগর নিজে সযত্নে ইংরেজী শিক্ষা আয়ত্ত করেন এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে শিক্ষাপদ্ধতিতেও পরিচালনা ব্যাপারে কতকগুলি সংস্কার সাধন করেন। এই সংস্কারগুলি মোটামুটি এইরূপ—

"(১) ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। তিনি ব্যবস্থা করিলেন বর্ণনির্বিশেষে হিন্দুর ছেলে মাত্রই কলেজে পড়িতে পারিবে।

(২) ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া আরম্ভ হইল।

(৩) ব্যাকরণ পড়ানোর সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল; 'মুগ্ধবোধ' উঠাইয়া দিয়া উপক্রমণিকা পড়ানো আরম্ভ হইল।

(৪) অধিক ইংরাজী পড়াইবার ব্যবস্থা হইল। এতদিন ছাত্রেরা ইচ্ছামত ইংরাজী মাষ্টারের কাছে অধ্যয়ন করিত।...এখন হইতে ইংরাজী পড়া কয়েক ক্লাস উপর হইতে Compulsory হইল।

(৫) সংস্কৃত গণিতশাস্ত্র—লীলাবতী, বীজগণিত ইত্যাদি পড়া উঠিয়া গেল, ইংরাজিতে অঙ্কশাস্ত্র পড়া আরম্ভ হইল।" (৩৭)

এক কথায় বিদ্যাসাগর সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতির মূলে আঘাত করলেন। শোনা যায়, কলেজের অধ্যাপকদের আসা-যাওয়ার ব্যাপারেও তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তন করেন। বিদ্যাসাগরের এই সকল সংস্কার গোঁড়া পণ্ডিতদের মনঃপূত হয়নি। এই জন্যে এই সংস্কার প্রবর্তনের সময়ে বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

উদারনৈতিক দৃষ্টি থেকে সমাজ সংস্কার প্রবর্তন—এইটিই ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান ব্রত।

বহু বিবাহ, বিধবার যন্ত্রণা, অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ দেবার ব্যবস্থা ইত্যাদি কেন্দ্র করে যে সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তন গড়ে উঠেছিল তিনি তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। এ কথা ঠিক তিনি শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু শাস্ত্র ছিল এখানে উপলক্ষ মাত্র।

বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা সম্পর্কে পূর্বগামীরা অনেকেই মতজ্ঞাপন করলেও বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন তাঁরা কেউ গড়ে তুলতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহের সমর্থনে সর্বপ্রথম আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৮৫৬ সালে এই আন্দোলন সফলতা লাভ করে। ঐ বছরে জুলাই মাসে 'বিধবা-বিবাহ আইন' পাশ হয়। ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে কলকাতায় সর্বপ্রথম আইন-সম্মত বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

খোলা মন নিয়ে বিদ্যাসাগর জীবন ও জগৎকে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন। তাই তিনি সংস্কৃত শিক্ষায় সুপণ্ডিত হয়েও পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের যুগধর্মী সারমর্মটুকুকে সাগ্রহে গ্রহণ করে নিলেন। আবার ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে যা গ্রহণযোগ্য তাকে তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করলেন, আর যা বর্জনযোগ্য তাকেও সাহসের সঙ্গে বর্জন করলেন।

বিদ্যাসাগরের চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—

"মহৎ ব্যক্তিরাই নিজস্ব প্রভাবে একদিকে স্বতন্ত্র,—একক; অন্যদিকে সমস্ত মানব জাতির সবর্ণ—সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয় অমনি অপরদিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালী ছিলেন; স্ব-জাতি ও শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না, স্ব-জাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন—অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোক-হিতৈষা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে যুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন। যুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহাদের যুরোপীয় গভীর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।" (৩৮)

বিদ্যাসাগর কোনো বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তিনি যেমন ব্রাহ্ম মন্দিরে যাবার প্রয়োজন বোধ করেননি, তেমনি হিন্দু মন্দিরে গিয়ে ধর্ণা দিতেও রাজি ছিলেন না। তাঁর জীবন-চরিত লেখক বলেছেন—ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি গায়ত্রী জপ করতেন না। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় তাঁর বাড়ীতে কোনো মূর্তিপূজা হয়নি। বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত প্রণেতা উল্লেখ করেছেন—"ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ সাধনের জন্য বিদ্যাসাগরের মাতৃদেবী ব্যতীত কোনো পৌরাণিক দেবী-প্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।" (৩৯)

বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্পর্কে আধুনিক কালের একজন লেখক মন্তব্য করেছেন—"বালকদের বোধশক্তির বিকাশের জন্য যখন তিনি 'বোধোদয়'

লিখেছিলেন, তখন প্রথম কয়েক সংস্করণে তার মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই তিনি করেন নি। পরে ঈশ্বর প্রসঙ্গ যোগ করেন, কিন্তু সে ঈশ্বর "নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।" বালকদের সাধ্য নেই এই সংজ্ঞা বোঝে। সেইজন্যই যে তিনি প্রথমে বোধোদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যান করতে চান নি তা পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু যখন করলেন তখনও দেখা গেল, বোধোদয়ের প্রথমে পদার্থ বা 'Matter' তার পরে 'ঈশ্বর।' (৪০)

উপরোক্ত ইহ-জাগতিক, বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টির প্রভাবে বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠেন সমাজ-সচেতন, মানব-দরদী, মানবতাবাদী। এই মানবতা বোধের কল্যাণেই সাঁওতাল ও অন্যান্য-অনুন্নত জাতির প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম স্নেহ ও সহানুভূতি।

বিদ্যাসাগর চরিত্র চিত্রণে রবীন্দ্রনাথ এই বিরাট পুরুষের যে পরিচয় দিয়েছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালী জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে,—করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণ কীর্তন করিতে বিরত হই, তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কারণ বিদ্যাসাগরের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটিই বারংবার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালী বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড় ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন।" (৪১)

অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের বস্তুবাদের প্রতি ঝোঁক, তাঁদের প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারের জন্যে আন্তরিকতা তাঁদের আরও কয়েকজন সহকর্মীর মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের বন্ধু পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-৫৮) ছিলেন স্ত্রী শিক্ষার উৎসাহী সমর্থক। রামকমল ভট্টাচার্য ছিলেন (১৮৩৪ ৬০) নর্মাল স্কুলের শিক্ষক। তিনি ছিলেন একাধারে হিন্দু দর্শন

ও পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত। তিনি বাঙলা ভাষায় বেকনের গ্রন্থ থেকে কয়েকটি সন্দর্ভ বেছে নিয়ে অনুবাদ করেন। কোঁতে ও মিলকে তিনি গুরু বলে শ্রদ্ধা করতেন। রামকমলের ভাই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যও (১৮৪০-১৯৩২) ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনিও ছিলেন কোঁতের ভক্ত। তাঁর স্মৃতি কথায় তিনি বলেছেন—আমি Positivist ; আমি নাস্তিক। (৪২)

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির প্রথমে সম্পাদক ও পরে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

এই যুগের আর একজন কৃতকর্মা ব্যক্তি ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০)। তিনি বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা বিবাহ আন্দোলনের ছিলেন উৎসাহী সমর্থক। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহের সমর্থনে তিনি ৩০০০ লোকের স্বাক্ষরযুক্ত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

সমসাময়িক রাজনীতি সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন শ্লেষের ছলে হলেও নিজের মত লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ১৮৫৭ সালের 'মিউটিনি'কে উপলক্ষ করে তিনি সাহেবদের গাল পাড়লেন এই বলে—

"শ্রীবৃদ্ধিকারী সাহেবরা (হিন্দুর দেবতা পঞ্চাননের মত) বড় ছেলের কিছু কত্তে পারলেন না, ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙবার উজ্জুগ পেলেন—সেপাইদের রাগ বাঙালির উপর ঝাড়তে লাগলেন। লার্ড ক্যানিংকে বাঙালিদের অস্ত্রশস্ত্র (বঁটি ও কাটারি মাত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ করলেন। বাঙালিরা বড় বড় রাজকর্ম না পান তারও তদ্বির হতে লাগলো, ডাকঘরের কতগুলি ক্ষেড়ে প্যায়দাদের অন্ন গ্যালো, নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে (চোর চায় ভাঙা ব্যাড়া), দাদন, গাদন ও শ্যামচাঁদ খ্যালাতে লাগলেন। ......ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা মিউটিনি উপলক্ষে কিছুকাল শিকলি পড়লেন।"

এই সময়ে বাঙালী জমিদারেরা রাজানুগত্য দেখাবার জন্যে যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছিল মনে হয় কালীপ্রসন্ন তাতে মনের সঙ্গে সায় দিতে পারেননি। 'হুতোম' বলছেন—বাঙালীরা ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল

মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে—"যদিও একশ বছর হয়ে গ্যালো, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙালীই আছেন—বহুদিন ব্রিটিশ সহবাসে, ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্রিটিশ ব্যবহারেও আমেরিকানদের মত হতে পারেননি। (পারবেন কিনা, তারও বড় সন্দেহ)!"

ক্রমশ নতুন ভাবধারা প্রচারের মাধ্যম হিসাবে নতুন একটি গদ্য স্টাইল গড়ে তোলারও প্রয়োজন হল। রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করে একটি নতুন গদ্য স্টাইল সৃষ্টি করলেন। কালীপ্রসন্নের 'মহাভারত' অনুবাদ এবং রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলিও এই গদ্য স্টাইলের সৃষ্টিকে পুষ্ট করল। তবে রামমোহন অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের স্টাইলটি ছিল সংস্কৃত ঘেঁষা, কঠিন শব্দযুক্ত, তার পাশাপাশি প্যারীচাঁদ মিত্র লোকায়ত একটি গদ্য স্টাইলের পত্তন করলেন। আলালের ঘরের দুলালে' এই লোকায়ত স্টাইলের হল প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এই ধারা অনুসরণ করে প্যারীচাঁদের সহকর্মী রাধানাথ সিকদার কথ্য ভাষায় একখানি ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। কালীপ্রসন্ন "হুতোম প্যাঁচার নকশায়" এই লোকায়ত স্টাইলের কার্যকারিতা প্রমাণ করলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কাব্যের ক্ষেত্রেও নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হল। মাইকেলের পূর্বে জনকয়েক প্রগতিশীল বাঙালী কবি নতুন ভাবধারা প্রচারের মাধ্যম হিসাবে কাব্যলক্ষ্মীকে বেছে নেন। তাঁদের মধ্যে একটি নিজস্ব ধারায় স্বপ্রতিষ্ঠ ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯)।

যে সময়ে তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন তখন নব ভাবের বন্যায় কলকাতা প্লাবিত অথচ ঈশ্বরচন্দ্র অনেকাংশে ছিলেন ভারতচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য। ফলে ঈশ্বরচন্দ্র পুরানোকেও সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারলেন না, আবার নতুনকেও সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারলেন না। এই আগু-পিছুর বিড়ম্বনায় ঈশ্বর গুপ্তের কবি-প্রতিভা কতকাংশে দ্বিখণ্ডিত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বুর্জোয়া জীবনদর্শনকে প্রাণভরে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ, 'অক্ষয় দত্তের বাহ্যবস্তু' প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর তীব্র শ্লেষ।

স্বজাতিবোধের নামে দেশে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুশাসনগুলিরও তিনি অনেক সময় গুণগান করেছেন। "দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া"—এই ছত্রটিতে দেশপ্রেমের যে ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে তাকেও উচ্চ আদর্শ বলা চলে না। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দকে (নানা সাহেব, লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতিকে) তিনি যেভাবে চিত্রিত করেছেন তাতেও তাঁর খণ্ডিত দেশপ্রেমেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ঈশ্বরগুপ্ত প্রচারিত দেশপ্রেমের প্রকাশ যতই খণ্ডিত হোক, তাঁর কাব্য তদানীন্তন অবস্থায় দেশবাসীর মনে বাঙলার প্রতি ভালবাসা, দেশের পরাধীনতা সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত করতে সাহায্য করেছিল এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

কোম্পানীর আমলে বাঙলার দুর্গত অবস্থা, দ্রব্য-মূল্যবৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ, নীলকরদের অত্যাচার তিনি নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন তাঁর কবিতা-গুলিতে। প্রকাশভঙ্গী তাঁর যাই হোক, তাঁর কণ্ঠস্বর দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল—

"মিছা মণি মুক্তা হেম
স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাহি আর"।

মাইকেলের পুরোগামী কয়েকজন বাঙালী কবি ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন সকলেই ওয়েলিংটনের দত্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের নাম গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত, শশীচন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র দত্ত, গিরীশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি। সেদিনকার জনৈক সমালোচকের মতে "গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন এই দলের সেরা কবি"। মাইকেলও প্রথম জীবনে ইংরেজীতেই কাব্যচর্চা শুরু করেন।

কিন্তু ভারতীয় সমাজের স্বাধীন বিকাশের প্রয়োজনে মাতৃভাষার চর্চা ক্রমশ অনিবার্য হয়ে উঠল। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বৃটিশ প্রভুত্বের তত্ত্বকথা প্রচার করতে যে ভাঙা ভাঙা বাঙলা ভাষার প্রচার করেন বাঙলার সাহিত্যকারেরা নিজেদের ভাব প্রকাশের তাগিদে তাকে নববেশে ভূষিত করলেন। রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বাঙলা গদ্যের প্রকাশ ক্ষমতা বেড়ে চলল। মধুসূদনের প্রতিভা বাঙলা ভাষার গতিবেগকে

খরতর ও তার ধারণক্ষমতাকে প্রগাঢ়তর করে তুলল। মধুসূদন কর্তৃক প্রবর্তিত এই ছন্দ-বিপ্লবের প্রধান পরিচয় তাঁর অপূর্ব কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দে। এই ছন্দ-বিপ্লবে ইংরেজীর 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্স'ই' ছিল মধুসূদনের মডেল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

যেমন প্রকাশভঙ্গীতে, তেমনি বিষয়বিন্যাসে, মধুসূদনের মৌলিকত্ব অতুলনীয়। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুরণিত প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা সব চেয়ে উজ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে মাইকেল রচিত "মেঘনাদবধ কাব্যের" রাম-রাবণের চরিত্র বৈচিত্র্যে।

মেঘনাদবধ কাব্যের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের চোখে। তিনি লিখেছেন—"মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। ······ ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধা পূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রামলক্ষণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভুত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচুড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথী অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধা দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু অগ্নি ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে, যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে।"

মাইকেলের কাব্যলক্ষী গতিশীলতার রসে সিঞ্চিত। তাই রবীন্দ্রনাথ আরও মন্তব্য করলেন—"যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না বিদায়কালে কাব্যলক্ষী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

মাইকেলের সাহিত্য রক্ষণশীলদের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করল। মধুসূদন রক্ষণশীলদের আক্রমণে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তিনি জনৈক বন্ধুকে লেখেন—

"Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old rascals in the shape of Pandits."

তেমনি গোঁড়া পাদরীদের আক্রমণকেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। মৃত্যু-কালে মধুসূদন যখন শুনলেন যে জীবনে কোনো গীর্জার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না বলে তাঁর অন্তেষ্টিক্রিয়া নিয়ে খ্রীষ্টীয় সমাজে কথা উঠেছে, তখন তিনি তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—"আমি মনুষ্য নির্মিত গীর্জার সংস্রব গ্রাহ্য করি না; আমি ঈশ্বরে বিশ্রাম করিতে যাইতেছি, তিনি আমাকে তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্রামাগারে লুকাইয়া রাখিবেন।"

মধুসূদন দেশের পরাধীনতা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। তিনি আক্ষেপ করলেন—

"আমরা দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?"

দেশের প্রতি মাইকেলের আত্মীয়তাবোধ ছিল সুগভীর। ঢাকাবাসীদের অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি একবার বলেন—"আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি, এ ভ্রমটি হওয়া ভারী অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ঘরে ও শয়ন করিবার ঘরে এক একখানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি, এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যেমনি বলবৎ হয়, অমনি আর্শিতে মুখ দেখি, আরো, আমি শুদ্ধ বাঙ্গালি নহে, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর।"

রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মাইকেলের ঐতিহ্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, মাইকেল যাঁরাই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারার প্রবর্তনে অগ্রণী হলেন তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে একটা ঐক্যবোধ লক্ষিত হয়। এই ঐতিহাসিক পর্বে বাঙলার বুদ্ধিজীবী নেতাদের চোখে পশ্চিমের নতুন সভ্যতার দারুণ নেশা লেগেছে।

এই নেশার ঘোরে তাঁরা তখন ইংরেজকে দেখছেন ভারতে নতুন সভ্যতার অগ্রদূত হিসাবে। কিন্তু বাস্তবের অভিজ্ঞতা তাঁদের মোহের দুর্গে মাঝে মাঝে ফাটল ধরাতে আরম্ভ করেছিল। মাঝে মাঝে নিজের সম্মান, দেশের সম্মান রক্ষার জন্যে তাঁদের ইংরেজকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুঁড়তেও হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের সাধ যাই থাক, সাধ্য ছিল না বেশি কিছু করার, তাই শেষ পর্যন্ত মৃদু প্রতিবাদ করে থেমে যেতে হত। এমন কি ১৮৫৭ সালের মহাকলরবটিও শুনেও না শোনার ভান করতে হল।

সমাজ সংস্কার, পঠন-পাঠন, সেই দিক থেকে তাঁদের কাছে ছিল দেশ সেবার প্রশস্ত পথ।

কিন্তু তাতেও তাঁরা পুরোপুরি রক্ষা পেলেন না। রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, মাইকেল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে যেটুকু আঘাত হানলেন, দেশপ্রেম, গণতন্ত্রবোধ, মানবতাবোধের উদ্বোধনে যেটুকু উদ্যম দেখালেন তাতেই বিদেশী শাসক ও তার দেশীয় সামন্ত অনুচরেরা শঙ্কিত হয়ে উঠল।

১৮৩০ সালে মুঘল রাজের প্রতিনিধি হয়ে রামমোহন যখন লণ্ডনে যান তখন 'জনবুল' পত্রিকা তাকে 'তৈমুর মিশন' বলে বিদ্রূপ করতে থাকে। রক্ষণশীল হিন্দুরা হিন্দু কলেজের পরিকল্পনা সভা থেকে রামমোহনকে বিতাড়িত করলেন। ইংরেজ ও রক্ষণশীল হিন্দুদের এই চক্রান্তের কথা উল্লেখ করে কর্ণেল ইয়ং জেরেমী বেন্থামকে লেখেন—একজন কালা আদমী বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, প্রগতিশীলতায় শাসকশ্রেণীর প্রতিযোগী হয়ে উঠবে এটা এই সব সাহেব সহ্য করতে পারলেন না। (৪৪)

ইয়ং বেংগল আন্দোলনের নেতাদেরও নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। উইলসন সাহেব "এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের" সভা বন্ধ করে দেন 'বিপ্লবী' ভাবধারা প্রচারের অজুহাতে। কালা আইন নিয়ে আন্দোলন করার অপরাধে রামগোপাল ঘোষের বিরুদ্ধে সমস্ত ইওরোপীয় স্বার্থবান লোকেরা একজোট হয়ে তাঁকে এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটির সভাপতির পদ থেকে অপসারিত করেন।

এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' যখন গড়ে উঠল, তখন ইংরেজ শাসকদের কেউ কেউ আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। একজন

মন্তব্য করলেন—"বেশী লেখাপড়া শেখালে বাবুদের মাথা বিগড়ে যাবে, তখন তাদের সামলানো শক্ত হবে।" (৪৫)

এই ভাবে ব্রিটিশ পুঁজিতন্ত্র এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ভাবধারার মধ্যে দেখলেন ভারতের জাতীয়তাবাদী জাগরণের পূর্বাভাস। এই জন্যেই এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন এতটা উদ্বিগ্ন।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

(১) মেকলের মিনিট—২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫
(২) উডের ডেসপ্যাচ, ১৮৫৪
(৩) লর্ড এলেনবরার ডেসপ্যাচ, ১৮৫৮
(৪) 'বঙ্গদূত', জুন ১৩, ১৮২৯
(৫) ঐ
(৬) 'বঙ্গদূত', ২০শে জুন, ১৮২৯
(৭) ঐ
(৮) ১৮৩৩ সালে রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থ—The Father of Modern India—Shibnath Shastri—Rammohan Roy, The Story of his life. P. 26.
(৯) ঐ, Ramananda Chatterjee—Rammohn Roy & Modern India, P. 78.
(১০) ঐ, Amal Home—Supplementary Notes, P. 60.
(১১) আমাহার্স্টের কাছে লেখা চিঠি. ডিসেম্বর ১১, ১৮২৩
(১২) শতবার্ষিকী সংকলন—Ramananda Chatterjee—Rammohan Roy & Modern India P. 75.
(১৩) ইংলণ্ডে জনৈক বন্ধুর কাছে লিখিত একটি চিঠি (১৮৩২) এবং জাকোমণ্ট নামে জনৈক ফরাসী পর্যটকের বিবরণ (১৮২৯) দ্রষ্টব্য—Indian Speeches & Documents on British Rule—edited by J. K. Majumdar, P. 47, 48, 41
(১৪) Bimanbehari Majumdar—History of Political Thought. From Rammohan to Dayananda (1821-84), P. 82 (foot-note)
(১৫) T. Edwardes—Henry Derozio, P. 65.
(১৬) ঐ, পৃঃ ১১৩
(১৭) ঐ, পৃঃ ৩৫
(১৮) ঐ, পৃঃ ৩৫
(১৯) শিবনাথ শাস্ত্রী—"রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,"
(২০) ঐ
(২১) ঐ
(২২) **"History of Native Education in Bengal"—Article in "Calcutta Review." 1852.**

(২৩) দুর্গাদাস লাহিড়ী—"আদর্শচরিত" (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী) পৃঃ ৮১
(২৪) Bimanbehari Majumdar—"History of Political thought" P. 116-18
(২৫) 'জ্ঞানান্বেষণ' ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৩১,—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—"সংবাদপত্রে সেকালের কথা," দ্রষ্টব্য।
(২৬) Abhoy Charan Das—"The Indian Ryot," P. 378
(২৭) Amit Sen—"Notes on the Bengal Renaissance" P. 18.
Priyaranjan Sen—Western Influence in Bengali literature, P. 64.
(২৮) Edwardes—Henry Derozio, P. 139-40
(২৯) হরিশ স্মৃতি সভায় রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতা—Bholanath Chandra, Raja Digambar Mitra, P. 1
(৩০) Edwardes—Henry Derozio, P. 139-40
(৩১) Shibnath Sbastri—History of the Brahmo Samaj, P. 123
(৩২) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আত্মচরিত,
(৩৩) অক্ষয়কুমার দত্ত—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ—২৯ ৪০
(৩৪) ঐ, পৃঃ ১২৯-৩১ .
(৩৫) ঐ, পৃঃ ১৩১
(৩৬) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের অভিমত—'আর্য্যাবর্ত' পত্রিকা থেকে 'পরিচয়' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত, আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৬৪
(৩৭) ঐ
(৩৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণ, বিদ্যাসাগর স্মরণার্থ সভা, ১৩০২
(৩৯) শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—'বিদ্যাসাগর চরিত', পৃঃ ১৩
(৪০) বিনয় ঘোষ—'নবযুগের মানুষ,' বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবন-আশ্বিন, ১৩৬৩
(৪১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ, স্মরণার্থ সভা, ১৩০২
(৪২) সাহিত্যসাধক চরিতমালা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
(৪৩) নীরেন্দ্রনাথ রায়—'সাহিত্য বীক্ষা', 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামক প্রবন্ধ।
(৪৪) Collet—"Life & Letters of Rammohan Roy," P. 141
(৪৫) "Charters & Patriots"—Calcutta Review—1852.

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপনিবেশ বাঙলা
(১৮৫৭-১৮৮৪)

১

১৮১৩ থেকে ১৮৫৭—এই পর্বে কিভাবে কোম্পানীর লুণ্ঠনাশ্রয়ী শোষণ ব্যবস্থার পরিবর্তে শিল্প পুঁজির স্বার্থে ভারত শোষণের নতুন অধ্যায় উন্মুক্ত হয় তার বিবরণ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এই নতুন ধরনের শোষণ-ব্যবস্থাকে বলা হয় নতুন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা।

এই নতুন ব্যবস্থার মর্মকথা হল—বিলাতী শিল্পপতিদের স্বার্থ অনুযায়ী ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাটিকে পরিচালিত করতে হবে। এই স্বার্থ অনুযায়ী ভারতের বাজারটি ব্রিটিশ পণ্যের জন্যে সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে। আর ব্রিটিশ শিল্পের পক্ষে যে সমস্ত কাঁচামাল প্রয়োজন তা ভারতে তৈরি হবে। এক কথায় ভারত হবে—ব্রিটেনের কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ মাত্র। ব্রিটেন থেকে পণ্য আমদানি, ও ভারত থেকে ব্রিটেনে কাঁচামাল রপ্তানি যতই বৃদ্ধি পেতে থাকল ততই এই কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে যাতায়াত ব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা ছিল।

এই উদ্দেশ্যেই ইংরেজ শাসনের উদ্যোগে এই পর্বে গড়ে উঠতে থাকল—রেলপথ, আধুনিক রাস্তা ঘাট, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা বড় বড় বন্দর ইত্যাদি।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরে কোম্পানীর লুণ্ঠনাশ্রয়ী শাসনব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক ভাবে ছেদ টেনে দেওয়া হল। এবং শিল্প পুঁজির প্রয়োজন অনুযায়ী ভারত শাসনের বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করা হল।

ইংরেজ শাসনের এই নতুন নীতি লর্ড বেন্টিঙ্ক ও লর্ড ডালহৌসীর আমল থেকে কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে থাকল। লর্ড ডালহৌসী তাঁর রেলওয়ে সংক্রান্ত একটি মন্তব্যে এই উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন। উদ্দেশ্যটি হল—ব্রিটিশ পণ্যের বাজার এবং কাঁচামালের উৎস হিসাবে ভারতকে গড়ে তোলা। তাঁর নিজের কথায়—"আমার প্রকৃত বিশ্বাস যে এইগুলি (রেলপথ) প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভারত উহা হইতে যে বাণিজ্যিক ও সামাজিক সুবিধা লাভ করিবে, তাহা বর্তমানে হিসাবের বাইরে। যে তুলা ভারত এখনই কিছু পরিমাণে উৎপাদন করে, এবং কেবল দূরস্থ প্রদেশ হইতে জাহাজে বোঝাই করিয়া বন্দরে উহা আনিবার জন্য উপযুক্ত যানবাহনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই যাহা ভারত প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিবে—সেই তুলা ইংলণ্ড তারস্বরে চাহিতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে ব্যবসায়ের সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী বাজারেও ইওরোপের তৈয়ারি জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িয়াছে…। পৃথিবীর এইদিকে এমন অবস্থার ভিতর নূতন বাজার খুলিয়া যাইতেছে যে উহার মূল্য নিরূপণ করা বা ভবিষ্যৎ আকার হিসাব করা সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তির দূরদৃষ্টিরও অতীত।" (১)

বস্তুত, লর্ড ডালহৌসীর এই মন্তব্য বিলাতের শিল্পপতিদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। এই সময়ে বিলাতের শিল্পপতিদের স্বপ্ন ছিল—স্বয়ংসম্পূর্ণ এক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলা অর্থাৎ বিলাতের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উপনিবেশগুলো থেকে সংগ্রহ করা। শিল্পপতিদের হিসাব কি ধরনের ছিল তার অতি সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় দেওয়া এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন। বিলাতের শিল্পপতিদের চিন্তার গতি ছিল নিম্নরূপ :

"আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস কি উপনিবেশগুলো থেকে সংগ্রহ করা যায় না? চীন থেকে ইংলণ্ডে আগে চা আমদানি হত, ভারতের চা এখন সেই স্থান ক্রমশ পূরণ করছে; তাহলে ইংলণ্ডের প্রয়োজনীয় কফিও কি ভারতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়? ক্রীতদাস প্রথা রহিত করার পরে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চিনির উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, এই অবস্থায় ইংলণ্ডের প্রয়োজন মেটাতে ভারত কি চিনি উৎপাদন করতে পারে না? আমেরিকার তুলা ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে; ভারত কি এই পরিমাণ কাঁচা তুলা উৎপাদন করে বিলাতে পাঠাতে পারে না?"

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপনিবেশ বাঙলা
(১৮৫৭-১৮৮৪)

১

১৮১৩ থেকে ১৮৫৭—এই পর্বে কিভাবে কোম্পানীর লুণ্ঠনাশ্রয়ী শোষণ ব্যবস্থার পরিবর্তে শিল্প পুঁজির স্বার্থে ভারত শোষণের নতুন অধ্যায় উন্মুক্ত হয় তার বিবরণ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এই নতুন ধরনের শোষণ-ব্যবস্থাকে বলা হয় নতুন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা।

এই নতুন ব্যবস্থার মর্মকথা হল—বিলাতী শিল্পপতিদের স্বার্থ অনুযায়ী ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাটিকে পরিচালিত করতে হবে। এই স্বার্থ অনুযায়ী ভারতের বাজারটি ব্রিটিশ পণ্যের জন্যে সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে। আর ব্রিটিশ শিল্পের পক্ষে যে সমস্ত কাঁচামাল প্রয়োজন তা ভারতে তৈরি হবে। এক কথায় ভারত হবে—ব্রিটেনের কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ মাত্র। ব্রিটেন থেকে পণ্য আমদানি, ও ভারত থেকে ব্রিটেনে কাঁচামাল রপ্তানি যতই বৃদ্ধি পেতে থাকল ততই এই কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে যাতায়াত ব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা ছিল।

এই উদ্দেশ্যেই ইংরেজ শাসনের উদ্যোগে এই পর্বে গড়ে উঠতে থাকল—রেলপথ, আধুনিক রাস্তা ঘাট, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা বড় বড় বন্দর ইত্যাদি।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরে কোম্পানীর লুণ্ঠনাশ্রয়ী শাসনব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক ভাবে ছেদ টেনে দেওয়া হল। এবং শিল্প পুঁজির প্রয়োজন অনুযায়ী ভারত শাসনের বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করা হল।

ইংরেজ শাসনের এই নতুন নীতি লর্ড বেন্টিঙ্ক ও লর্ড ডালহৌসীর আমল থেকে কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে থাকল। লর্ড ডালহৌসী তাঁর রেলওয়ে সংক্রান্ত একটি মন্তব্যে এই উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট করে ঘোষণা করলেন। উদ্দেশ্যটি হল—ব্রিটিশ পণ্যের বাজার এবং কাঁচামালের উৎস হিসাবে ভারতকে গড়ে তোলা। তাঁর নিজের কথায়—"আমার প্রকৃত বিশ্বাস যে এইগুলি (রেলপথ) প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভারত উহা হইতে যে বাণিজ্যিক ও সামাজিক সুবিধা লাভ করিবে, তাহা বর্তমানে হিসাবের বাইরে। যে তুলা ভারত এখনই কিছু পরিমাণে উৎপাদন করে, এবং কেবল দূরস্থ প্রদেশ হইতে জাহাজে বোঝাই করিয়া বন্দরে উহা আনিবার জন্য উপযুক্ত যানবাহনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই যাহা ভারত প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিবে—সেই তুলা ইংলণ্ড তারস্বরে চাহিতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে ব্যবসায়ের সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী বাজারেও ইওরোপের তৈয়ারি জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িয়াছে…। পৃথিবীর এইদিকে এমন অবস্থার ভিতর নূতন বাজার খুলিয়া যাইতেছে যে উহার মুল্য নিরূপণ করা বা ভবিষ্যৎ আকার হিসাব করা সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তির দূরদৃষ্টিরও অতীত।" (১)

বস্তুত, লর্ড ডালহৌসীর এই মন্তব্য বিলাতের শিল্পপতিদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। এই সময়ে বিলাতের শিল্পপতিদের স্বপ্ন ছিল—স্বয়ংসম্পূর্ণ এক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলা অর্থাৎ বিলাতের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উপনিবেশ-গুলো থেকে সংগ্রহ করা। শিল্পপতিদের হিসাব কি ধরনের ছিল তার অতি সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় দেওয়া এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন। বিলাতের শিল্পপতিদের চিন্তার গতি ছিল নিম্নরূপ :

"আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস কি উপনিবেশগুলো থেকে সংগ্রহ করা যায় না? চীন থেকে ইংলণ্ডে আগে চা আমদানি হত, ভারতের চা এখন সেই স্থান ক্রমশ পূরণ করছে; তাহলে ইংলণ্ডের প্রয়োজনীয় কফিও কি ভারতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়? ক্রীতদাস প্রথা রহিত করার পরে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চিনির উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, এই অবস্থায় ইংলণ্ডের প্রয়োজন মেটাতে ভারত কি চিনি উৎপাদন করতে পারে না? আমেরিকার তুলা ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে; ভারত কি এই পরিমাণ কাঁচা তুলা উৎপাদন করে বিলাতে পাঠাতে পারে না?"

—৯

যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। ইংলণ্ডের শিল্পপতি ও তাঁদের ভারতস্থিত প্রতিনিধিরা ল্যাঙ্কাশায়ারের কারখানার উপযোগী কাঁচামাল উৎপাদনের কাজে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠল। এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৬ সালে বাঙ্‌লায়, ১৮৩৮ সালে বোম্বাই এবং ১৮৪৪ সালে মাদ্রাজে উৎপন্ন কাঁচা তুলার ইংলণ্ডে রপ্তানির পক্ষে যে শুল্ক ছিল তা রহিত করা হল।

ভারতে কাঁচা তুলা উৎপাদন যাতে বাড়ে তার ব্যবস্থা করার জন্যে আমেরিকা থেকে বিশেষজ্ঞ আমদানি করা হল; ভারতে পরীক্ষামূলকভাবে কৃষি খামার খোলা হল। কিন্তু ভারতে উৎপন্ন তুলা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হওয়ার দরুণ ব্রিটিশ শিল্পপতিদের সাধ সম্পূর্ণ মিটল না। তবুও তাদের হিসাব যে একেবারে ভুল হয়েছিল তাও নয়। ১৮৬০ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ দেখা দিলে, ঐ দেশ থেকে ইংলণ্ডে কাঁচা তুলা আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। ভারতে উৎপন্ন কাঁচাতুলার সাহায্যে এই সময়ে ইংলণ্ডের শিল্পগুলোকে অনেকাংশে চালু রাখতে হয়েছিল। ফলে ১৮৬২-৬৫ এই ক'বছরে ভারত থেকে ইংলণ্ডে রপ্তানিকৃত কাঁচা তুলার পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। তবে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পরে ভারত থেকে কাঁচামাল রপ্তানির পরিমাণ আবার বিশেষভাবে হ্রাস পায়। (৩)

এইসঙ্গে ব্রিটিশ পুঁজির উদ্যোগে ভারতে চা উৎপাদনেরও চেষ্টা চলতে থাকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে ১৮৩৫ সালে প্রথম একটি চা বাগান খোলা হয়। তারপরে ১৮৫২ সালে সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত উদ্যোগে চা বাগান খোলা হল। তারপর থেকে এই শিল্পটিতে ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫০ সালে চা বাগান ছিল মাত্র ১টি, ১৮৫৩ সালে ১০টি, ১৮৫৯ সালে ৪৮টি, ১৮৬৯ সালে ২৬০টি এবং ১৮৭১ সালে ২৯৫টি। এইভাবে প্রধানত ব্রিটিশ উদ্যোগে ব্রিটেনের প্রয়োজন মেটাতে ভারতে চা শিল্পের পত্তন হয়।

ব্রিটিশ পুঁজির উদ্যোগে এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় আর একটি প্রধান আধুনিক শিল্প চটকল। ১৮৫৪ সালে কলকাতার সন্নিকটে রিষড়ায় অ্যাকল্যাণ্ড নামে জনৈক ইওরোপীয় ভদ্রলোক প্রথম চটকল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬২ সালে আরও দুটি চটকল খোলা হয়। ১৮৭৪ সালের পর থেকে এই শিল্পটিতে ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭৪ সালে চটকলের সংখ্যা ছিল

৯টি, ১৮৭৫ সালে ১৭টি, ১৮৮২ সালে ২০টি। এই কুড়িটি মিলই কলকাতা ও কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল। ১৮৮২ সালে এই কুড়িটি মিলে নিযুক্ত শ্রমিকের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় কুড়ি হাজার।

ব্রিটিশ পুঁজির উদ্যোগেই এ দেশে প্রথম কয়লা খনি খোঁড়া আরম্ভ হয়। ১৭৭৪ সালে দুজন ইওরোপীয় ভদ্রলোক সর্বপ্রথম ভারতে কয়লা খনি খোঁড়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ফলবতী হয়নি। ১৮২০ সালে রানীগঞ্জ এলাকায় প্রথম কয়লাখনির কাজ আরম্ভ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই এই শিল্পটিরও ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫৪ সালে কয়লাখনি ছিল মাত্র ৩টি, ১৮৬০ সালে ৫০টি, ১৮৮০ সালে ৬০টি। ১৮৩৯ সালে কয়লা উৎপাদন হত ৩৬,০০০ হাজার টন, আর ১৮৮০ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১,০০০,০০০ টন। এই শিল্পটিরও প্রধান কেন্দ্র ছিল বাঙলা দেশের রানীগঞ্জ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল। ১৮৯৯ সালে এই শিল্পটিতে নিযুক্ত শ্রমিকের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় কুড়ি হাজার।

এই সময়ে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গঠনেও কিছু কিছু উদ্যম দেখা দেয়। তবে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়নি। ১৮৩৯ সালে 'জেসপ এণ্ড কোম্পানীর' কর্তৃত্বে বরাকরে পরীক্ষামূলকভাবে একটি লৌহ কারখানা খোলা হয়। কিন্তু এটি কার্যকরী হয়নি। ১৮৫৫ সালে 'ম্যাকে এণ্ড কোং' বীরভূমে মাহমদবাজারে একটি লৌহ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এটিও ব্যর্থ হয়। ১৮৭৫ সালে 'বার্ন কোম্পানী' ঐ কারখানাটি আবার চালু করতে চেষ্টা করে পুনরায় ব্যর্থ হয়। ১৮৭৫ সালে আসানসোলে 'বেঙ্গল আয়রন কোম্পানী' খোলা হয়। প্রথম দিকে এই কোম্পানীও সফলতা লাভ করেনি। ১৮৯৪ সালে 'মার্টিন এণ্ড কোম্পানী' ভার নেওয়ার পরে কারখানাটি কিছুটা সাফল্য লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্রিটিশ শিল্প-পতিদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বন্দরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এই সময়ে রাস্তাঘাট, ক্যানেল, রেলপথ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় আরম্ভ হয়। এই সঙ্গে পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফ প্রভৃতিরও প্রবর্তন হয়।

অবশ্য, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও রাস্তাঘাট তৈরির পিছনে সম্ভাব্য বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যটিও প্রচ্ছন্ন ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য—১৮৫৫

সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়ে কলকাতা থেকে বহরমপুর পর্যন্ত টেলিগ্রাফ প্রবর্তন করা হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় রেলপথ ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থাটিকে যতটা সম্ভব কাজে লাগানো হয়েছিল।

১৮৫১-৫২ সালে মাত্র ৪২ মাইলের উপর টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৮৫৭ সালের মধ্যে ৪,৫০০০ হাজার মাইলের উপর টেলিগ্রাফের তার বসান হল।

১৮৫৭ সালের আগে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে, ও মাদ্রাজ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়। ১৮৫৪ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অধীন মাত্র ৩৭৷৷০ মাইলের উপর রেলপথ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে এই রেলওয়ের অধীনে কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত ১২১ মাইল রেলপথ খোলা হল। পরে ১৮৭২ সালের মধ্যে ক্রমশ কলকাতা থেকে মুলতান ও বোম্বে পর্যন্ত রেলপথ খোলার কাজ সম্পন্ন হয়। ১৮৭২ সালে ভারতে ৫৮৭২ মাইলের উপর রেলপথ বিস্তৃত হয়।

এই ভাবে প্ল্যানটেশন অথবা আধুনিক কৃষি খামার (নীল, চা, কফি প্রভৃতি, এবং আধুনিক ফ্যাক্টরী শিল্প (চটকল, সূতাকল প্রভৃতি), ষ্টীম এঞ্জিন চালিত রেলগাড়ী, জাহাজ, ক্যানেল, আধুনিক রাস্তাঘাট, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি শিল্পোন্নয়নের প্রধান প্রধান উপকরণগুলির পত্তন হল। ইংরেজের সংস্পর্শে আসার ফলে ভারতে উৎপাদনের নতুন যন্ত্রপাতি প্রবর্তিত হল। ভারতে পুঁজিতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হল। দুনিয়ার পুঁজিবাদী পরিমণ্ডলের সঙ্গে ভারত সংযুক্ত হয়ে পড়ল।

তবে ভারতে পুঁজিতন্ত্রে যেটুকু বিকাশ হল সেটুকুও ভারতের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে নয়। সেটুকুরও প্রবর্তন হল বিদেশী ইংরেজ শিল্পপতিদের স্বার্থের আনুকূল্য করার তাগিদে। সেই জন্যেই ভারতের প্রয়োজনে যেদিকে ঝোঁক পড়া উচিত ছিল তা পড়ল না, পড়ল ঠিক সেই দিকে যেদিকে ইংরেজের ছিল প্রয়োজন।

ইংরেজ শাসনের নিরাপত্তার জন্যেই তাই শুরু হল রেলপথ ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন। ইংরেজ শিল্পপতিদের প্রয়োজনের খাতিরেই শুরু হল এমন সব শিল্পের প্রবর্তন যেগুলির ফলে ইংলণ্ডের শিল্পোন্নয়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের আর অভাব থাকবে না।

বলাই বাহুল্য, নব প্রবর্তিত এই শিল্পগুলির উপর ভারতীয়দের কোনো কর্তৃত্ব রইল না। এই সব শিল্পে অগ্রণী হল ইংরেজ মালিকেরা স্বয়ং।

ভারতে নীলকুঠি গড়ে উঠেছিল ইংরেজ কুঠিয়ালদের মালিকানায়। ১৮৩১ সালে শুধু বাংলায় ৩০০ থেকে ৪০০ নীলকুঠি ছিল। এই সব কারখানার মালিক হিসাবে প্রায় ৫০০ থেকে ১০০০ হাজার ইওরোপীয় নিযুক্ত ছিল।

প্রধানত অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সরকারী কর্মচারী অথবা সৈনিক অফিসারদের টাকায় এ-দেশের চা-বাগানগুলি গড়ে ওঠে। চা-বাগানের মালিকদের লভ্যাংশ ছিল বিরাট। ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৬ এই ৯ বছরের মধ্যে দশটি লণ্ডন কোম্পানী অংশীদারদের গড়ে ৯% লভ্যাংশ দিতে সক্ষম হয়েছিল।

কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত চটকলগুলি সম্পূর্ণ ইংরেজ কবলিত। চটকলগুলি যে লভ্যাংশ বণ্টন করে তা কল্পনাতীত।

কয়লা খনির মালিকানাও ইংরেজদের হাতে—শতকরা ৮২টি খনির মালিক ছিল ইংরেজ।

প্রথমে লৌহ কারখানা খোলে ইংরেজ কোম্পানী। রেলপথ ও টেলিগ্রাফ প্রবর্তনের ভারও পড়ে ইংরেজ কোম্পানীর উপর।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বিষয়টি বেশ পরিষ্কার যে ভারতের শিল্পোন্নয়ন বা দেশীয় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ সাধন ইংরেজের কোনোদিনই অভিপ্রেত ছিল না। ইংরেজ নিজের সংকীর্ণ বাণিজ্যগত স্বার্থে, ভারত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের তাগিদে এ-দেশে এক ধরনের একপেশে শিল্পোন্নয়নকে সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছিল মাত্র।

ভারতীয় পুঁজিবাদের প্রথম সূচনা

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ একবার আরম্ভ হওয়ার পরে এটিকে সব ক্ষেত্রে পুরোপুরি ইংরেজদের পক্ষপুটে সীমাবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হল না। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো শিল্পে ভারতীয় পুঁজির বিকাশের সুযোগ উন্মুক্ত হতে থাকল। তবে ইংরেজ শিল্পপতিরা প্রথম থেকেই নজর রাখল ভারতীয় শিল্পপতিরা যাতে তাদের সমকক্ষ হতে না পারে। সেইজন্যে ইংরেজ শিল্পপতিদের ছোট অংশীদার হিসাবেই ভারতীয় শিল্পপতিদের আবির্ভাব হল। ইংরেজ শিল্পপতিদের সঙ্গে যখনই ভারতীয়

শিল্পপতিদের প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা দেখা দিত তখনই দেশীয় পুঁজিতন্ত্রের কণ্ঠরোধের জন্তে ইংরেজ শিল্পপতিরা রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্য নিতে থাকল।

ইংরেজ কুঠিয়ালদের কৃপায় জনকয়েক ভারতীয় ধনী লোক নীলকুঠি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। তবে তাঁদের প্রভাব ছিল একেবারে নগন্য।

চা-বাগানের উপর ইংরেজদের আধিপত্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই শিল্পটিতেও ভারতীয় পুঁজিপতিরা ইংরেজদের ছোট অংশীদার হবার কথঞ্চিৎ অধিকার লাভ করেছিল।

ভারতীয় পুঁজির উদ্যমে গড়ে ওঠা শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান ছিল বোম্বাই প্রদেশে কেন্দ্রীভূত কাপড়ের কলগুলি।

"বোম্বে উইভিং এণ্ড স্পিনিং কোম্পানীর" উদ্যোগে ১৮৫১ সালে সর্বপ্রথম ভারতে কাপড়ের কল খোলা হয়। তবে এই মিলটিতে কাজ আরম্ভ হয় ১৮৫৫ সালে। ১৮৬১ সালের মধ্যে বারটি কল স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৭২-৭৩ সালে বোম্বাইতে ১৮টি কল আর বাঙলায় দুটি কল খোলা হয়। ১৮৭৪ ৭৫ সালের পর থেকে এই শিল্পে দ্রুত উন্নতি দেখা দেয়। (৪)

১৮৫৪	—	১
১৮৬১	—	১২
১৮৭৪	—	১৯
১৮৭৫	—	৩৬
১৮৭৬	—	৩৯
১৮৭৮	—	৪২
১৮৭৯	—	৫৬
১৮৮৬-৮৭	—	৯০
১৮৯০	—	১১৪
১৯০০	—	১৯৩

১৮৭৪ সাল থেকেই যখন ভারতীয় পুঁজির উদ্যোগে কাপড়ের কল খোলার উৎসাহ বাড়তে থাকল, ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলের মালিকেরা ভারতীয় কলের প্রতিযোগিতার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তাদের অনুরোধে ১৮৮২ সালে বিলাতী কাপড় আসার পথে যে আমদানি শুল্ক ছিল

তা রহিত করা হল। এইভাবে উদীয়মান ভারতীয় শিল্পটির মূলে আঘাত করেও ব্রিটিশ শিল্পপতিরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারল না। ১৮৯৪ সালে ঐ আমদানি শুল্ক ছাড়া ভারতে প্রস্তুত কাপড়ের উপর এক নতুন কর (Excise duty) বসানো হল।

ব্রিটিশ সরকার যে ভারতের শিল্পোন্নয়ন চায়নি—ব্রিটিশ শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ ছাড়া তার কাছে ভারতের আর কোনো ভূমিকাই ছিল না—ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকারের উপরোক্ত নীতি থেকেই তা পরিস্ফুট।

তবুও ইংরেজ শিল্পপতি ও ভারতস্থিত ইংরেজ রাষ্ট্রনায়কদের সুপরিকল্পিত বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতীয় পুঁজিবাদের পত্তন হল—এটাই হল প্রধান কথা। ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ভারতের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে নব যুগের সূচনা করল।

নতুন সামাজিক শক্তির উন্মেষ

ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের ফলে ভারত উন্নততর এক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হল। নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তনে ভারতের সামাজিক কাঠামোটিও অনেকটা পরিবর্তিত হল। এখন থেকে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে তিনটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হল। এই তিনটি শ্রেণী হল—(১) ভারতীয় শিল্পপতি (বুর্জোয়া) শ্রেণী (২) শ্রমিক শ্রেণী ও (৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

১৮৮০ সালের আগে ভারতীয় পুঁজিতন্ত্র তার শৈশবাবস্থা অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু তবুও উপরোক্ত তিনটি শ্রেণীর আবির্ভাব ভারতের সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দিল।

১৮৮০ সালে সূতাকল ও চটকলে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৬৮০০০। তার সঙ্গে চা-বাগানে বহু শ্রমিক কাজ করত। তবে ভারতের মোট জন-সংখ্যার তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা তখনও একেবারেই নগণ্য। চেতনা ও সংগঠনের দিক থেকে বিচার করলে এই সময়ে শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি অকিঞ্চিৎ-কর ছিল বলা চলে।

এই সময়ে একটি শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হতে আরম্ভ করে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী ও নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উৎপত্তির ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর থেকে বাঙ্‌লা দেশে জমিদার শ্রেণী অর্থশালী হয়ে ওঠে। এই জমিদারদের মধ্যে যাঁরা দূরদর্শী ছিলেন তাঁরা ব্যবসাতে টাকা নিয়োগ করতে মনোযোগী হলেন।

তাছাড়া, ১৮১৩ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল তাঁরাও অনেকে ব্যবসাতে টাকা নিয়োগ করলেন। এই বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ সরকারী চাকুরী ও বিলাতী সওদাগরদের দালালী করে অনেক টাকা জমাতে পেরেছিলেন। ১৮৫০ সালে এই চাকুরীজীবীদের সঞ্চয়ীকৃত অর্থের মোট পরিমাণ ছিল ৬৯,০০০,০০০ পাউণ্ড। (৫) এই সময়ে যেহেতু শিল্পে বা অন্য কোনো লাভজনক উপায়ে অর্থ নিয়োগের সম্ভাবনা ছিল না তাই উপরোক্ত সমস্ত অর্থই সরকারী কাগজে নিযুক্ত থাকত। এই সময়ে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিতে নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ছিল ১৯,০০০,০০০ পাউণ্ড। (৬)

১৮৮০ সালের মধ্যে দেখা গেল যে ভারতীয় পুঁজির পরিমাণ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐ বছরে শুধু সেভিংস ব্যাঙ্ক ও জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীতে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০,০০০,০০০ পাউণ্ড। (৭)

এই হিসাব থেকেই দেখা যায় ধনী জমিদার ও ধনী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এই সঞ্চয়ীকৃত অর্থের কল্যাণেই ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল।

ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধরনের এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবও অপরিহার্য হয়ে উঠল। এতদিন ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা সংখ্যায় ছিল মুষ্টিমেয় এবং তারা অধিকাংশ হয় সওদাগরি অফিসের দালালি নয় সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমশ একটি স্বাধীন বা অর্ধ স্বাধীন ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব হল।

নিম্নলিখিত হিসাব থেকে দেখা যাবে ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর থেকে ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যা কিভাবে বাড়তে থাকে।

১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এনট্রান্স পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী ছিল ২৪৪ জন। ১৮৬৩ সালে অর্থাৎ পাঁচ বছর পরে এনট্রান্স পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাড়াল ১৩২৭ জন। প্রতি বছর এই সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকল। (৮)

এই শিক্ষিত যুবকেরা কর্মজীবনে প্রবেশ করে. কেউ শিক্ষক হলেন, কেউ উকিল হলেন, কেউ ডাক্তার হলেন, কেউ মাষ্টার হলেন, আর কেউ সওদাগরী অফিসের কেরানি হলেন। ১৮৫৭ সালের আগে সরকারী চাকুরী ছাড়া আর কোনো আশ্রয় ছিল না, এখন কিছু কিছু স্বাধীন বা অর্ধ স্বাধীন পেশার সুযোগ উন্মুক্ত হল।

এইভাবে ভারতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের ফলে দুটি নতুন সজাগ শ্রেণীর আবির্ভাব হল—একটি বুর্জোয়া শ্রেণী আর একটি নতুন ভাবধারায় উদ্দীপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

কিন্তু উদীয়মান এই বুর্জোয়া শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরাধীন সমাজের খোলসের মধ্যে আত্মস্ফুরণের সুযোগ পেল না। তাই বিদেশী শাসনের সঙ্গে তাদের বিরোধ উপস্থিত হল।

বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে সঞ্চয়ীকৃত অর্থের পরিমাণ যতই বাড়তে লাগল এবং লাভজনক উপায়ে এই সঞ্চয়ীকৃত অর্থ নিয়োগের সুযোগের অভাব সম্পর্কে তারা যতই সচেতন হতে লাগল, ততই তারা ব্রিটিশ সরকারের নীতি সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হতে থাকল।

ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা ছিল আরও খারাপ। শিক্ষিতের সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল, ততই তাদের কাজ মেলার সম্ভাবনা দুষ্কর হতে থাকল।

জনৈক বাঙালী বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মর্মব্যথা এইভাবে প্রকাশ করলেন—"বস্তুত জগৎশুদ্ধ লোক কি কখনও কেরাণী অথবা স্কুল মাষ্টার অথবা উকীল হইতে পারে?......শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগের জন্ম দিন দিন আমরা দীন হইয়া পড়িতেছি। ইংলণ্ডের উপর আমাদের নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে, কাপড় পড়িতে হইবে, ইংলণ্ড হইতে কাপড় না আইলে আমরা পড়িতে পাই না। ছুরি, কাঁচি ব্যবহার করিতে হইবে, বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আইলে আমরা তাহা ব্যবহার করিতে পাই না। এমন কি, বিলাত হইতে লবণ না আইলে আমরা আহার করিতে পাই না। দেশালাইটি পর্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে আমরা আগুণ জ্বালিতে পাই না। দেশ হইতে কিছুই হইতেছে না।" (৯)

বিক্ষুব্ধ বুর্জোয়া শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশ অর্থনৈতিক পরাধীনতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করতে লাগল। বাঙলা দেশে হিন্দু মেলার অধিবেশনে, 'বঙ্গদর্শনের' পাতায়, হেমচন্দ্র-রঙ্গলালের কবিতায় দেশপ্রেমিকতার এক নতুন সুর ধ্বনিত হল। ক্রমশ রাজনৈতিক আলোড়নও শুরু হল। 'ছাত্র সমিতি', 'ভারতসভা', 'জাতীয় সম্মেলন' প্রভৃতি এই কাজে অগ্রণী হল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে ১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৮৮৪ সালে কংগ্রেসের জন্মের আগে পর্যন্ত এই পর্বটিতে ইংরেজ শাসন যেমন ভারতকে বাণিজ্য পুঁজির জায়গায় পুরোপুরি শিল্প পুঁজির ফাঁসে বাঁধতে লাগল, তেমনি তার সঙ্গে ভারতে নতুন নতুন সামাজিক শক্তিরও উদ্ভব হল এবং এই সামাজিক শক্তিগুলির প্রভাবে ক্রমশ অধিকতর শক্তিশালী এক বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারারও সূত্রপাত হল।

॥ গ্রন্থ-নির্দেশিকা ॥

(১) রজনীপাম দত্ত—আজিকার ভারত, ১ম ভাগ, পৃ: ১৫৯-৬০
(২) Romesh Dutt—The Economic History of India, In the Victorian Age, P. 124-25.
(৩) ঐ, পৃ: ৩৪৬
(৪) R. Choudhuri—The Evolution of Indian Industries, P. 129.
(৫) M. N. Roy—India in Transition, 1920 P. 21-22.
(৬) ঐ, ২১-২২।
(৭) ঐ, পৃ: ২৩
(৮) Calcutta Review—Education in Bengal, 1864, No. Lxxix.
(৯) রাজনারায়ণ বসু—সেকাল ও একাল, পৃ: ৬৪-৬৫

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

কৃষক সংগ্রাম
(১৮৫৭—১৮৮৪)

১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক জাতীয় অভ্যুত্থানটি ভারতের অপেক্ষাকৃত নিস্পন্দ জীবনে নব আলোড়ন সৃষ্টি করল। আপাতদৃষ্টিতে অভ্যুত্থানটি ব্যর্থ হয়ে গেলেও ভারতবাসীর সামনে এই বিদ্রোহটি নতুন আদর্শ স্থাপন করল।

এই বিদ্রোহের প্রভাবে ভারতের শ্রমজীবী জনসাধারণের মনে অধিকতর সাহস সঞ্চারিত হল। ১৮৫৭ সালের আগুন নিভতে না নিভতে বাঙলায় নীলচাষীরা বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করল।

সিপাহী বিদ্রোহের পরে একটানা কতগুলি কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় বৃটিশ শাসকেরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। সরকারের জনৈক শুভানুধ্যায়ী লিখলেন—

সিপাহী বিদ্রোহের পরেই বাঙলা দেশে প্রজা বিদ্রোহের এই হিড়িক পড়েছে, তাই সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আজ অনেক বেশী। (১)

আরও একজন ইংরেজ লেখক আতঙ্কিত হয়ে মন্তব্য করলেন—"বাঙলার কৃষকদের মধ্যে হঠাৎ এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।...... যে কৃষকদের আমরা 'হেলট' বা 'সার্ফ'দের সঙ্গে তুলনা করতাম, যাদের জমিদার ও প্ল্যানটারদের নিষ্ক্রিয় যন্ত্র বলে আমাদের ধারণা ছিল, তারাই আজ সজাগ হয়েছে। তাদের শৃঙ্খল থেকে তারা আজ মুক্তি পেতে চায়। নীলচাষের বিরুদ্ধে বাঙলা দেশে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে

গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।" সচেতনতার এই নতুন লক্ষণগুলিকে বিপদের সঙ্কেত বলে চিহ্নিত করে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন—ঘটনার গুরুত্ব আরো এই জন্যে যে ১৮৫৭ সালের ঠিক পরেই এই বিদ্রোহের আবির্ভাব হয়েছে। (২)

নীলচাষের বিরুদ্ধে এই সময়ে যে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার প্রধান কেন্দ্র ছিল বাঙলা।

নীল বিদ্রোহ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রপ্তানী কারবারে নীল ছিল একসময়ে প্রধান দ্রব্য। কিন্তু পরে কোম্পানী ইওরোপীয় বণিকদের হাতে নীলের ব্যবসা ছেড়ে দেয়।

এই সময়ে নীলের ব্যবসা ছিল খুবই লাভজনক। বস্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড় রঙ করার প্রয়োজনে ব্রিটেনে নীলের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। নীলকরেরা এদেশে নীলের চাষ করে সেই নীল বিলাতী পুঁজিপতি-দের সরবরাহ করত। এতে তারা প্রচুর মুনাফা লুঠত।

কিন্তু নীলচাষ ভারতের কৃষকদের জীবনে ঘোর দুর্দিন ডেকে আনল। নীলকরদের অত্যাচার ১৮১০ সালেই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঐ বছরে বাঙলা সরকার চারজন নীলকরের ব্যবসার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। (৩)

ঐ বছরে প্রচারিত একটি সার্কুলারে নীলকরদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নিম্নলিখিত অনাচারগুলির (৪) কথা উল্লেখ করা হয়েছে—

(১) যদিও আইনের ধারায় নরহত্যার পর্যায়ে পড়ে না তথাপি এমন কতগুলি নিষ্ঠুর পন্থা কুঠিয়ালেরা অবলম্বন করেন, যার ফলে রায়তেরা সময় সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(২) কুঠিয়ালদের নিজস্ব কয়েদখানায় রায়তদের বে-আইনীভাবে আটক রাখা হয়।

(৩) লাঠিয়াল নিয়োগ করে প্রজাদের ভয় দেখানো হয়।

(৪) 'শ্যামচাঁদ' নামে পরিচিত বেতের উপর চামড়া দিয়ে মোড়া এক রকম লাঠি দ্বারা প্রহার করা হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে ১৮১০ সাল থেকে যখন এই অত্যাচার চলছিল তখন নীল কৃষকেরা আগে বিদ্রোহ করেনি কেন?

১৮৫৯-৬০ সালেই নীলকৃষকেরা যে প্রথম নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তা নয়। এর পূর্বেও মাঝে মাঝেই নীলকর ও নীলচাষীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধত। তবে ১৮৫৯-৬০ সালে নীলচাষীদের প্রতিরোধ যেমন ব্যাপক ও চরম আকার ধারণ করেছিল ঠিক তেমনটি এর পূর্বে কখনও হয়নি।

১৮৫৯-৬০ সালে এই বিদ্রোহ কেন ব্যাপক আকার ধারণ করল তার কারণ নির্দেশ করেছেন তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট গভর্ণর নিজেই। (৫) তিনি লিখেছেন—এই সময়ে পূর্বদিনের অনাচারগুলো তো ছিলই। তার উপরে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত আর একটি সমস্যা এসে জুটল। এই সময়ে প্রত্যেকটি কৃষিজাত দ্রব্যের দাম দ্বিগুণ বা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। স্বভাবত নীল-চাষের খরচাও বাড়ল। অথচ রায়তেরা প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করার আগে নীলকরেরা নীল গাছের মূল্য বৃদ্ধির কথা একবার চিন্তাও করল না।

শুধু তাই নয়। নীল চাষের বাবদে যেটুকু অর্থ চাষীদের আইনত পাওনা হত সেটুকুও তাদের হাতে গিয়ে পৌঁছাত না। নীলকরদের নেতা লারমুর সাহেব যে হিসাব দিয়েছেন তার থেকে দেখা যায় যে ১৮৫৮-৫৯ সালে ২৩,২০০ জন নীলচাষীর মধ্যে মাত্র ২৪৪৮ জন চাষী নীলগাছের দরুণ কিছু অর্থ পেয়েছিল; বাকি সকলকেই দাদন হিসাবে যৎকিঞ্চিৎ যা পেয়েছিল তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। (৬)

উপরোক্ত প্রবঞ্চনার হাত থেকে নীলচাষীদের নিষ্কৃতি ছিল না কোনো মতেই। কারণ আইন ছিল কৃষকদের নাগালের বাইরে। আইনের মর্যাদা রক্ষার ভার যে সব সাহেব হাকিমদের উপর ন্যস্ত থাকত, তারা অধিকাংশই ছিল নীলকরদের সগোত্র ও বন্ধু। নীলকরেরা নিজেরাই আবার অনেক সময়ে অবৈতনিক (অনারারী) ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত থাকত। ফলে, আইন অধিকাংশ স্থলেই প্রহসনে পরিণত হত।

পাদ্রী লং নীল বিদ্রোহের নিম্নলিখিত কারণগুলি (৭) উল্লেখ করেছেন—(১) জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, (২) শ্রমের মূল্যবৃদ্ধি, (৩) আধুনিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী সঞ্জাত রাজনৈতিক উত্তেজনা, (৪) কৃষকদের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-দের সহানুভূতি।

আধুনিক রাজনৈতিক ঘটনা বলতে লং সাহেব বোধকরি ১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থানটির কথা বলেছেন। বস্তুত, ১৮৫৭ সালের ঘটনার প্রভাব নীলচাষীদের উপর যথেষ্ট পড়েছিল। (৮)

ইণ্ডিগো কমিশনের সম্মুখে যে সব চাষী সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদের জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে চাষীরা মনে করত যে নীলচাষ করার চেয়ে মরণ ভালো।

চাষীদের মুখে মুখে তাই ঘৃণাভরা আবেগে উচ্চারিত হত—

"জমীনের শত্রু নীল,
কর্মের শত্রু চিল,
(তেমনি) জাতের শত্রু পাদরী ছিল।" (৯)

কমিশনের কাছে প্রদত্ত জবানবন্দীতে একজনের পর একজন চাষী জানিয়ে দেয়—

"আমি মরব তবু নীল চাষ করব না।"

কমিশনের পক্ষ থেকে নীলচাষী দীনু মণ্ডলকে (১০) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল —নীলচাষ থেকে তোমার কি কিছুই লাভ হয় নি? উত্তরে দীনু বলে—না, একেবারেই না। সে শপথ করে বলল—নীলচাষ আর সে করবে না, তার গলা কেটে নিলেও না!

কমিশনের জনৈক সভ্য জিজ্ঞাসা করল দীনু মণ্ডলকে—তুমি কি তোমার দুঃখের কথা কারখানার বড় সাহেবকে জানিয়েছ? দীনু উত্তরে বলেছিল—

"আমি যদি বড় সাহেবের কাছে যাই তাহলে স্মিথ সাহেব রেগে ওঠেন, যদি স্মিথ সাহেবের কাছে যাই তবে দেওয়ান চটে যান, যদি দেওয়ানের কাছে যাই অমনি আমিন রাগ করেন, যদি আমিনের কাছে যাই তাহলে তাগিদগীর রাগ করেন, এবং এই ভাবেই আমাদের অভিযোগ জানাবার পর্বটি শেষ হয়।"

কমিশন ছাড়ার পাত্র নয়। তারা দীনু মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করল—কি শর্তে তুমি স্বেচ্ছায় নীল বুনতে রাজী, বলত? দীনু উত্তর দিল—টাকায় দু বাণ্ডিল দরে নয়, টাকায় এক বাণ্ডিল দরে নয়, এমন কি বিঘা প্রতি একশো টাকা দিলেও নয়। কমিশন বলল—কিন্তু বিঘায় একশো টাকা মানে তো চরম লাভ? এত টাকা পেলে নীল চাষ করতে তোমার আপত্তি কি?

দীনু—তবুও আমি নীল-চাষ করব না এই কারণে যে নীল-চাষ মৃত্যুযন্ত্রণার সামিল।

কমিশন—ধর এই অসুবিধা দূর করা হল, তোমাদের উপর অত্যাচার আর রইল না, তাহলে কি শর্তে নীল-চাষ করতে তুমি রাজী?

দীনু—লাভই হোক্, আর লোকসানই হোক্, আমি মরব তবু নীল-চাষ করব না!

কমিশন—ধর, আগের সমস্ত হিসাব বাতিল করে দেওয়া হল, তোমার মত ছাড়া তোমাকে এক কাঠাও জমি চাষ করতে হল না, তাহলে তোমার আপত্তি কি?

দীনু—তবুও আমার আপত্তি আছে। আমি কিছুতেই নীল-চাষ করব না। এই আমার প্রতিজ্ঞা।

কমিশন—ধর, তোমার জমিদার নীলকর সাহেব নয়, একজন দেশীয়—তাহলে কি শর্তে তুমি নীল-চাষ করবে?

দীনু—না, নীল-চাষ আমি করব না, কারুর জন্যেই না, কোন ক্রমেই না!

শুধু দীনু মণ্ডল নয়, একজনের পরে একজন চাষী কমিশনের মুখের ওপর তাদের ঘৃণাভরা প্রতিবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরেছিল সেদিন।

যশোর, নদীয়া, পাবনা প্রভৃতি যে সব জেলায় নীল-চাষ বেশি হত, সেই সব অঞ্চলেই বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। মরীয়া হয়ে চাষীরা শেষ পর্যন্ত নীলকুঠির উপর হামলা শুরু করে দিল। নীলকরদের মাল আদান প্রদান চাষীদের প্রতিরোধে বন্ধ হয়ে গেল। জমিতে নীল-গাছ নষ্ট করে দেওয়া হল। কোনো কোনো কুঠি পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হল। কুঠি লুণ্ঠনের সময়ে হিসাব পত্রের খাতা খুঁজে বার করা হল ও সেগুলি আগুনে নিক্ষেপ করা হল। (১১) বহু চাষী একযোগে এক জায়গায় সমবেত হতে থাকল। সশস্ত্র কৃষকেরা সরকারী অফিস, স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারি প্রভৃতির উপর আক্রমণ চালাল। তাদের অস্ত্র ছিল বর্শা, তরবারি, বাঁশের লাঠি আর ঢাল।

এই বিদ্রোহের নেতা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাষীরা নিজেরাই। নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়—বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। এই দুই ভাই পূর্বে কুঠিয়ালদের অধীনে দেওয়ানের কাজ করতেন। দরিদ্র প্রজাদের উপর কুঠিয়ালদের অকথ্য অত্যাচার তাঁরা স্বচক্ষে দেখতেন। নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁরা চাকরী থেকে ইস্তফা দেন। পরে এই দুই ভাই বিদ্রোহী কৃষকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত নীল-চাষীই এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। মালদহে নীল-চাষীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ফরাজী নেতা রফিক মণ্ডল।

নীল-চাষীদের প্রতি ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীরাও সমর্থন জানালেন।

যশোরে নীল-চাষীদের বন্ধু ছিলেন শিশির কুমার ঘোষ, তিনি যশোরের নীল-চাষীদের দুর্দ্দশার বাস্তব চিত্রটি কতকগুলি চিঠি মারফৎ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। (১২)

কলকাতায় নীল-চাষীদের প্রধান সমর্থক হয়ে উঠ্‌লেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার হরিশচন্দ্র মুখেপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "হিন্দু পেট্রিয়টে" একটি প্রবন্ধে লিখলেন—(১৩) "বাঙ্‌লা দেশ তার কৃষককুল সম্পর্কে গর্ববোধ করতে পারে,.........শক্তি নেই, অর্থ নেই, রাজনৈতিক জ্ঞান নেই, এমন কি নেতৃত্ব নেই, তবুও বাঙ্‌লার কৃষকেরা এমন একটি বিপ্লব সংগঠিত করতে পেরেছে যাকে অন্যদেশের বিপ্লবের থেকে কি ব্যাপকতায়, কি গুরুত্বে কোনোদিক থেকেই নিকৃষ্ট বলা চলে না।"

অবশ্য উপরোক্ত বুদ্ধিজীবীরা এই নীল-বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন মনে করলে ভুল হবে। তাঁরা নীলচাষীদের সংগ্রামে নিয়মতন্ত্রের পথে নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ইণ্ডিগো কমিশন (১৪) যখন জিজ্ঞাসা করল—কৃষকদের আপনি কি ধরনের উপদেশ দিয়ে থাকেন, তার উত্তরে তিনি বলেন—"আমি তাদের বে-আইনী কাজ করতে নিষেধ করি। আমি তাদের বলি তোমরা জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে তোমাদের অভিযোগের কথা জানাও, তাতেও ফল না হলে দেওয়ানী আদালতের শরণাপন্ন হও।"

ইণ্ডিগো কমিশনের কাছে হরিশচন্দ্র খোলাখুলি স্বীকার করলেন—নীল-চাষীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি বর্তমান এবং মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে তিনি তাদের সাহায্যে করে থাকেন।

তিনি বলেন যে চাষীদের পক্ষ থেকে মোকদ্দমা চালাবার জন্যে মোক্তার নিয়োগের কাজে তিনি সাহায্যে করে থাকেন। এই সময়ে এই কাজে তাঁর সাহায্য প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ এই সময়ে চাষীদের পক্ষে কোনো মোক্তারের সাহায্য পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। কোনো মোক্তার চাষীদের পক্ষ নিয়ে মামলা পরিচালনা করলেই তাঁকে কৃষকবিদ্রোহের সমর্থক বলে ঘোষণা করা হত। ফলে মোক্তারেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। যতীন

চ্যাটার্জী নামে দামুরহুদা সাব-ডিভিসনের জনৈক মোক্তারকে কৃষকদের পক্ষ অবলম্বন করায়—কৃষকদের তিনি প্ররোচনা দিয়েছেন এই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। (১৫)

নীলকরদের প্রতি দেশবাসীর ঘৃণা এতই আন্তরিক ও প্রবল হয়ে উঠেছিল যে ক্রমশ নাটকে, অভিনয়ে, গানে এই ঘৃণা প্রকাশ পেতে লাগল।

দীনবন্ধু মিত্র এই সময়ে 'নীল-দর্পণ' নামক বিখ্যাত নাটকটি লিখলেন। নাটকের লেখক সরকারী কর্মচারী হওয়ায় পুস্তকে তাঁর নাম উল্লেখ করা সম্ভব হল না। 'নীলদর্পণের' কাহিনী লোকমুখে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই পুস্তকখানি সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখলেন—

"কোনও গ্রন্থবিশেষ যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না। নীলদর্পণ কে লিখিল তাহা জানিতে পারা গেল না; কিন্তু বাড়ীতে বাড়ীতে 'ময়রাণী লো সই, নীল গেজেছে কই?' ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল।" (৪)

ক্রমশ বইখানির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হল। মাইকেল মধুসুদন দত্ত এই অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করলেন। কিন্তু তিনিও সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকায় বইখানির ইংরেজী সংস্করণের অনুবাদক হিসাবে পাদ্রী লংএর নাম প্রচারিত হল। নীলকরদের সম্বন্ধে দেশীয়দের মনোভাব ইংরেজ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনার উদ্দেশ্যেই লং এই ইংরেজী সংস্করণটি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হলেন।

নীলকর সাহেবেরা লং সাহেবকে তাঁদের ঘোর শত্রু বলে ঘোষণা করলেন। লং-এর বিরুদ্ধে তাঁরা মামলা দায়ের করলেন। নীলকরদের পক্ষপাতী জনৈক বিচারক লংকে এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন ও হাজার টাকার জরিমানার আদেশ দিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাকা নিজে বহন করলেন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও নীলকরেরা মামলা দায়ের করল। মোকদ্দমা দায়ের হবার পরেই হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হল।

ক্রমে ক্রমে লং ও হরিশ্চন্দ্রের নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। লং ও হরিশ্চন্দ্রের লাঞ্ছনা ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনেও প্রতিবাদের ঝড় তুলল। চাষী, মধ্যবিত্ত গলায় গলা মিলিয়ে গান ধরল—

"নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
কল্লে এবার ছারখার
অসময়ে হরিশ মোল
লংয়ের হল কারাগার
প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার"......

ইংরেজ শাসকেরা দেখল এই ব্যাপক বিক্ষোভের প্রতিকার না করলে ফল অত্যন্ত বিষময় হয়ে উঠবে। তাই শেষ পর্যন্ত তারা সরকারী কর্মচারী, প্ল্যাণ্টার ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জনৈক প্রতিনিধিকে নিয়ে একটি কমিশন গঠন করল। এই কমিশনের সাক্ষ্যগুলির মধ্যে দিয়ে নীল চাষ ব্যবস্থাটির অন্যায্যতা পরিস্ফুট হল।

এই বিদ্রোহ নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে জনগণকে এতই সচেতন করে তুলল যে বিদেশী শাসকদের একাংশের ইচ্ছা না থাকলেও জাগ্রত জনমতের চাপে নীল চাষের ব্যবস্থাটিকে নিন্দা করা ছাড়া তাদের উপায় রইল না। শেষে বহু নিন্দিত এই ব্যবস্থাটি আস্তে আস্তে বাঙলার বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

নীলকর ছাড়া বাঙলার কৃষকদের আর একটি প্রধান শত্রু ছিল জমিদার।

জমিদারী অত্যাচারের মূলে ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পদার্থটিকে এককভাবে দেখলে ভুল হবে। ইংরেজ শাসনে ভারতে যে নতুন অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হল তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। (১৬)

ইংরেজ শাসনের আগে যে গ্রাম সমাজের অস্তিত্ব ছিল তাতে জমি নিয়ে কেনা বেচার রেওয়াজ ছিল না। কাজেই জমির হাত বদলেরও ভয় ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের পর থেকে জমি পণ্য হিসাবে গণ্য হল এবং জমির কেনা বেচা আরম্ভ হল।

তাছাড়া, ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নগদ টাকায় রাজস্ব দানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করল। কৃষকেরা মুদ্রায় রাজস্ব দানের কাজে ছিল অনভ্যস্ত। মুদ্রায় রাজস্ব পরিশোধ করার জন্যে তারা মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিতে শিখল। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমি বন্ধক দিয়ে এই অর্থ সংগ্রহ করত। ইংরেজ-সৃষ্ট নতুন

আইন ও আদালত ঋণের অনাদায়ে মহাজনদের কৃষকের জমি আত্মসাৎ করার অধিকার দিল। ফলে জমি হস্তান্তর হতে লাগল। কৃষক জমি হারাল, মহাজন জমিদার হল।

ইংরেজ শাসনের দয়ায় গ্রাম্য অর্থনীতিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষিত হল। কুটীর শিল্পগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে কৃষকেরা শিল্পজাত পণ্যাদি বাজার থেকে কিনতে বাধ্য হল। তার জন্যে তাদের হাতে মুদ্রা-সঞ্চয়ের প্রয়োজন দেখা দিল। এই মুদ্রা-সঞ্চয়ের প্রয়োজনে কৃষকেরা বেশি বেশি বাণিজ্যিক ফসল অর্থাৎ তুলা, পাট, তৈল বীজ প্রভৃতির উৎপাদনে মন দিল। ব্যবসায়ী দালালেরা এই উৎপন্ন শস্য কিনতে থাকল এবং মধ্য প্রদেশে ও ভারতের বাইরেও চালান দিতে লাগল। ক্রমশ ভারতের কৃষক বিশ্ব বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ল। যতই অর্থকরী শস্য উৎপাদন ও বিশ্ব বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়তে লাগল ততই গ্রামাঞ্চলে মুদ্রা অর্থনীতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল।

এইভাবে ইংরেজ আমলে আস্তে আস্তে ভারত নতুন ধরনের এক অর্থ-নীতির ফাঁসে বাঁধা পড়ল। ভারতের গ্রামাঞ্চলের লোকদের কাছে প্রাচীন গ্রাম সমাজের অর্থনীতি ছিল সুপরিচিত। কিন্তু এখন থেকে কৃষকেরা অপরিচিত দুর্জ্ঞেয় নানান শক্তির দাস হয়ে পড়ল।

এই নতুন অবস্থায় ইংরেজ শাসনের প্রয়োজন মেটাতে পারে এমনি ধরনের একদল গ্রাম্য অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টির প্রয়োজন হল। সেই প্রয়োজন মেটাতে চির স্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি। এই বন্দোবস্তের কল্যাণে জমির বাজারমূল্য বেড়ে গেল। জমিতে অর্থ নিয়োগ করা সম্মান ও প্রতিপত্তির মাপকাঠি হয়ে উঠতে থাকল। যে অনুপাতে জমিদারদের প্রতিপত্তি বাড়তে লাগল ঠিক সেই অনুপাতে কৃষকদের উপর জমিদারদের জুলুম করার ক্ষমতাও বেড়ে চলল। ইংরেজদের আইন ও আদালত কৃষকদের উপর জুলুম করার অধিকার তাদের অর্পণ করল।

একদিকে গ্রামাঞ্চলে মুদ্রা অর্থনীতির প্রবেশ, আর একদিকে জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার—বাঙলার গ্রাম্য অর্থনীতিতে গভীর সংকট সৃষ্টি করল।

১৮৫৯ সালে কৃষকদের উপর অত্যাচারের প্রশ্নটি এতই জরুরী হয়ে উঠল যে সরকার 'সপ্তম' ও 'পঞ্চম' আইন রহিত করতে মনস্থ করলেন। কৃষকদের 'রক্ষা' করার উদ্দেশ্যে 'দশম আইন' নামে একটি আইনও প্রবর্তন করা হল। এই

আইন প্রবর্তনের পরে অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরের কথা অবস্থা আরও খারাপ হতে আরম্ভ করল। এই আইনে কৃষকদের উন্নতি হল না কেন তার কারণ নির্দেশ করে জনৈক সমসাময়িক লেখক মন্তব্য করলেন—যতদিন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে ততদিন "শত শত আইন পাশ করলেও কোনই উপকার হবে না।" (১৭)

সত্যিই এই আইন পাশ হবার পরে চাষীদের দুর্দশার লাঘব হল না। বরং আইনটি উপলক্ষ করে জমিদারেরা একযোগে সর্বত্রই জমির খাজনা বাড়িয়ে নিতে সচেষ্ট হল।

এতকাল জমিদারেরা নিশ্চিন্ত ছিল এই ভেবে যে তাদের ইচ্ছামত যে-কোনো সময়ে তারা জমির খাজনা চড়া হারে ধার্য করতে পারবে। এখন তাদের ভয় হল নতুন আইন অনুসারে কৃষকদের হয়তো জমির উপর দখলী স্বত্ব সাব্যস্ত হবে। তখন তাদের (জমিদারদের) এখনকার মত খাজনা বৃদ্ধি করার অধিকার থাকবে না।

এই আশঙ্কার বশবর্তী হয়ে ১৮৬০ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে বাঙলার সর্বত্র জমিদারেরা নিজেদের খুশিমত খাজনা বাড়াতে আরম্ভ করে। আদালতগুলো খাজনা বৃদ্ধির মোকদ্দমায় ভরে যায়। কোনো কোনো জমিদারীতে খাজনার পরিমাণ দাঁড়াল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নির্দিষ্ট সরকারী অংশের পরিমাণের ১০, ১৫, ৬০, এমন কি ১২০ গুণ। (১৮)

শুধু খাজনা বাড়িয়েই যে জমিদারেরা খুশি হল তা নয়, তার সঙ্গে বে-আইনী কর বা আবয়ার আদায়ের মাত্রাও বেড়ে চলল।

জনৈক সমসাময়িক অনুসন্ধানকারী এই বে-আইনী জুলুমের একটা হিসাব দিয়েছেন। (১৯)

এই বে-আইনী জুলুমগুলি নিম্নরূপ :

(১) ইস্কুল খরচা—জমিদার সরকারী স্কুলে সাহায্য হিসাবে যে টাকা দান করতেন সেই টাকা প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা হত।

(২) তার খরচা—টেলিগ্রাফের জন্যে প্রজাদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত কর—অথচ জমিদারেরা এই বাবদ সরকারকে কোনো টাকা দিত না।

(৩) বারুণী খরচা—জাজিপুরের উৎসবে যেতে জমিদারের যে খরচা পড়ত তার জন্যে প্রজাদের উপর ধার্য কর।

(৪) রসদ খরচা—ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে উপঢৌকন পাঠাতে জমিদারের যে টাকা খরচ হত তা প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা হত।

(৫) বড় মহাপ্রসাদ—জমিদার যখন পুরী থেকে ফিরে আসতেন তখন তিনি জগন্নাথের প্রসাদ আনতেন। তা প্রজাদের মধ্যে বিলি করা হত এবং তার মূল্য বাবদ প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হত।

২৪ পরগণা জেলায় জমিদারেরা যে-সব বে-আইনী কর আদায় করত তারও একটা হিসাব নিয়ে দেওয়া হল—

(১) ডাক খরচা—জমিদারদের যে ডাক-কর দিতে হত তাও প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা হত।

(২) ভিক্ষা—যখন পাওনাদারের কাছে জমিদারের অনেক টাকা বাকি পড়ত তখন এই ঋণ পরিশোধের জন্যে প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হত।

(৩) পার্বনী—জমিদার-বাড়িতে ধর্মানুষ্ঠানের খরচা আদায়ের জন্যে ধার্য কর।

(৪) তহুরী—বছরের শেষে প্রজাদের সালতামামির সময়ে যে কর ধার্য হত।

(৫) বিবাহ কর—প্রজাদের বাড়িতে বিয়ে হলে জমিদারদের কর দিতে হত।

(৬) পুলিশ খরচা—পুলিশ অফিসারেরা জমিদারীতে কোনো অপরাধ অনুসন্ধান করতে এলে তাদের জন্যে যে খরচা হত সে খরচাও প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা হত।

(৭) রথ খরচা—রথের সময় ধার্য কর।

(৮) বরদারী খরচা—জমি লীজ নেবার সময়ে কৃষকদের এই কর দিতে হত।

(৯) আয় কর—জমিদারেররা সরকারের কাছে যে আয়কর দিত সেই করের খরচা প্রজাদের কাছ থেকে কোনো কোনো জমিদার আদায় করত।

(১০) তাঁত কর—তাঁতীদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত কর।

(১১) ধাই কর—ধাইদের উপর ধার্য কর।

(১২) মাথুর—নাপিতদের উপর ধার্য কর।

(১৩) সন্তন জমা—চর্মকারদের উপর ধার্য কর।

(১৪) বন সেলামী—গুড় ব্যবসায়ীদের উপর ধার্য কর।

(১৫) অঙ্কুরা সেলামী—লবণের চোরাকারবারীদের উপর ধার্য কর।

(১৬) বিনা বেতনে পরিশ্রম—প্রজাদের দিয়ে বিনা বেতনে অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া হত।

(১৭) জমিদারের বাড়িতে ভোজের ব্যবস্থা হলে বিনামূল্যে চাল, মাছ ও অন্যান্য জিনিস আদায় করা হত।

(১৮) জরিমানা—জমিদার যখন প্রজাদের মধ্যে ছোট খাটো বিবাদ মীমাংসা করে দিত তখন তাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হত।

(১৯) সেলামী—প্রজা বাড়ি বদল করলে অথবা লীজ বা কোনো চুক্তি সম্পাদন করলে এই কর দিতে হত।

(২০) খারিজ দাখিল—জমিদারের খাতায় নাম তুলতে হলে এই কর দিতে হত।

(২১) নজরানা—জমিদার যখন জমিদারীতে খাজনা অদায়ের জন্যে বেরুতেন তখন প্রজাদের উপঢৌকন দিতে হত।

কৃষকদের উপর অত্যাচারের এই বিভীষিকা—বাঙলার গ্রামগুলিকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। ইংরেজের ছত্রছায়ায় দাঁড়িয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিলাসী জমিদার সারা বাঙলায় গ্রামজীবনের উপর তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যেতে লাগল।

জনৈক লেখক এই জমিদারী জুলুমের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি নিচের হিসাবটি দিয়েছেন—

"আমরা যদি জমিদারদের জোর করে আদায়ীকৃত অর্থ সরকারের নির্দিষ্ট খাজনার ১৪ গুণ বলে ধরি, তাহলে দেখা যাবে যে জমিদারেরা প্রজাদের কাছ থেকে বছরে ৫১,১২,১৭,৭০০ টাকা খাজনা হিসাবে আদায় করে। এই হিসাবের সঙ্গে বে-আইনী কর থেকে সংগৃহীত টাকা যোগ দিলে আরও ১০ কোটি টাকা বাড়বে। অর্থাৎ মোট ৬১ কোটি টাকা একদল কুঁড়ে লোক শ্রমজীবী জনসাধারণের কাছ থেকে প্রতি বছর কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।" তিনি আরও লিখলেন—সরকার সারা ব্রিটিশ ভারত থেকে সমস্ত খাতে যে টাকা আদায় করে, জমিদারদের আদায়ীকৃত অর্থ তার চেয়েও অনেক বেশি।" (২০)

এইভাবেই রক্তচোষা ব্রিটিশের হাত ধরে রক্তচোষা জমিদারেরা কৃষকের রক্ত মোক্ষণ করতে আরম্ভ করেছিল।

বলাই বাহুল্য, এই ধরণের ব্যাপক জুলুমের ফলে কৃষকেরা অনেক সময়ে মরীয়া হয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত, কখনও কখনও সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করত।

কি অবস্থায় কৃষকেরা আইনভঙ্গ করে জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হত তা বোঝার সুবিধার জন্যে নিচে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হল।

একজন রায়ত তাঁর জবানবন্দীতে বলছেন—"আমাদের আগের জমিদার মারা গেলেন। তাঁর ছেলে, ইনি কিছুটা ইংরেজী জানতেন এবং মদ খেতেন, জমিদার হলেন। তাঁর বাবার আমলে যে খাজনা ধার্য ছিল তিনি তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি আমাদের খাজনা যা ছিল তার দেড়গুণ ধার্য করলেন, তাছাড়া বে-আইনী করও পূর্বের মত ধার্য রইল। গ্রামে দারুণ হাঙ্গামা দেখা দিল। রায়তেরা আমীনদের আক্রমণ করল। কর্তৃপক্ষ খবর পেল; ৪০ জন বরকন্দাজ হাতীর পিঠে চড়ে এসে উপস্থিত হল। তারা গ্রামের ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে দিল, গ্রামের সকলের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করল, প্রধান প্রধান কৃষক নেতাদের জমিদারের কাছারীতে আটক করে রাখা হল।" (২১)

আর একটি হাঙ্গামার কাহিনী নিম্নরূপ—"একটি গ্রামে জমিদারীর হাত বদল হল। নতুন জমিদার খাজনার হার বাড়িয়ে দিল। কিন্তু গ্রামের মোড়ল প্রতিবাদ করল এবং চাষীরা তার পাশে এসে দাঁড়াল। জমিদারের লোকেরা মোড়লকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। মোড়লের সাথীরা চট করে এগিয়ে গিয়ে বন্দুক ছিনিয়ে নিল এবং জমিদারের লোকদের উপর চড়াও হল। তখন জমিদারের লোকেরা ভয়ে এদিক ওদিক ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।" (২২)

উপরোক্ত কাহিনী দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই রকম ভাবেই খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাঙলার প্রায় সকল জেলাতেই কৃষকেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, কোথাও বেশি, কোথাও বা কম।

বে-আইনী করের প্রতিবাদেও কৃষকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করত অনেক সময়। এখানে একটা কাহিনী উল্লেখ করা হচ্ছে—

ফরিদপুর জেলার জনৈক জমিদার মুসলমান ফরাজী প্রজাদের কাছ থেকে নানা রকমের বে-আইনী কর আদায় করত। একবার এই ব্যক্তিটি নিজের জামাইয়ের ভরণপোষণের জন্যে প্রজাদের কাছ থেকে একধরণের কর

আদায় করতে থাকে। স্থানীয় কৃষকেরা এই বে-আইনী করটির নাম দিয়েছিল 'জামাই খরচা'। ফরাজী প্রজারা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একযোগে বিদ্রোহ করল এবং জমিদারকে হত্যা করল। ফরিদপুরের আদালতে বিচারে হত্যাকারী কৃষকের ফাঁসীর হুকুম হল এবং অপর ৪ জন কৃষককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। কিন্তু হাইকোর্টে আবেদন করার পর আসামীদের একেবারে খালাস করে দেওয়া হল। বলাই বাহুল্য, ঘটনাটি স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল।

ফরিদপুরে, মালদহে, বগুড়ায়, পাবনায়—পূর্ববঙ্গের বহু জায়গাতেই কৃষকদের মধ্যে অভূতপূর্ব এক আলোড়ন আরম্ভ হল। পাবনায় ত পুরোদস্তর একটি কৃষক বিদ্রোহের পদধ্বনি শোনা গেল।

পাবনার কৃষক বিদ্রোহ

এই বিদ্রোহটির (১৮৭২-৭৩) কারণ উল্লেখ করে সেকালের একটি সংবাদপত্র লিখল—"পাবনা, বগুড়া ও অন্যান্য স্থানে নতুন জমিদারেরা শুধু যে খাজনা বৃদ্ধি ও বে-আইনী কর বৃদ্ধি করতে থাকল তাই নয়, এমন কি, কৃষকদের ঠকিয়ে কতকগুলি চুক্তি সম্পাদনের জন্যে রেজেষ্ট্রি অফিস ও মুনসেফের আদালতটি পর্যন্ত তারা ব্যবহার করতে থাকল। এই চুক্তিগুলির উদ্দেশ্য ছিল—পুরানো দিনের সমস্ত বে-আইনী কর ও ভবিষ্যতের সমস্ত ট্যাক্স খাজনার অংশ হিসাবে দেখানো।"

খাজনা বৃদ্ধি, আবয়াব বৃদ্ধি আর জমিদারী জুলুম—এই তিনের বিরুদ্ধেই এই বিদ্রোহ। যেখানে জমির খাজনা ছিল ১ টাকা সেখানে জমিদারেরা ২টাকা খাজনা ধার্য করল। জোর করে রায়তদের কাছ থেকে ২ টাকা করে খাজনা দেব এই মর্মে কবুলিয়ত সই করে নেওয়া হল। এই কবুলিয়তগুলিতে রায়তদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়া হল যে ভবিষ্যতে জমিদারেরা যদি নতুন কর ধার্য করে তাহলে তারা তাও মেনে নেবে। এই কবুলিয়তগুলিতে আরও লেখা থাকল রায়তেরা যদি ঝগড়া করে তাহলে জমি থেকে প্রজাদের উচ্ছেদ করার অধিকার জমিদারের থাকবে। (২৫)

রায়তেরা সবাই যে মুখ বুজে এই জুলুম সহ্য করল তা নয়। অনেক প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে স্থানীয় আদালতে মামলা দায়ের করল। একটি মোকদ্দমার বিবরণী থেকে জানা যায় যে জমিদার খাজনা হিসাবে দাবি করে ৫৷৵০ কিন্তু

আদালত ডিগ্রী দেয় ২॥০। এই মোকদ্দমার খবর গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। ক্রমশ অনেকগুলি গ্রামের মানুষ একযোগে জমিদারী জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার শপথ গ্রহণ করল। কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ক্রমশ একটি ব্যাপক বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করল। প্রায় ২৪০টি গ্রাম এই বিদ্রোহে যোগ দিল। বিদ্রোহীরা বাড়তি হারে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিল। তাদের কাছ থেকে জোর করে জমিদারেরা যে কবুলিয়ত আদায় করেছিল সেগুলি তারা আগুনে নিক্ষেপ করল। (২৬)

হিন্দু কৃষক ও মুসলমান কৃষক উভয়েই এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। কৃষকেরা ঈশান রায় নামে জনৈক কৃষক নেতাকে তাদের রাজা বলে ঘোষণা করল। ঈশান রায়কে তারা বলত 'বিদ্রোহী রাজা'। (২৭)

বিদ্রোহী কৃষকেরা দাবি করল—জমিদারদের উচ্ছেদ করতে হবে, আমাদের মহারাণীর খাস প্রজা হিসাবে গণ্য করতে হবে।

পাবনার কৃষক বিদ্রোহ শাসক মহলে দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি করল। 'এডমিনিস্ট্রেশান রিপোর্ট অব বেঙ্গলে' এই বিদ্রোহটিকে সহিংস ও ভয়ঙ্কর একটি সংঘর্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সমসাময়িক দেশীয় পত্রিকাগুলি সপ্রশংস ভঙ্গীতে উল্লেখ করেছেন—পূর্ব-বঙ্গের কৃষকদের মধ্যে অপূর্ব সংঘশক্তির প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। ঐ সংবাদপত্র গুলি থেকে আরও জানা যায় যে কৃষকেরা জমিদারদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করত তাকে বলা হত 'ধর্মঘট'। (২৮)

কৃষকদের নেতৃত্বে জায়গায় জায়গায় 'বিদ্রোহী সমিতি'ও গড়ে উঠেছিল। (২৯)

ওয়াহবী আন্দোলন

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরে ওয়াহবী আন্দোলন পুনর্বার আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়ে আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল মালদহ ও রাজমহল।

সরকারী অনুসন্ধানকারীরা আবিষ্কার করলেন—১৮৬৩ সালে পূর্ব ও উত্তর বাঙলায় এক ব্যাপক ওয়াহবী 'ষড়যন্ত্রের' প্রস্তুতি চলছিল। 'ষড়যন্ত্রের' কথা বাদ দিলেও ওয়াহবী নেতাদের প্রভাবে মুসলমান কৃষকেরা যে দলে দলে নীলবিদ্রোহে এবং তার পরবর্তী জমিদারবিরোধী সংগ্রামগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে

যোগ দিয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৮৬৮-৬৯ সালে উত্তরবঙ্গে বহু ওয়াহবী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মালদহ, রাজমহল ও পাটনায় তাদের বিচার আরম্ভ হয়। মালদহ ও রাজমহলের বিচারে যথাক্রমে মালদহের আমীরুদ্দীনকে ও ইসলামপুরের ইব্রাহিম মণ্ডলকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত করা হয়, এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। (৩০)

১৮৭১ সালে জেলা আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে ওয়াহবীরা কলকাতা হাইকোর্টের কাছে আপীল করে। এই ঘটনাটি উপলক্ষ করে কলকাতায় ওয়াহবী সমর্থকদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয়। এই উত্তেজনার মুখে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে টাউন হলের সামনে আবদুল্লা নামে জনৈক ৪৫ বছর বয়স্ক ওয়াহবী কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে খুন করে।

এই ঘটনাটি ইংরেজ শাসকদের শশঙ্কিত করে তোলে। গ্রামাঞ্চলে ওয়াহবীদের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্যে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

কেবলমাত্র বাঙলা দেশেই যে এই ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল তা নয়। সাঁওতাল পরগণায় ও মানভূমেও সাঁওতালেরা এই সময়ে পুনর্বার বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে (১৮৬৯-৭০)। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতেও এক ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৫) দেখা দেয় এবং এই বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্যে "ডেকান রায়ট্স কমিশন" (Deccan Riots Commission) নিযুক্ত হয়। আরও দক্ষিণে মোপলারাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে (১৮৭৩-৮০) মোপলা বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্যেও সরকার একটি কমিশন নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়।

১৮৫৭ সালের পরে এইভাবেই নতুন করে কৃষক বিদ্রোহের তরঙ্গে সারা ভারত আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল।

মধ্যবিত্তের সমর্থন

নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেভাবে সমর্থন জানায়, ততটা না হলেও বুদ্ধিজীবীরা জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম-গুলির প্রতিও সহানুভূতি জানিয়েছিল। এই সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কঠোর সমালোচনা আরম্ভ হয়। পাবনার কৃষক বিদ্রোহের খবর

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং বিদ্রোহী কৃষকদের প্রতি সমর্থনসূচক প্রবন্ধও লিখিত হয়। 'সাধারণী' মন্তব্য করে—কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী তাদের মনে আনন্দ এনে দিয়েছে, তাদের সমস্ত শরীর পুলকিত হয়ে উঠেছে। (৩১)

আর একজন কৃষক দরদী বুদ্ধিজীবী লিখেছেন—কৃষক বিদ্রোহগুলিকে যে যে-চোখেই দেখুক না কেন আমরা মনে করি এইগুলির মধ্যে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। আমরা তাকিয়ে আছি সেই দিনের জন্যে যখন কৃষকেরা আর জমিদারের ক্রীতদাস হয়ে রইবে না, যখন তারা হয়ে উঠ্‌বে—খাদ্যরসে পরিপুষ্ট, সুখী এবং সন্তুষ্ট কৃষক ভূস্বামী। (৩২)

এই লেখক সীমাবদ্ধ ক্ষতিপূরণ সহ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদেরও দাবি উত্থাপন করেছেন। (৩৩)

জমিদারী অত্যাচার ও কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে এই সময়ে মীর মশারফ হোসেন 'জমীদার দর্পণ' নামে যে নাটকখানি রচনা করেন তাও প্রমাণ করল কৃষকদের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের সহানুভূতি কত গভীর ও কত আন্তরিক।

এই সমস্ত দেখেশুনে জনৈক ইংরেজ সাংবাদিক সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে বললেন—ক্ষুধার তাড়না থেকেই ঘটেছিল ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লব ....সত্য বটে ভারতের লোকেরা ফরাসীদের চেয়ে অনেক বেশি সহনশীল, অনেক বেশি দাস্য-ভাব-সম্পন্ন। কিন্তু ক্ষুধার তাড়না ভারতেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে। বর্তমান ঘটনাবলী দেখে শুনে মনে হয়—ভারতেও বহু-বিস্তৃত বিদ্রোহের একটি লগ্ন অচিরে দেখা দেবে না—একথা জোর করে বলা যায় না। (৩৪)

শুধু ইংরেজ সাংবাদিক কেন, ইংরেজ-সিভিলিয়ানেরাও অনাগত বিপদের আশঙ্কায় দিন গুনতে আরম্ভ করলেন। এ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম ('কংগ্রেসের পিতা' নামে যিনি খ্যাতিলাভ করেন) তাঁর সরকারী কাজের অভিজ্ঞতা থেকে অনুরূপ বিপদ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন। তিনি বস্তা বস্তা গুপ্ত পুলিস রিপোর্টের ফাইল দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে সারা দেশে গণ-বিক্ষোভ বর্তমান এবং এই বিক্ষোভ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গুপ্ত সংগঠনেরও আবির্ভাব ঘটছে সারা দেশে। (৩৫)

ঘটনার গতি দেখে ইংরেজ শাসকদের সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কঠোর দমন-নীতির সাহায্যে এই বিপদ নির্মূল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

১৮৭৮ সালে একটি আইনের সাহায্যে মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা হল। নীল-বিদ্রোহ ও কৃষক বিদ্রোহে তাদের সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্যেই বোধ হয় এই সংবাদপত্রগুলির উপর ইংরেজের রাগ বর্ষিত হয়েছিল। উপরোক্ত প্রেস আইনের প্রতিবাদে 'সোমপ্রকাশ' 'নববিভাকর' ও 'সাধারণীর' প্রকাশ বন্ধ রাখা হল। অমৃতবাজার পত্রিকাটিকে সময়ক্ষেপ না করে ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত করা হল।

আন্দোলনের ধারাতে ভীত হয়ে এদেশের ইংরেজগণ 'দ্বিতীয় মিউটিনি' বা ব্যাপক আর একটি বিদ্রোহের আতঙ্কে দিন গুণতে লাগলেন। লর্ড লিটন তাড়াতাড়ি 'অস্ত্র আইন' (১৮৭৯) পাশ করে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র-শস্ত্র রাখা ভারতবাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ করলেন। ভারত-সভা 'প্রেস আইন' ও 'অস্ত্র আইনে'র প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করল।

এই দমন নীতির পাশাপাশি তোষণ-নীতিরও মহড়া চলল। কৃষকদের বিক্ষোভ কথঞ্চিৎ শান্ত করার জন্যে প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৮৫) পাশ করা হল। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যে 'কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠায় হিউম সাহেব (বড়লাট ডাফরিণের আশীর্বাদ মাথায় বহন করে) উদ্যোগী হলেন।

সম্ভাব্য 'দ্বিতীয় মিউটিনি'র বিপদ থেকে ইংরেজরা বহুকষ্টে আত্মরক্ষা করলেন। কিন্তু তাও বেশি দিনের জন্যে নয়। মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই যে কংগ্রেস শিশুটিকে হিউম লালন-পালন করার দায়িত্ব নিলেন সেই শিশুটিই বেয়াড়া-পনা আরম্ভ করল।

ইংরেজ শাসকদের চোখের নিদ্রা কেড়ে নিতে ভারতবাসী বেশি বিলম্ব করল না। দ্বিতীয় মিউটিনি আর ঘটল না ঠিকই। কিন্তু তার চেয়েও উজ্জ্বলতর সম্ভাবনা নিয়ে বাঙলা তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলন নবরূপে রূপায়িত হয়ে উঠল।

সপ্তম অধ্যায়

গ্রন্থ নির্দেশিকা

১) "The Ryot in Bengal"—Calcutta Review, 1860.

(২) "Indigo Blue Book"—Calcutta Review, 1860.

(৩) প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া, পৃঃ ২৮

(৪) ঐ, পৃঃ ২৮-২৯

(৫) Minute of the Lieutenant Governor of Bengal on the Report of the Indigo Commission.

(৬) ঐ

(৭) Lalit Chandra Mitra—History of Indigo Disturbance in Bengal with a full Report of the Neel Darpan case. P. 23

(৮) ঐ

(৯) ইণ্ডিগো কমিশন রিপোর্ট উদ্ধৃত।

(১০) ইণ্ডিগো কমিশন রিপোর্ট—দীনু মণ্ডলের সাক্ষ্য।

(১১) Lalit Chandra Mitra—History of Indigo Disturbance in Bengal, P. 37

(১২) Jogesh Chandra Bagal—Peasant Revolution in Bengal—এই গ্রন্থে উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত হয়েছে।

(১৩) ঐ, পরিশিষ্ট—Harish Chandra Mukherjee—The Indigo Question, P. 48-50

(১৪) Indigo Commission Report—হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য।

(১৫) ঐ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যে উল্লেখিত।

(১৬) Surendra J. Patel—Agricultural Labourers in Modern India and Pakistan, P. 48-56.

(১৭) Abhoy Chandra Das—The Indian Ryot, P. 282.
(১৮) ঐ, পৃঃ ২৮২-৮৪
(১৯) ,, পৃঃ ২৪২, ২৫২-৫৩
(২০) ,, পৃঃ ২৪২
(২১) ,, পৃঃ ১৬২
(২২) ,, পৃঃ ১৬৩-৬৪
(২৩) ,, পৃঃ ২৬৭-৬৮
(২৪) ,, পৃঃ ৫৫৭, 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' থেকে উদ্ধৃত।
(২৫) ,, পৃঃ ৫৫৯-৬০, 'ইণ্ডিয়ান মিরর' থেকে উদ্ধৃত।
(২৬) Sunil Sen—Peasant Struggle in Pabna (1872-73).
—"New Age." Feb , 1954.
(২৭) ঐ
(২৮) Bholanath Chandra—The Life of Digambar Mitra,P. 74-75.
(২৯) O'malley—History of Bihar, Bengal and Orissa. P. 727.
(৩০) Bukland—Bengal Under the Lieutenant Governors—P. 432-34.
(৩১) Sunil Sen—Peasant Struggle in Pabna, 'New Age,' Feb. 1956.
(৩২) Abhoy Charan Das—The Indian Ryot, P. 554.
(৩৩) ঐ, পৃঃ ৬৪০, ৬৫১, ৬৫৫
(৩৪) "The Friend of India & Statesman," March 8, 1878.
(৩৫) R. P. Dutt—India To-day, P. 258.

অষ্টম অধ্যায়

জাতীয়তাবাদী ভাবধারার ক্রমবিকাশ
১৮৫৭-১৮৮৪

রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, মাইকেল প্রভৃতির চিন্তাধারার মাধ্যমে কিভাবে এক বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সূত্রপাত হয় তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থানের পরবর্তী যুগে এই জাতীয়তাবাদী ধারা আরও বলিষ্ঠতা লাভ করে।

১৮৫৭ সালের পরে ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলে। আগের যুগে ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত সরকারী চাকুরী ও শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থাকত। এখন থেকে ইংরেজী শিক্ষিতেরা ডাক্তার, মোক্তার, উকীল, প্রভৃতি স্বাধীন পেশাতেও আত্মনিয়োগ করল। ক্রমশ এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে কিছু অর্থও সঞ্চিত হতে থাকল। এই অর্থ শিল্পে নিয়োগের ইচ্ছা বলবৎ হল। কিন্তু বিদেশী শাসন এ-দেশে-ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের পথটি বন্ধ করে দেওয়ায় দুএকজন ভাগ্যবান ছাড়া আর কারুর শিল্পে পুঁজিনিয়োগের সুযোগ মিলল না।

এই ত গেল ইংরেজী শিক্ষিতের মধ্যে যারা অর্থবান তাদের অবস্থা।

অপরদিকে, ১৮৫৭ সালের পরে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল বটে, কিন্তু সেই অনুপাতে চাকরীর সুযোগ মিলল না। এই অবস্থাটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত গরীব অংশের মধ্যে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি করল।

নতুন অবস্থায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামনে কতকগুলি নতুন সমস্যারও উদ্ভব হল। এই সমস্যাগুলি নিম্নরূপ—

(১) বিদেশী শাসনের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরোধ যতই ঘনীভূত হতে লাগল, ততই এই শ্রেণীটি বিক্ষোভ প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজতে থাকল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকতর সাহসী কণ্ঠস্বর শোনা গেল। একটি বলিষ্ঠ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল।

(২) জনসাধারণের সঙ্গে অর্থাৎ কৃষক সমাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হল। আগের যুগে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগের যে অভাব ছিল, এই যুগের ইংরেজী শিক্ষিতেরা তা কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পক্ষ থেকে গণসংযোগ প্রতিষ্ঠার এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা—হাজার সীমাবদ্ধতা সত্তেও একটি নতুন ঘটনা।

(৩) এই সময়ে সর্বপ্রথম হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের গুরুত্বও শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা উপলব্ধি করল। তবে উপলব্ধিতে এলেও কার্যক্ষেত্রে এই কাজটি বেশি দূর অগ্রসর হয়েছিল বলা চলে না।

ভাবধারার দিক থেকে এই বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহী ও রামমোহন-ইয়ং বেঙ্গলের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লবের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তাঁদের লেখায় ছত্রে ছত্রে প্রকাশমান। কিন্তু রামমোহন-ইয়ং বেঙ্গলের ভাবধারা থেকে তাঁদের ভাবধারা পরিবর্তনের একটি সুরও লক্ষিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দাঁড়িয়ে তাঁরা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি বড় বড় দেশে সমরলিপ্সা ও সাম্রাজ্যলিপ্সার যে তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করলেন তাতে তাঁদের মন বিষিয়ে উঠল।

তাছাড়া, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে ইংরেজের নিষ্ঠুর-বর্বরতা (মাত্র তিন মাসে ৬ হাজার ভারতবাসীকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল) ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। ব্রিটিশ শাসনের 'সভ্যতা বিকীরণকারী' ভূমিকাটির (civilising role) মুখোস এই সময়ে একেবারে খুলে পড়ল। ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে আগে যে মোহাবেশ অবশিষ্ট ছিল তা একেবারে টুটে গেল। বিদেশী শাসকদের সমালোচনা তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হতে থাকল। সাম্রাজ্যবাদের বর্ণবিদ্বেষ প্রকট হতে থাকল। নীলকর সাহেবদের

অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জন শোনা গেল। পরাধীনতার গ্লানি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে উঠল। জাতীয় শিল্প, জাতীয় বিজ্ঞান, জাতীয় ভাষা প্রভৃতি কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদের নবতর বিকাশ আরম্ভ হল।

পাশ্চাত্য সভ্যতা (তথা ইওরোপীয় ধনতন্ত্রবাদ) সম্পর্কে এই মোহভঙ্গের ফলে তাঁদের দৃষ্টি অন্তর্মুখী হয়ে উঠল। তাঁরা ভাবলেন পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন আদর্শস্থানীয় নয়, তখন ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যেই (অর্থাৎ ধনতন্ত্র-পূর্ব যুগের ভাবধারার মধ্যে) এই আদর্শের সন্ধান করতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই জাতীয়তাবাদের নবরূপায়ণ আরম্ভ হল।

ব্রাহ্ম আন্দোলন

শিক্ষিতদের উপর ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাব ছিল খুব বেশি। রামমোহনের পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধান প্রচার কেন্দ্র হয়ে ওঠে তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এই সময়ে ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে এ-দেশে পাশ্চাত্য প্রগতিশীল ভাবধারা যতই জনপ্রিয় হতে থাকল ততই ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যেও এই নতুন ভাবধারার প্রভাব ব্যাপ্তিলাভ করল। ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন আর ব্রাহ্ম আন্দোলন ক্রমশ সম-অর্থবাচক হয়ে দাঁড়াল। ব্রাহ্ম সমাজের ভিতরেও রক্ষণশীল মনোভাবের যে-টুকু অবশিষ্টাংশ ছিল তার বিরুদ্ধেও অনবরত সংগ্রাম চলল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের প্রগতিবাদী ভাবধারা অনুসরণ করে ধর্মসংস্কার আন্দোলনে অগ্রণী হলেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের রক্ষণ-শীলতার জের (তিনি ব্রাহ্মণের পৈতা ত্যাগ করার বিরোধী ছিলেন) কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এই জন্যেই অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রথমে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত করলেন কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)। যুবক নেতারা ব্রাহ্ম সভা পরিচালনায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি করল। তারা স্থির করল জাতিভেদ মানবে না, ব্রাহ্মণত্বের স্মারক চিহ্ন হিসাবে পৈতা পরবে না, পৌত্তলিকতার সঙ্গে সংস্রব রাখবে না ইত্যাদি। (১)

যুবক দল নারী স্বাধীনতার পক্ষে মত জ্ঞাপন করল। তাদের উদ্যোগে ব্রাহ্ম মহিলাদের পর্দা ত্যাগ করে উপাসনা-সভায় আসার রীতি প্রবর্তিত হল। এই উদ্দেশ্যে 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। নারীদের মধ্যে আলোক বিস্তারের উদ্দেশ্যে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' নামে একখানি নতুন পত্রিকা প্রকাশ করা হল। (২)

নারী স্বাধীনতা ছাড়াও, সমাজ-সংস্কারের বিবিধ কার্যক্রম এই নবীন দল উপস্থিত করল। ১৮৭০ সালে 'ভারত সংস্কারক সভা' নামে তারা একটি সমিতি গঠন করলেন। এই সমিতি পাঁচটি কাজ বেছে নিল। (১) দাক্ষিণ্য, (২) স্ত্রী-শিক্ষা, (৩) কারিগরী ও সাধারণ শিক্ষা, (৪) মদ্যপান নিবারণ, (৫) সুলভ সাহিত্য। এই সমিতির উদ্যোগে প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাদের জন্যে বিদ্যালয় স্থাপিত হল। শ্রমজীবীদের জন্যে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি পত্রিকা প্রকাশ করা হল।

কেশবচন্দ্র সেন প্রথম দিকে এই সংস্কার আন্দোলনে অগ্রণী হলেও দেবেন্দ্রনাথের মতই তিনিও হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার জের সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। অর্ধেক পথ এগিয়ে তিনি আর অগ্রসর হতে রাজী হলেন না। কেশবচন্দ্র স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী হলেও স্ত্রী-স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন না। পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে যখন যুবক দল আন্দোলন আরম্ভ করে তখন তারা কেশবের সমর্থন লাভ করেন নি। শুধু তাই নয়, তিনি প্রাচীন গুরুবাদী ঐতিহ্য অনুসরণ করে ব্যক্তিপূজার প্রচলন করলেন। নিজে ব্রাহ্ম আন্দোলনের নিয়ম ভঙ্গ করে কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজকুমারের সঙ্গে নিজের অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করলেন।

সর্বশেষে, তিনি ব্রিটিশ রাজ ও ভারতসরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রের অঙ্গীভূত করলেন। (৪)

নবীন দল কেশবচন্দ্রের নেতৃত্ব অস্বীকার করে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' (১৮৭৮) নামে নতুন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। এই নবীন দলের নেতা ছিলেন—দুর্গামোহন দাস, আনন্দ মোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে নিজস্ব মত প্রচারের জন্যে দুখানি পত্রিকা

প্রকাশের ব্যবস্থা হল, একখানি—"ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন," অপর খানি "তত্ত্ব-কৌমুদী।" 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' ব্রাহ্ম আন্দোলনের লক্ষ্য নতুন করে নির্দিষ্ট করল। এই পত্রিকায় লেখা হল—

"Brahmoism elevates people not only spiritually but socially, intellectually, physically and politically...Boldly and fearlessly we hope to teach and practise reforms......." (৫)

এই নবীন দল পূর্ণ স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। এই নবীনদের একজন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন—

"না জাগিলে ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে তাঁরা 'সাধারণতন্ত্রের' আদর্শটি গ্রহণ করলেন এবং আনন্দ মোহন বসু এই রাজনৈতিক আদর্শ অনুযায়ী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্যে একটী গঠনতন্ত্র রচনা করলেন। 'তত্ত্ব-কৌমুদী' (১৬ই ফাল্গুন, ১৮০২) লিখলেন—ব্রাহ্মসমাজ "অন্যায়ের উপর ন্যায়, অসাম্যের উপর সাম্য, রাজার উপর প্রজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া পৃথিবীব্যাপী একটি মহাসাধারণ-তন্ত্রের···আয়োজন করিতেছেন।" (৬)

কেশবচন্দ্রের ব্রিটিশ আনুগত্য প্রকাশের বদলে এই নবীন দল ব্রিটিশ বিরোধিতার শপথ গ্রহণ করলেন। ১৮৭৬ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী শিষ্যবর্গকে এক অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সেই দীক্ষার একটি প্রতিজ্ঞা নিম্নরূপ—

"স্বায়ত্ত শাসনই আমরা একমাত্র বিধাতৃ নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি। তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান গভর্ণমেণ্টের আইন কানুন মানিয়া চলিব। কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব করিব না।" (৭)

অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণকারীরা আরও একটি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন—

"অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোড়া (তখনও অস্ত্র-আইন প্রচলিত হয় নাই) প্রভৃতি নিজেরা অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব।"

শিবনাথ বিশ্বাস করতেন স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত করার কাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হবে অগ্রণী। কিন্তু তিনি এই সঙ্গে আরও উপলব্ধি করলেন যে এই কাজ

সুসম্পন্ন করতে হলে শ্রমজীবী জনসাধারণের যোগদান একান্ত প্রয়োজন। তিনি লিখলেন (৮)—

উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই!
উপস্থিত যুগান্তর
চলাচল নারী-নর
ঘুমাবার আর বেলা নাই
উঠ জাগো ডাকিতেছি তাই।
... ...
ওই দেখ চলেছে সকলে
মধ্যবিত্ত ভদ্র যারা
সর্বাগ্রেতে ধায় তারা
পায় পায় ধনীরাও চলে,
ছোট বড় ধায় কুতূহলে।
... ...
ওই দেখ সাগরের পারে,
শ্রমজীবী শত শত,
কেমন সংগ্রামে রত।
এই ব্রত—রবে না আঁধারে
আয় তোরা দেখি যে সবারে।

হিন্দু মেলা বা জাতীয় মেলা

প্রধানত ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতাদের উদ্যোগেই এই সময়ে "জাতীয় মেলা" বা "হিন্দু মেলা" নামে স্বদেশী ভাবোদ্দীপক একটি অনুষ্ঠানের সূত্রপাত (১৮৬৭) হল। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, নব গোপাল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি।

ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে মোহভঙ্গের সুর রাজনারায়ণ বসুর লেখায় খুব স্পষ্ট। তিনি লিখলেন—"বর্তমান বঙ্গ সমাজের রাজ্যবিষয়ক অবস্থা সন্তোষজনক নহে। ...সেকালের বাঙ্গালীরা তাহাদিগের রাজ্যসম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন

তাঁহারা ত ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতেন না। তাঁহারা রাজ্যতত্ত্ব তত সূক্ষ্মরূপে বুঝিতেন না।...এই সকল কারণে তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজ্যসম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে নানা কারণে চতুর্দিকে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই সকল বাসনা পূর্ণ করিতেছেন না। আমরা গভর্ণমেণ্টের দোষ সকল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদের হাত-পা বাঁধা, সে-সকল দোষ সংশোধন বিষয়ে আমাদের কোন কথাই চলে না।" (৯)

দেশের অর্থনৈতিক পরাধীনতা সম্পর্কেও চেতনা জাগল। কাব্যের ছন্দে মনোমোহন বসু আক্ষেপ করলেন—

"তাঁতি, কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সুতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশীবস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন!"

আরও—

হুঁই, সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশলাই কাটী, তাও আসে পোতে—
প্রদীপটি জ্বালিতে ; খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন!"

শুধু হাহাকার নয়। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুরও ক্রমশ ধ্বনিত হল। বাঙালীর মনে সাহস সঞ্চার করতে কবি অতীতকে মহিমান্বিত করে তুললেন—

"কোথায় মা ভিক্টোরিয়া, দেখ আসিয়া,
ইণ্ডিয়া তোর চলছে কেমন!
ছিল যা সুখের রাজ্য, ধরাপূজ্য,
আর্য্যধাম এই ভারত ভুবন।
বাণিজ্য ধন ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য,
আশ্চর্য্য সব ছিল তখন।

তারপরে জোর প্রভুত্ব, ঘোর দৌরাত্ম্য,
সত্য বটে কর্ত্তো যবন।
কিন্তু মা এমন ক'রে, অন্নের তরে,
কাঁদতো না লোক এখন যেমন।
সে দায়ে ঠেকতো তারা, ধনী যারা
আমীর ওমরা জমিদারগণ
যারা মা সাধারণ লোক, পেতো না শোক,
সুখে কাটতো তাদের জীবন।"

রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহের সুরে সংকল্প জানালেন—

"ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা
যে গায় গাক আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে কজন আছি,
আমরা ধরিব আর এক তান।"

এই নতুন তানের উদ্বোধনে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশবাসীর চিত্তে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ভারতের প্রাচীন শৌর্য ও বীর্যের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন।

ব্যায়াম-চর্চা, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা, স্বদেশের পণ্যজাতের পুনরুদ্ধার—এই গুলিই স্বদেশপূজার মুখ্য উপকরণ হয়ে উঠল।

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের আদর্শ মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকল। হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে মনোমোহন ঘোষ ঘোষণা করলেন—

"সারল্য আর নির্মৎসরতা আমাদের মূলধন। তদ্বিষয়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশ ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহতাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে যখন জাতি-গৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা' নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। (১০)

এইসঙ্গে ভারতীয় পুঁজিবাদের স্বাধীন বিকাশের পথটিকে উন্মুক্ত করার জন্যও চারদিক থেকে দাবি উঠল। গত শতকের ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে ভোলানাথচন্দ্র 'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে' স্বদেশী শিল্প বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বললেন—"এখন আমাদের বিলাতী বর্জনের প্রয়োজন রয়েছে।······আমাদের কর্তৃত্বে জাতীয় স্কুল কলেজ, জাতীয় সংবাদপত্র, জাতীয় ব্যাঙ্ক, জাতীয় চেম্বার অব কমার্স, জাতীয় মিল ও ফ্যাক্টরী, জাতীয় বাজার ফার্ম ডক প্রভৃতি তৈরি করতে হবে।" (১১)

১৮৭৬ সালে 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভার' প্রতিষ্ঠা করেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি বললেন—আমি চাই—সরকারের সাহায্যপ্রার্থী না হয়ে সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্বে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক। আমি চাই—এটি হবে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠান, সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান।" (১২)

জাতীয়তার আদর্শটি জনসমক্ষে তুলে ধরাই 'জাতীয় মেলা' বা 'হিন্দু মেলার' ছিল প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে এই মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র 'ন্যাশনাল পেপার' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ছাপাখানার নাম দেওয়া হয় 'ন্যাশনাল প্রেস'। একটি ন্যাশনাল স্কুল, একটি ন্যাশনাল জিমনাসিয়মও প্রতিষ্ঠা করা হল। এইজন্যে নবগোপাল মিত্রকে লোকে 'ন্যাশনাল মিত্র' ব'লে ডাকত।

এই মেলা উপলক্ষে কতকগুলি সুন্দর "জাতীয় সঙ্গীত"ও রচিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত "মিলে সব ভারত সন্তান" গানটি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। কবি মনোমোহন বসুর সঙ্গীত "দিনের দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন", গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি করে" ইত্যাদি গানগুলিও স্বদেশী ভাবের উদ্বোধনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও "বঙ্গদর্শন"

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে এই সময়ে আরও একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে যারা স্বাদেশিকতা ও সাম্যের বাণী প্রচারে যথেষ্ট অগ্রণী হয়েছিল। বঙ্গ-দর্শন-গোষ্ঠীর মধ্যমণি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪)।

সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের দান সর্বজনস্বীকৃত। বঙ্কিম নতুন গদ্য ষ্টাইলের স্রষ্টা। তিনি বাঙলার প্রথম সার্থক উপন্যাস রচয়িতা। অবশ্য শুধু নতুন

ষ্টাইলেরই তিনি প্রবর্তন করেননি। তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলীতে নতুন বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথমেই স্মরণ রাখার প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন, তখন ইওরোপের সভ্যতা সম্পর্কে মোহভঙ্গের পালা আরম্ভ হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইওরোপ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জন্মভূমি বলে সম্মানিত হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইওরোপের কয়েকটি প্রধান রাষ্ট্র সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার মন্ত্রে জলাঞ্জলি দিয়ে সমরবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ আর ঔপনিবেশিকতাবাদের পূজায় মেতে উঠল। ইওরোপের এই পরিবর্তন বাঙলার বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি এড়ায়নি।

তাই দেখে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইওরোপকে মাইকেল সম্বোধন করলেন 'অমরাবতী' বলে। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ইওরোপের বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দা করলেন—সেখানে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতির প্রাবল্য দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন।

মাইকেল ফ্রান্সে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে লেখেন—

"I wish I could live here all the days of my life...This is unquestionably the best quarter of the globe...This is the অমরাবতী of our ancestral creed. Come here and you soon forget theat you spring from a degraded and subject race. Here you are the master of your masters ...Everyone, whether high or low, will treat you as a man and not a d-d-nigger. But this is Europe, my boy, and not India." (১৩)

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই মোহের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যলিপ্সা দেখে বঙ্কিম চন্দ্র লিখলেন ঠিক উল্টো কথা। তিনি বললেন—

"ইওরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইওরোপীয় patriotism-ধর্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্যজাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।"

ইওরোপের ঔপনিবেশিকতাবাদী দেশগুলির স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখলেন—

"...যে সমাজ বলবান সে দুর্ব্বল সমাজের কাড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা বলিতেছি না, সভ্য ইওরোপের এই রীতি।"

তাই বলে এই কথা মনে করার কারণ নেই যে বঙ্কিম ইওরোপের প্রগতিশীল ঐতিহ্য থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বরং তিনি এই সময়ে ইতালী ও ইওরোপের অন্যান্য দেশে যে সমরবাদ-বিরোধী, জাতীয়তা-বাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার প্রতি আকৃষ্ট হন। 'বঙ্গদর্শনে' 'ভারতে একতা' নামে এক প্রবন্ধে তিনি ইতালী ও অন্যান্য দেশের জাতীয় আন্দোলনের আদর্শটি অনুসরণের জন্যে ভারতবাসীকে আহ্বান জানালেন।

তাছাড়া, বঙ্কিম সমসাময়িক ইওরোপের অতি আধুনিক চিন্তাধরার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। কোঁতের পজিটিভিজম্ বঙ্কিম ও বঙ্কিম-বন্ধুদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। রুসো ও মিলের উপদেশগুলি তিনি আকণ্ঠ পান করলেন। কল্পনা-মূলক সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শটিও বঙ্কিমের অজানা ছিল না। তিনি রবার্ট ওয়েন, লুই ব্লাঁ, কাবে, সেণ্ট সাইমন ফুরিয়র প্রভৃতির চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলেন। প্রুধোঁকে তিনি রুশোর মানসশিষ্য বলে বর্ণনা করলেন। 'কম্যুনিজম' ও মার্কস প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্টারন্যাশনালও' তাঁর মতো রুশো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করেন তারই ফল। (১৪)

কিন্তু ইওরোপে যে ঐতিহাসিক স্তরে (ধনতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতায় লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হবার ফলে এই ঐতিহাসিক স্তরটির আবির্ভাব) কল্পনা-মূলক সমাজ-তন্ত্রবাদের উদ্ভব হয়েছিল, ভারতে বঙ্কিমের যুগে সেই ঐতিহাসিক স্তরটি (ভারতে তখন ধনতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা দূরের কথা, জন্মের কাজটাও ভালভাবে এগোয়নি) তখনও বিকাশ লাভ করেনি। বঙ্কিমের যুগে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শটি ভারতের মাটিতে প্রয়োগের মত কোনো বাস্তব আবস্থার সৃষ্টি হয়নি। তবে রুশো, প্রুধোঁ প্রভৃতির ভাবধারা বঙ্কিমকে সাম্য মন্ত্রের (equalitarianism) পূজারী করে তুলেছিল এবং এই ভাবধারার প্রভাবেই তিনি "সাম্য" পুস্তকখানি রচনা করেন।

বঙ্কিম ইওরোপের অন্ধ অনুকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি দেশ-বাসীকে দেশের মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে আহ্বান জানালেন। এই

উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনসূচক বিষয়গুলি নির্বাচন করলেন। দেশের মাটির দিকে মুখ ফেরানোর নামে তিনি হিন্দুর অনেক কুশাসনেরও প্রশংসা আরম্ভ করলেন। ইওরোপের বিষয়ানুবর্তিতার জায়গায় হিন্দুর আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের নেশায় তিনি অনেক সময় এক ধরনের 'হিন্দু শোভিনিজম' প্রচার করতে থাকলেন।

কিন্তু তবুও এই দুর্বলতা সত্বেও বঙ্কিম অনুসৃত হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনটিকে মূলত প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন ভাবলে ভুল হবে। এই পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের মর্ম ছিল ইওরোপীয় স্বাদেশিকতা ও সাম্য নীতি।

সেই জন্যেই বঙ্কিমের 'হিন্দু', বঙ্কিমের 'বৈষ্ণব' স্বতন্ত্র। 'হিন্দু কে' এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখলেন "……যে লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোছা করা পৈতা, কপালে কপাল জোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি এবং গায়ে নামাবলী, মুখে হরিনাম থাকিলেও তাহাকে হিন্দু বলিব না।" (১৫)

'বৈষ্ণব কে' তার উত্তরে বঙ্কিম লিখলেন—"যখন সর্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণব ধর্ম, তখন এ হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি ও বড় জাতি এইরূপ ভেদ জ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদজ্ঞান করে সে বৈষ্ণব নহে।" (১৬)

বরং ইওরোপীয় আদর্শে স্বদেশপ্রীতি ও সাম্য নীতিকেই বঙ্কিমচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করতেন। 'আনন্দমঠে' 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে এই স্বদেশমন্ত্রেরই প্রথম প্রকাশ।

এই স্বাদেশিকতার প্রেরণা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম ব্রিটিশ বিরোধী সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনীটিকে তাঁর দুখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মূল প্লট হিসাবে নির্বাচন করলেন। যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা দস্যু হাঙ্গামা বলে অভিহিত করতেন—বঙ্কিমই সর্বপ্রথম তাকে ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মর্যাদা দিতে সাহসী হলেন। সত্য বটে রাজরোষ এড়াবার জন্যে বঙ্কিম এই বিদ্রোহের ইতিহাসটিকে অনেকটা বিকৃত করে পরিবেশন করেছেন, মুসলমান বিদ্বেষে ইন্ধন জুগিয়েছেন। এগুলি তাঁর চিন্তার দুর্বলতা সূচনা করে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' সমগ্রভাবে বিচার করলে দেশে স্বাদেশিকতা প্রচারের কাজেই সাহায্য করেছিল।

বঙ্কিমের সাধনা ছিল—এক বীর প্রসবিনী বাঙালী জাতি। ফরাসী বিপ্লবে

ফরাসী জাতির সামরিক অভিযান বঙ্কিমকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তাঁর "দেবী চৌধুরাণী" সেই বাঙালী জাতির কথা চিন্তা করেছিল—যে বাঙালী জাতি ঘোড়ায় চড়ে, সাঁতার কাটে, কুস্তি করে, সব রকম অস্ত্রের ব্যবহার জানে।

বঙ্কিমের 'রাজসিংহ,' ও 'সীতারাম' ভারতবাসীর মনে দেশপ্রেমের আদর্শ জাগিয়ে তোলার জন্যেই রচিত হয়েছিল—এবিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু স্বদেশপ্রেমের আদর্শ নয়, সামাজিক সাম্যের আদর্শটিও তুলে ধরার চেষ্টা করলেন।

তিনি লিখলেন—যতদিন পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষিত ও ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ অধিকাংশ বাঙালীর মধ্যে ব্যবধান থাকবে, ততদিন আমাদের জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হবে। তাই তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়, শিক্ষিত ও সাধারণ লোকের মধ্যে যাতে বোঝাপড়া সহজ হয়, পরস্পরের মধ্যে যাতে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হয় তার জন্যে 'বঙ্গদর্শনে' বহু প্রবন্ধ লিখলেন।

অসাম্যের প্রতীক জমিদারদের তিনি বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছেন। তিনি লিখলেন—

"আমাদের দেশের এখনকার বড় মানুষদিগকে মনুষ্যজাতির মধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভুতুড়িসার গোরুর খাদ্য।" (১৭)

শুধু জমিদার নন, গরীবের যম আইনকারীও বিচারকদেরও তিনি রেহাই দেন নি। তিনি অন্যত্র লিখেছেন—

"কোথাও জমীদাররূপ ঢেঁকি প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া নূতন নিরিখরূপ চাউল বাহির করিয়া, সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্নভোজন করিতেছেন, কোথাও আইনকারক ঢেঁকি মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া-ভাঙ্গিয়া বাহির করিতেছে—আইন, বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র্য, কারাবাস—ধনীর ধনান্ত, ভাল মানুষের দেহান্ত।"

শুধু বড়লোকদের অনাচারেরই তিনি বর্ণনা করেননি, তিনি গরীবদের অধিকারের প্রশ্নটিও উত্থাপন করলেন।

'বিড়াল' দরিদ্রের প্রতিনিধি হয়ে কমলাকান্তকে প্রশ্ন করল—

"এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য আমরা, বিড়াল প্রভেদ কি? তোমাদের

ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আমরা খাইলে তোমরা কোন শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না।”

সাম্যের দাবিতে তিনি লিখলেন—“অধিকারের সাম্য আবশ্যক—কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি।”

স্ত্রী-জাতিরও সমান অধিকার তিনি দাবি করলেন—

“দেশে অনেক এসোশিয়েন, লীগ, সোসাইটি, সভা, ক্লাব ইত্যাদি আছে; কাহারও উদ্দেশ্য ধর্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুর্নীতি; কিন্তু স্ত্রী-জাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্য একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্দ্ধেক অধিবাসী স্ত্রী-জাতি,—তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই।” (১৮)

বঙ্কিম বাঙলার কৃষকের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নটিও উত্থাপন করলেন। তিনি লিখলেন—“যিনি ন্যায় বিরুদ্ধ-আইনের দোষে পিতৃ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ ও তাঁহার ভ্রাতা। জন্ম দোষ-গুণের অধীন নহে। তাহার জন্য কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী।”

সামাজিক সাম্যের আদর্শটি ছাড়াও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাও বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নলিখিত বিবৃতিটি স্মরণীয় –

“বাঙ্গালা হিন্দু মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত হৃদ্যতাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না, বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসী চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেন না জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।” (১৯)

স্বাদেশিকতা ও সাম্যের আদর্শ বঙ্কিমের ভাবধারায় বারে বারে ঘোষিত

হলেও বঙ্কিম-চিন্তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি কলেক্টর; বঙ্কিমচন্দ্র অর্থবান চাকুরে বাঙালী; তাই বঙ্কিমের উপলব্ধিতে যাই থাক তার বহিঃপ্রকাশ অনেক ক্ষেত্রে দ্বিধা-জড়িত। অনেকক্ষেত্রে বঙ্কিমের তত্ত্বে ও কথায় পার্থক্য পরিস্ফুট, অনেক ক্ষেত্রে সত্য প্রকাশের সোজা পথ ছেড়ে তিনি বাঁকা পথ এমন কি বিকৃত পথেরও আশ্রয় নিয়েছেন।

তাই ডেপুটি কলেক্টর বঙ্কিম ইওরোপীয় শক্তিগুলোর পররাজ্য গ্রাসের মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেও বললেন—"আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারত-মণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই না। যেদিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেদিন সে পরামর্শ দিব।"

স্বাধীনতা শব্দের বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থিত করে তিনি বললেন "স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতি আমদানি, 'লিবার্টি' শব্দের অনুবাদ,......ইহার এমন তাৎপর্য্য নয় যে রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে।" (২০)

রাজরোষ এড়াবার ভয়েই যে তাঁকে কলম সংযত করতে হয়েছিল সে-কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। ঝান্সীর রাণীর চরিত্র চিত্রণ করার ইচ্ছা হয়েছিল বঙ্কিমের। তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে এ-বিষয়ে লিখলেন—"আমার ইচ্ছা হয় একবার সে চরিত্র (লক্ষ্মীবাই) চিত্র করি, কিন্তু এক আনন্দমঠেই সাহেবরা চটিয়াছে, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।" (২১)

একই উদ্দেশ্যে তিনি রাজনীতি-চর্চা থেকে বিরত থাকতেন। 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন' তাঁকে লিখতে অনুরোধ করলে তিনি জানালেন—"আমি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবো না, কারণ তাহলে আমি মুখার্জীর বিরুদ্ধে এ্যাংলো-স্যাক্সোনিয়নকে (ইংরেজকে) উত্তেজিত করে তুলব।" (২২)

রাজরোষ এড়াবার ভয়ে বঙ্কিম যে শুধু কলম সংযত করেন তাই নয়, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজের বিকল্প হিসাবে যবন বা 'নেড়ে' শব্দটিও ব্যবহার করেছেন। 'আনন্দমঠে'র প্রথম সংস্করণে অনেক ক্ষেত্রে 'ইংরেজ' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে 'ইংরেজ' শব্দের পরিবর্তে যবন বা 'নেড়ে' শব্দগুলি বঙ্কিম ব্যবহার করেন।" (২৩)

বঙ্কিমের এই 'এক্সপেরিমেণ্ট' সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে ইন্ধন জোগাল, মুসলমানের

বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের পথে বাধার সৃষ্টি করল, স্বাদেশিকতার আদর্শটিকে খণ্ডিত করে দিল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যেরা

বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগের চেয়ে প্রতিভাবান ব্যক্তি সন্দেহ নেই। তবে চিন্তায়, ভাবনায়, দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি একক নন। অনুরূপ ভাবধারায় উদ্দীপ্ত হয়ে তাঁর আর কয়েকজন সহকর্মী কলম ধরলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি।

সমাজ-সংস্কারের দিক থেকে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হলেও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দেশকে সঞ্জীবিত করার চেষ্টা করলেন। ইংরেজ শাসনের দোষত্রুটি সম্পর্কে তিনিও সচেতন ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন চাকরীজীবী। কাজেই চাকরীজীবীর আর্তনাদ তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। তিনি লিখলেন—"বিড়াল পাতের নিকটে থাকুক, মেঁও মেঁও করুক, মাছের কাঁটা থাক—কিন্তু সিভিল সার্ভিসের দিকে নুলো বাড়াইলেই চপেটাঘাত।" (২৪)

ভূদেব-চরিত্র লেখক উল্লেখ করেছেন—তিনি এ-দেশীয় বড়লোকদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতেন, কিন্তু "কারবারী, প্ল্যাণ্টার বা কলওয়ালা সাধারণ ইংরেজদিগের সঙ্গে মিশিতে চাহিতেন না।" এই শ্রেণীর লোকদের তিনি ভারতের ঐশ্বর্যের লুণ্ঠনকারী বলে ঘৃণা করতেন।

স্বদেশীয়দের পক্ষ থেকে ইংরেজের অন্ধ অনুকরণের যে প্রবণতা এই সময়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল তিনি তার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

ভূদেব রক্ষণশীল হলেও মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি বলতেন—"হিন্দু মুসলমান দুই ভাই, উভয়ে এখন এদেশবাসী, সুতরাং একই মাতৃস্তন্যে উভয়ে পুষ্ট, ফলত উহারা 'দুই ভাই।' (২৫)

ভূদেবের স্বাধীনচিত্ততা ইংরেজ সিভিলিয়ানদের অনেককে বিস্মিত করেছিল। জনৈক ইংরেজ ভূদেব সম্পর্কে উপহাস-ছলে মন্তব্য করেন—"Bhudev with his C.I.E. and Rs. 1500 is still anti-British." (২৬)

বলাই বাহুল্য, বঙ্কিমের মত ভূদেবও সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক ছিলেন না। সামাজিক বিপ্লব ত দূরের কথা সরকারী চাকুরে হিসাবে ব্রিটিশের ন্যায়সঙ্গত বিরোধিতার পথেও তিনি বেশীদূর অগ্রসর হতে পারলেন না।

ভূদেব 'এডুকেশন গেজেট' নামে একখানি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকা পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর একদিকে স্বাদেশিকতা আর একদিকে দ্বিধাচিত্ততা দুইয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। ভূদেবচরিত লেখক নিম্নলিখিত ঘটনাটির (২৭) উল্লেখ করেছেন—

এডুকেশন গেজেটে প্রকাশের জন্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশভক্তিতে পরিষিক্ত হইয়া ভূদেববাবুরও বিশেষ প্রীতির জন্য "ভারত সঙ্গীত" লিখিয়া পাঠাইলে ভূদেববাবু বলিয়া পাঠান "দেখিয়া নয়নে জন কত শ্বেত প্রহরী পাহারা লেগেছে ধাঁধা"—বাক্যটা ভারতের সম্মেলন সাধন জন্য বিধি প্রেরিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে উল্লেখ করে; উহা ঠিক নয়। বর্তমানকে লক্ষ্য করিয়া কিছু লিখিতে হইলে নরম সুরই সঙ্গত। তাহাতে হেমবাবু "ভারত-বিলাপ" লিখিয়া পাঠান। উহাতে ভূদেববাবুর উপরোক্ত পরামর্শের এবং পূর্বের লিখিত অপ্রকাশিত "ভারত সঙ্গীতের" প্রতি লক্ষ্য আছে—"ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার"। এই কবিতাটি ১০ই জুন ১৮৭০ সালে ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে "ভারত সঙ্গীত" কবিতাটিরও অঙ্গচ্ছেদ করে প্রকাশ করা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে উপরোক্ত চরিত লেখক আর একটি তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। সেটি নিম্নরূপ—

"ভারত সঙ্গীতের ন্যায় অতুল্য স্বদেশভক্তির উদ্দীপক কবিতাটি প্রকাশ না করায় দেশের ক্ষতি, এই বিবেচনায় ভূদেববাবু উহাকে ঐতিহাসিক চিত্রে পরিবর্তিত করাইয়া দেন। 'এডুকেশন গেজেটে' যখন উহা প্রকাশিত হইল তখন উহাতে 'শিবজী নয়নে হানিয়া বিজলী' ছিল এবং 'সুগৌরাঙ্গতনু সন্ন্যাসীর ঠাট' অংশ বর্জিত হইয়াছিল। ভূদেববাবু বলিতেন—ঐতিহাসিক চিত্রের মধ্যে স্বদেশভক্তির উদ্দীপক কথা দিলে মনও সরস হয়, উচ্চভাবেরও আলোচনা হয়, অথচ প্রকৃত পক্ষে শান্ত সংযত হিন্দুর দেশে আইনভঙ্গের বা রাষ্ট্রবিপ্লবের কোন উত্তেজনাও হয় না।"

ভূদেবের পরেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের (১৮২০—১৮৮৬) নাম করা চলে। তিনি 'সোমপ্রকাশ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'সোমপ্রকাশ'—সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আদর্শটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল। ১৮৬০ থেকে ১৮৭০—এই দশ বছর ধরে 'সোমপ্রকাশ'

বাঙলার সাংবাদিকতা জগতে একটি উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করল। 'প্রেস আইনের' প্রতিবাদে 'সোমপ্রকাশ' কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫—১৯০৪) ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশ-প্রেমের উদ্বোধন করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইতালীর জাতীয় আন্দোলনের নেতা ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ওয়ালেস প্রভৃতির এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন বৃত্তান্ত রচনা করেন। 'ভারতসভা' যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ভারতসভার জন্মদিন উপলক্ষ করে তিনি বললেন—

"এই দিন ভারতের পুনর্জন্ম দিন! এই দিনে সমস্ত ভারতে এক অপূর্ব্ব রাজনৈতিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাপিত হইল।...এ ধর্ম্মে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, সেশ্বর, নিরীশ্বর, সাকার, নিরাকার, খ্রীষ্টান, হীদেন সকলেই সমান।...ইহাতে রাজা, জমিদার, প্রজা প্রভৃতি বিষাক্ত শ্রেণীবিভাগ নাই। ইহা সাম্যবাদী। এই ধর্ম্মই ভারতসভার মূলভিত্তি।" (২৮)

স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন বলে সরকারী চাকরীতে তাঁর যোগ্যতানুরূপ উন্নতি হয়নি।

চণ্ডীচরণ সেনও (১৮৪৫—১৯০৬) সরকারী চাকুরে (মুন্সেফ) হয়েও যথেষ্ট স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দেন। তিনি Uncle Tom's Cabin এর বাঙলা অনুবাদ করেন এবং বইখানির নাম দেন 'টম কাকার কুটীর'। তিনি টলষ্টয়ের একখানি উপন্যাসেরও অনুবাদ করেন। তাছাড়া, স্বাদেশিকতা প্রচারের মাধ্যম হিসাবে তিনি কতকগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'মহারাজা নন্দকুমার', 'অযোধ্যর বেগম', ও 'ঝান্সীর রাণী' (১৮৮৮)। তখনকার দিনে ঝান্সীর রাণীকে নিয়ে উপন্যাস লেখা রীতিমত সাহসের কাজ বলতে হবে। এই পুস্তকগুলি জনসাধারণের মধ্যে যেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ঠিক তেমনি আবার এই বইগুলো লেখায় তিনি সরকারের বিরাগভাজন হলেন।

রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র

এই যুগের কাব্য সাহিত্যেও প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠল স্বাদেশিকতা। কাব্যের মাধ্যমে স্বাদেশিকতা প্রচার করলেন এই যুগের তিনজন প্রধান

কবি। তাঁরা হলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭) 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' নামে যে কাব্যপুস্তক রচনা করলেন তার স্বদেশরসাত্মক ভাবধারা দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করে তুলল। তিনি দেশবাসীর মনের কথা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ করে বললেন—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) আক্ষেপ করে বললেন—

"মা গো ও মা জন্মভূমি !
আর কত কাল তুমি,
এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।"
(বীরবাহু কাব্য)

ভারতস্থিত সাহেব-পুঙ্গবদের লক্ষ্য করে তিনি লিখলেন—

"চিরশিক্ষা-বৃটনের পৃথিবীর লুট !
ভারত ছাড়িয়া যাবো-টুট টুট টুট !!
(নেভার নেভার)"

কংগ্রেস উপলক্ষে জাতীয় একতার স্তুতিগান করে তিনি লেখেন—

"আর নহে আজ ভারত অসাড়,
ভারত সন্তান নহে শুষ্ক হাড়,
দ্রাবিড় পাঞ্জাব অউধ বিহার
এক ডোরে আজ মিলিল ;
... ...
হে ভারতবাসি হিন্দু-মুসলমান
হের দুখ নিশি পোহাল !"
(রাখি-বন্ধন)

রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের কাব্যকীর্তি স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,' আর তারপরে হেমচন্দ্রের 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' কবিতায় দেশ-মুক্তি কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলীর মত।"

নবীনচন্দ্র সেনেরও (১৮৪৭-১৯০৯) কাব্যসাধনার মূল প্রেরণা ছিল স্বদেশপ্রেম। তাই 'পলাশীর যুদ্ধেই' বাঙালী প্রথম "জাতির জীবনে বিশ্বাস-ঘাতকতার শোচনীয় পরিণতির চিত্র দেখিতে পাইল, তাহারা এমন একখানি অপূর্ব কাব্যের আস্বাদন লাভ করিল, যেখানে তাহাদের নবজাগ্রত অথচ অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষা ভাষা পাইয়াছে।" (২৯)

ভারতের অতীত ঐতিহ্যের মধ্যে নবীনচন্দ্রও পথের সন্ধান করলেন। এই উদ্দেশ্যে 'মহাভারত' মন্থন করে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', ও 'প্রভাস' নামে কাব্যত্রয়ী তিনি রচনা করলেন। নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের কর্ম-কাণ্ডের মধ্যে দেখতে পেলেন—"খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতে অখণ্ড ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের বিপুল প্রয়াস।" (৩০)

এই আদর্শটি তিনি কাব্যের ভাষায় ব্যক্ত করলেন—

> "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয় করি সম্মিলিত
> এই শৈল-প্রাচীরের মধ্যে পুণ্যভূমে
> এক মহারাজ্য, প্রভু! হয় না স্থাপিত,
> এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন ?"

'নীলদর্পণ' ও জমিদার দর্পণ'

এই নতুন স্বাদেশিকতা নাটকেও ক্রমশ প্রতিফলিত হতে লাগল। দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) 'নীলদর্পণ' নাটক এই প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণীয়। এই নাটকটির বৈশিষ্ট্য শুধু স্বাদেশিকতায় নয়, বাঙলার কৃষক ও ইতর জনের প্রতি সহানুভূতির গুণে এই বইখানি নতুন একটি বলিষ্ঠ সাহিত্য-ধারার প্রবর্তনের দাবি করতে পারে। এই ধারাটিই অনুসরণ করে পরে লেখা হয়েছিল আরও একখানি সমগোত্রীয় পুস্তক—সেখানি 'জমীদার দর্পণ'।

নীল-বিদ্রোহের তরঙ্গে বাঙলা যখন আন্দোলিত, নীল-কৃষকের সদর্প অভ্যুত্থানে বাঙলার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মন যখন চঞ্চল, ঠিক সেই সময়ে সাহসে ভর করে যিনি প্রথম নীল-কর অত্যাচারের বর্ণনাটিকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করলেন তিনি হলেন দীনবন্ধু মিত্র। নীল-বিদ্রোহ যখন চলছে ঠিক সেই সময়ে ১৮৬০ সালে এই নাটকখানি প্রকাশিত হল।

দীনবন্ধু সরকারী কাজ উপলক্ষে যে-সমস্ত অঞ্চলে নীলচাষ চলত সেখানে

ভ্রমণ করেছিলেন। কাজেই নীল-করদের অত্যাচার ও নীল চাষীদের দুঃখের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এই অভিজ্ঞতা আর তাঁর সাহিত্যগুণ এই দুইয়ের সংমিশ্রণে নীল-দর্পণ একখানি সার্থক নাটকের মর্যাদা লাভ করেছিল। এই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"এই প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন, এমন আর কেহই জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনী-মুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীল-দর্পণ বাঙ্গালীর Uncle Tom's Cabin. "টম কাকার কুটির" আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, নীলদর্পণ নীলদাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।" (৩১)

নীলদর্পণের যে দুর্বলতা নেই এমন নয়। প্রথম কথা, 'নীল দর্পণ' নীল বিপ্লবের দর্পণ নয়। বিপ্লবের দিকটা লেখক সযত্নে পাশ কাটিয়ে গেছেন। দ্বিতীয়ত, নীলকর অত্যাচার দমনে লেখক 'প্রজাজননী' মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সস্নেহ সহযোগিতার কামনা করলেন। এই আশায় তিনি লিখছেন—"প্রজাবৃন্দের সুখ সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসী দ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজাজননী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন।" (৩২)

পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দীনবন্ধুকে চাকরী বাঁচাবার তাগিদে হয়তো এই ভিক্টোরিয়া স্তুতি করতে হয়েছে।

তবে সে যাই হোক্, এই দুর্বলতা সত্বেও 'নীল দর্পণ' তদানীন্তন কালের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী রসে সিঞ্চিত সব চেয়ে বলিষ্ঠ নাটক। তাই এই বইখানির ওপর ইংরেজের খড়্গ উদ্যত হয়েছিল বার বার।

এই সময়ে মীর মশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) প্রজার দুঃখের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে আর একখানি নাটক লিখলেন। এই নাটকটির নাম 'জমীদার দর্পণ'। বঙ্গাব্দ ১২৭৯ সনে (১৮৭৩ খ্রীঃ) এই নাটকখানি প্রথম প্রকাশিত হয়।

নাটকটির উৎসর্গ-পত্রে গ্রন্থকার 'পাঠকগণ সমীপে নিবেদন' প্রসঙ্গে লিখেছেন—"জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়-স্বজন সকলেই

জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না।”

নিজে জমিদার হয়েও গ্রন্থকার ইংরেজ সৃষ্ট জমিদারী প্রথার স্বরূপ যে-ভাবে উন্মোচন করেছেন তা সত্যই প্রশংসা পাবার যোগ্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসায় যখন অনেকেই পঞ্চমুখ তখন জমিদারী প্রথার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার সাহস যে কয়েকজন অল্প লোকের হয়েছিল মীর সাহেব তাদেরই একজন। তিনিই সর্বপ্রথম জমিদারী প্রথার অত্যাচারে প্রপীড়িত বাঙ্‌লার কৃষকের মর্মব্যথাকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করলেন।

নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধর বলছেন—“আচ্ছা মফস্বলে একরকমের জানওয়ার আছে জানেন ? তারা কেউ কেউ সহরেও বাস করে। সহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর।······সহরে কেউ কেউ জানে যে এ-জানওয়ার বড় শান্ত, বড় ধীর, বড় নম্র ; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ-মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শৃগাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না। বলব কি, জানওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে বাঘ হয়ে বসে।”

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জমিদার মাত্রই মীর সাহেবের আক্রমণের বিষয়। তাই তিনি লিখছেন—এই জানওয়ারেরা “আবার দুই দল, যেমন হিন্দু আর মুসলমান।”

এক মুসলমান জমিদারের প্রজাপীড়নের কাহিনী এই নাটকখানির বিষয়বস্তু।

এই নাটকে আরও বর্ণনা করা হয়েছে জমিদারদের সঙ্গে ইংরেজ জজ, ইংরেজ ডাক্তার, আর ইংরেজ ব্যারিষ্টারদের যোগসাজসের কথা।

তবে এই নাটকেও নীলদর্পণের মতই কৃষক-বিদ্রোহকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। উৎপীড়িত কৃষকরমণী গ্রন্থকারের কল্পনার রথে চড়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। এই মহারাণী ভিক্টোরিয়াই বাঙ্‌লার প্রজাকুলকে অবশেষে রক্ষা করবেন—এই হল লেখকের নৈরাশ্যের মাঝে একমাত্র ভরসা।

নাটকখানি তখনকার দিনে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। লেখক নিজেই উল্লেখ করেছেন—

“অনেক শত্রু দর্পণখানি ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে।” (৩৩)

বিবেকানন্দ

স্বাদেশিকতার প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল এই যুগে আরও একজনের প্রচারকর্ম। তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২)।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের সব চেয়ে প্রিয় শিষ্য। রামকৃষ্ণ ছিলেন পুরোপুরি অধ্যাত্মবাদী। ধর্মোপাসনা ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা। কিন্তু তবুও তাঁর প্রচারিত অধ্যাত্মবাদের পিছনে একটি উচ্চতর সামাজিক আদর্শ বর্তমান ছিল। তিনি নিজে কালীর পূজারী হলেও হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি প্রতিটি ধর্মকেই মুক্তির পথ বলে মনে করতেন। রামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোক। খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরাও রামকৃষ্ণের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হননি। সমাজ সংস্কারে অগ্রদূত ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিও রামকৃষ্ণের ছিল আন্তরিক সমর্থন। জাতি-ভেদের কঠোরতায় তিনি বিশ্বাস করতেন না, হিন্দু পুরোহিতদের গোঁড়ামি তিনি সহ্য করতেন না, এমন কি সময়ে সময়ে উপবীত পর্যন্ত ত্যাগ করতেন। রামকৃষ্ণের উদারনৈতিক অধ্যাত্মবাদ তদানীন্তন কালের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। (৩৪)

রামকৃষ্ণের এই উদারপন্থী ধর্মমত কেশবচন্দ্রের মনের কোণে গভীর দাগ কাটল। যুবক ব্রাহ্মদের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রীও রামকৃষ্ণের অনুরাগী ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষিত যুবক বিবেকানন্দও রামকৃষ্ণের এই উদারপন্থী ভাবধারার টানেই রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

মোট কথা, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ভারতের ঐতিহ্য—এই দুইয়ের মধ্যে যাঁরা এই সময়ে সমীকরণ করার চেষ্টা করতেন তাঁরা অনেকেই রামকৃষ্ণের অধ্যাত্মবাদী উদারতায় মুগ্ধ হলেন।

প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদ ও প্রতীচ্যের কর্মবাদের সমন্বয় প্রচেষ্টা সব চেয়ে মূর্ত হয়ে উঠল বিবেকানন্দের চিন্তায় ও প্রচারকর্মে।

বিবেকানন্দ তাই ভারতবাসীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

"Make a European Society with India's religion."

প্রগতিশীল পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি বিবেকানন্দের ছিল গভীর সহানুভূতি। তাই ফরাসী বিপ্লবের নায়ক রোবেসপীয়রকে তিনি প্রণতি জানান। কলম্বিয়াকে

(আমেরিকাকে) স্বাধীনতার জন্মভূমি বলে অভিবাদন জানান। বুর্জোয়া শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কেও তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। তাই তিনি বুর্জোয়া শক্তির প্রাদুর্ভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখলেন—

"এই যুগে নবোদিত বৈশ্যশক্তির প্রবলাঘাতে, কত রাজমুকুট ধুল্যবলুণ্ঠিত হইল, কত রাজদণ্ড চিরদিনের মত ভগ্ন হইল। যে কয়েকটি সিংহাসন সুসভ্য দেশে কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠিত রহিল, তাহাও তৈল, লবণ, শর্করা বা সুরাব্যবসায়ীদের পণ্যলব্ধ প্রভূত ধনরাশির প্রভাবে আমীর ওমরাহ সাজিয়া নিজ নিজ গৌরব বিস্তারের আস্পদ বলিয়া।" (৩৫)

বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের যে তরঙ্গ উঠেছিল বিবেকানন্দের তার প্রতিও ছিল অকুণ্ঠ সহানুভূতি। তাই ভারত ইতিহাসের সামন্ত যুগের স্বৈরতান্ত্রিক পরিবেশটিকে তিনি মহিমান্বিত না করে বরং তার কঠোর সমালোচনা করলেন এই বলে—"করগ্রহণে, রাজ্যরক্ষায়, প্রজাবর্গের মতামতের বিশেষ অপেক্ষা নাই ; হিন্দু জগতেও নাই, বৌদ্ধ জগতেও তদ্রূপ।··· হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা আকবর···দেবতুল্য রাজার দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজা কখনও স্বায়ত্ত শাসন শিখে না, রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নিশক্তি নিবীর্য হইয়া যায়।" (৩৬)

কুপমণ্ডুকতার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি লিখলেন—

"The fact of our isolation from all the other nations of the world is the cause of our degeneration and its only remedy is getting back into the current of the rest of the world. Motion is the sign of life." (৩৭)

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বপুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীলতা যতই প্রকাশ পেতে থাকল বিবেকানন্দের মনও বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে ততই বিষিয়ে উঠতে লাগল। বিবেকানন্দ প্রথমে যখন আমেরিকায় যান তখন ঐ দেশটিকে তিনি স্বাধীনতার জন্মভূমি বলে সম্বোধন করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারে সেই আমেরিকায় গেলে তাঁর আগের মোহ ভেঙ্গে যায়। তিনি এইবার আমেরিকায় ডলারের প্রভুত্ব দেখে মর্মাহত হন। তিনি ঘোষণা করেন—"আমেরিকার মধ্যে ভবিষ্যতের মানবজাতির মুক্তির সম্ভাবনা নিহিত আছে বলে পূর্বে তাঁর যে ধারণাটি ছিল সেটি মিথ্যা।" (৩৮)

ইওরোপ ভ্রমণের ফলে ইওরোপীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্য লিপ্সা দেখে তিনি ব্যথিত হন ও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে—ইওরোপ একটি বিরাট যুদ্ধশিবির। সেখানে তিনি চারদিকে পেলেন যুদ্ধের গন্ধ। (৩৯)

পুঁজিবাদের মোহ ভেঙ্গে যাবার পরে পুঁজিবাদের সমালোচনামূলক ভাবধারাগুলি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। এইজন্যেই বোধ হয় রুশ নেতা ক্রপটকিন যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন বিবেকানন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কল্পনা-মূলক সমাজতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গেও বিবেকানন্দের পরিচয় ছিল। তাই তিনি লিখলেন—"এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে···শূদ্র ধর্ম কর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য করিবে। তাহারই পূর্বাভাষছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলেই তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।" (৪০)

উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেকানন্দ জনসাধারণের অধিকারের কথাও তুললেন। তিনি বললেন—"আজ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজ সংস্কারের ধূম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানাস্থলে বিচরণ করিয়া দেখিলাম সমাজ সংস্কার সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরে শোষণের দ্বারা ভদ্রলোক নামে প্রথিত ব্যক্তিরা ভদ্রলোক হইয়াছেন এবং রহিতেছেন তাঁহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না।"

তিনি এই সুরে আরও বললেন—"The only hope of India is from the masses. The upper classes are physically and morally dead." (৪১)

বলাই বাহুল্য, বিবেকানন্দের masses এই ক্ষেত্রে শ্রমিক নয়, কৃষক নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তিনি যখন বিলাতে যান তখন তিনি বলতেন—ভারতের রাজা মহারাজাদের প্রতিনিধি হয়ে বিলাতে যাবার ইচ্ছা তাঁর নেই। নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হয়ে তিনি বিলাতে যেতে চান।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতীয়তাবোধের আবেদন সৃষ্টি করার জন্যে তিনি লিখলেন—"হে ভারত! এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, এই দাস-সুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র

সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে?"

এক উদার জাতীয়তাবাদী আদর্শে তিনি দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করে তুললেন। উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

"হে ভারত—ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ যে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল-মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

জাতীয়তাবাদী ভাবধারার দুর্বলতা

এইভাবে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারা যতই সবলতর হতে থাকল ততই তার চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। এই চারটি: (১) পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে মোহভঙ্গের সূচনা, (২) ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে ভারতবাসীর অধিকতর বিরোধের সূত্রপাত, (৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষ থেকে জনসাধারণের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণের চেষ্টা (৪) হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপলব্ধি।

জাতীয়তাবাদী ভাবধারার মধ্যে এই সবলতার চিহ্নগুলি দেখা গেলেও তার দুর্বলতার লক্ষণগুলিকেও উপেক্ষা করা চলে না।

যাঁরা এই নতুন ভাবধারার ধারক ও বাহক তাঁরা ছিলেন অধিকাংশ ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী। পেশার দিক থেকে তাঁরা ছিলেন চাকরিজীবী, অনেকেই আবার সরকারী চাকুরে। ধর্মমতের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন হয় হিন্দু, নয় ব্রাহ্ম।

উপরোক্ত শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত, পেশাগত কারণে এই যুগের বুর্জোয়া লিবারেল বুদ্ধিজীবীদের প্রবর্তিত স্বাদেশিকতার আন্দোলনটিতে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহভঙ্গ হল বটে, কিন্তু ইংরেজ-পূর্ব যুগের ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সংকীর্ণতাবাদী অনুশাসনগুলি সম্পর্কে স্বাদেশিকতার নামে নতুন মোহ সৃষ্টি হতে থাকল। হিন্দু বিধবার বৈধব্যের মধ্যে আবিষ্কৃত

হল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এক আদর্শ। স্ত্রী-স্বাধীনতার কথাও সতর্কতার সঙ্গে উচ্চারিত হতে থাকল। কেউ কেউ বললেন বিনা সুশিক্ষায় স্ত্রী-স্বাধীনতা অমঙ্গলকর। হিন্দু নারীর পাতিব্রত্যের আদর্শ নতুন করে প্রচারিত হতে থাকল। অতীতের দিকে এই প্রত্যাবর্তনের নেশা একটু বেশি পেয়ে বসল। পাশ্চাত্য সভ্যতা মাত্রই বিষয়ানুবর্তিতা আর প্রাচ্য সভ্যতা মাত্রই স্বার্থগন্ধহীন অধ্যাত্মবাদ—এই ধরনের এক অবৈজ্ঞানিক তত্ব প্রচার হতে থাকল। এই তত্ত্বটি স্বাদেশিকতা প্রচারের কাজের দিক থেকে আপাতদৃষ্টিতে কার্যকরী হলেও ভবিষ্যতে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

শুধুই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের পথেই এই তত্ত্বটি বাধার সৃষ্টি করেছিল তাই নয়, এই আন্দোলনটি প্রচলিত হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে গড়ে ওঠায় এই অধ্যাত্মবাদ হিন্দু ঐতিহ্যের (বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা) রস সঞ্জাত হয়ে উঠল। ফলে এই স্বাদেশিকতা অনেকটা হিন্দু স্বাদেশিকতার রূপ গ্রহণ করল। রাজনারায়ণ বসু 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামক পুস্তিকায় "মহাহিন্দু সমিতি" গঠনের প্রস্তাব করলেন। জাতীয় মেলা 'হিন্দু মেলা' বলে পরিচিত হল। 'হিন্দু', 'জাতীয়' দুটি কথা প্রায় এক অর্থবাচক হয়ে উঠল। হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপলব্ধি থাকলেও কার্যক্ষেত্রে এই আদর্শটি বর্জিত হল। রাজনারায়ণ বসু তাই লিখলেন—"মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদুর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত জমি কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেইরূপ হিন্দু সমাজই আমাদের কার্যের ক্ষেত্র হইবে।" (৪২)

ঐতিহাসিক দৃষ্টি থেকে বিচার করলে এই হিন্দু স্বাদেশিকতা অনিবার্য ছিল। কারণ, এই আন্দোলনটিতে যাঁরা যোগদান করেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু। মুসলমানদের মধ্যে এই সময়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রচার হয়নি, কাজেই ইওরোপের জীবনদর্শন, গণতন্ত্রবোধ, স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতির আদর্শও তাঁদের মধ্যে মোটেই প্রসার লাভ করেনি। মুসলমান সমাজের একটি বড় অংশ যদি এই আন্দোলনে যোগ দিত তাহলে বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে এই স্বাদেশিকতা হিন্দু গন্ধকে অনেকটাই অতিক্রম করতে বাধ্য হত।

কিন্তু মুসলমান সমাজ এই সময়ে পিছিয়ে থাকায় সেটি সম্ভব হয়নি। মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রেরণা একেবারেই ছিল না তা বলা

যায় না। স্যার সৈয়দ আহমদ আলিগড়ে মুসলমান সমাজকে ইংরেজী শিক্ষার দিকে মুখ ফেরাতে আহ্বান জানালেন। বাঙ্‌লা দেশেও ইংরেজী শিক্ষার প্রেরণা কোনো কোনো ব্যক্তি ও একটি ছোট্ট গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা গেল।

১৮৬৩ সালে নবাব আবদুল লতিফ 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার মধ্যে দিয়ে মুসলমান সমাজে মানসিক সচেতনতা সৃষ্টি করা—এই সোসাইটির উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হল। এই সোসাইটিতে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা চলত তার কয়েকটি ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা, নৌ পরিচালনা ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, আমেরিকার আবিষ্কার, সভ্যতার মোড় ফেরার কাহিনী, মুসলমান আইনের মূল নীতি সমূহ। (৪৩)

কিছু পরে অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে সৈয়দ আমির হোসেনের উদ্যোগে 'ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' নামে আর একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সৈয়দ আমির হোসেন মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশ করেন (১৮৮০)। তাতে মুসলমানদের উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। তিনি বললেন—ইংরেজী না শিখলে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মুসলমানদের হার ভিন্ন আর কিছু হবে না তা দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। (৪৪)

এইভাবে মুসলমান সমাজের মধ্যে এক আলোড়ন শুরু হল সন্দেহ নেই। তবে এই আলোড়ন এই সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; এই কার্যকলাপ হিন্দুপ্রধান স্বাদেশিকতার ধারাটির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

তবে উপরোক্ত হিন্দু স্বাদেশিকতা উদ্বোধনে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের কোনো দায়িত্ব ছিল না ভাবলেও ভুল হবে। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকেরা এই সময়ে মুসলমান আমলের ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থিত করে একটি সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির মূলে ইন্ধন জোগাতে থাকলেন। বাঙ্‌লার বুদ্ধিজীবীদের অনেকে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেননি। তাঁরাও এই ইতিহাসকে পুরোপুরি সত্যি ইতিহাস ধরে নিয়ে মুসলমান বিদ্বেষ প্রচারে কলম ধরলেন। ব্যক্তিগত কুসংস্কার ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতাবুদ্ধি থেকেও যে তাঁরা অনেক সময়ে এই মুসলমান বিদ্বেষ প্রচার করেন তাও অস্বীকার করা যায় না।

যে কারণেই হোক না কেন, হিন্দু ধর্মের আশ্রয়, হিন্দু অধ্যাত্মবাদের আবেদন, হিন্দুগন্ধী এই মনোভাব, এই যুগের স্বাদেশিকতার আদর্শের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়ায় এই যুগের জাতীয়তার আদর্শটি অনেকাংশ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল সন্দেহ নেই। এই সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার আদর্শটি মুসলমান সমাজের পক্ষে পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের পথে একটি অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল, জাতীয় আন্দোলনের গতি কথঞ্চিৎ রুদ্ধ করে দিয়েছিল,।

তবে এই বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ প্রচারিত স্বাদেশিকতার আদর্শটি হাজার দুর্বলতা সত্বেও বাঙলায় জাতীয়তা-বাদের তরঙ্গটিকেই পরিপুষ্ট করেছিল। এই স্বাদেশিকতার আদর্শটিই ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের জমি তৈরি করেছিল এই কথাটি মুহূর্তের জন্যেও ভুললে অন্যায় হবে।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

(১) Sivnath Shastri—History of the Brahmo Samaj Vol. I, P. 130

(২) ঐ, পৃঃ ১৬৬

(৩) ,, পৃঃ ২৪২-৪৪

(৪) Bipin Chandra Pal—The Brahmo Samaj and the Battle for Swaraj, P 52,

(৫) প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া নামক পুস্তকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪১

(৬) ঐ পৃঃ ৪২

(৭) বিপিনচন্দ্র পাল—নবযুগের বাংলা, পৃঃ ১২২—২৩
(৮) কবিতাটি ১৮৭৪ সালের "ভারত শ্রমজীবী" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ; "স্বাধীনতা' (শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬২) পুনর্মুদ্রিত।
(৯) রাজনারায়ণ বসু—সেকাল ও একাল, পৃঃ ১৪০
(১০) হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তৃতা
(১১) Bholanath Chandra—The life of Digambar Mitra, P. 97-99
(১২) ঐ, পৃঃ ৯৭
(১৩) গৌরদাস বসাকের কাছে লেখা চিঠি
(১৪) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'সাম্য'
(১৫) মহম্মদ শহীদুল্লাহ—সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্র—ঢাকা শতবার্ষিকী সভাতে পঠিত।
(১৬) ঐ
(১৭) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কমলাকান্তের দপ্তর
(১৮) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাম্য
(১৯) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বঙ্গদর্শন,' পৌষ, ১২৮০
(২০) মোহিতলাল মজুমদার—বাংলার নবযুগ
(২১) Bimanbehari Majumder—History of Political Thought, P. 452
(২২) ঐ পৃঃ ৪১১—৪১২
(২৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'আনন্দ মঠ' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পাঠভেদ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১২৬
(২৪) কুমারদেব মুখোপাধ্যায়—ভূদেব চরিত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩০৮
(২৫) ঐ, পৃঃ ১৪৪
(২৬) ঐ, পৃঃ ৩০৩—৪
(২৭) ঐ, পৃঃ ৩৯৫—৯৭
(২৮) যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—সাহিত্য সাধক চরিতমালা।
(২৯) ত্রিপুরাশঙ্কর সেন—উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১৯০—৯১
(৩০) ঐ, পৃঃ ১৯২
(৩১) দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী—বসুমতী সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত প্রবন্ধ।
(৩২) 'নীলদর্পণ' নাটকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
(৩৩) জমীদার দর্পণ—উৎসর্গ পত্র
(৩৪) Bhupendranath Dutta—Swami Vivekananda, Patriot Prophet, রামকৃষ্ণ পরমহংস নামক অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৭৩—৮৬
(৩৫) বিবেকানন্দ—বর্তমান ভারত
(৩৬) ঐ

(৩৭) Romain Rolland—"The Life of Vivekananda," P. 85, P. 179,

(৩৮) ঐ

(৩৯) ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত—সাহিত্যে প্রগতি, পৃঃ ৭৮

(৪০) বিবেকানন্দ—বর্তমান ভারত

(৪১) Romain Rolland—The life of Vivekananda, P. 3

(৪২) কাজী আবদুল ওদুদ—বাংলার জাগরণ, পৃঃ ১২৭

(৪৩) ঐ, পৃঃ ১২০

(৪৪) ঐ, পৃঃ ১২২

নবম অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদী আমল
(১৮৮৪—১৯২৮)

আমরা আগেই দেখেছি ব্রিটিশ শিল্পপুঁজি নিজের স্বার্থে ভারতের বাজারে প্রবেশের জন্যে এ-দেশে কতকগুলি নতুন জিনিসের প্রবর্তন করে, বিশেষ করে রেলপথ নির্মাণের কাজে হাত দেয়। কিন্তু এ পথে অগ্রসর হতে গিয়ে তারা এই কাজের অনিবার্য পরিণতি একটা নতুন পর্যায়ের শোষণের ভিত্তি স্থাপন করল। এইটিকে ব্রিটিশ পুঁজি নিয়োগেব সাহায্যে শোষণের পর্যায় বা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পর্যায় বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ

এই পুঁজি নিয়োগের কাজটি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আরম্ভ হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ভারতে পুরোপুরি সাম্রাজ্য-বাদী শোষণের স্তরটি উন্মুক্ত হয়।

কিভাবে এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্তরটি ভারতে উন্মুক্ত হল তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন রজনীপাম দত্ত। (১) তিনি লিখেছেন—

সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এই পুঁজি নিয়োগকে পুঁজি রপ্তানী বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতের বেলায় আসল ঘটনাটিকে যদি ভারতের ব্রিটিশ পুঁজি রপ্তানী বলে চালানো যায়, তাহলে সেটা বাস্তবের এক তীব্র বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

আসলে, যে পরিমাণ ব্রিটিশ পুঁজি রপ্তানী হয়েছিল তা নিতান্তই অল্প। এই সময়ে (অর্থাৎ ১৮৫৭ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে) ব্রিটেন থেকে ভারতে

যে পরিমাণ পুঁজি রপ্তানি করা হয়েছিল তার চেয়ে ভারত থেকে ইংলণ্ডে প্রেরিত করের পরিমাণ ছিল বহুগুণ বেশি। এই ভাবে ভারতে লগ্নীকৃত ব্রিটিশ পুঁজি বাস্তবিক ভারতের বুকে বসেই ভারতীয় জনসাধারণকে লুণ্ঠন করেই প্রথমে তোলা হয়েছিল।

ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি নিয়োগের বীজ হল "জনসাধারণের ঋণ" (Public Debt)। ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যখন প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করল, তখন তারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ৭০০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণও গ্রহণ করল।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে পড়ে "জনসাধারণের ঋণ"—আঠারো বছরের ভিতর বেড়ে ৭০০ লক্ষ পাউণ্ড থেকে ১৪০০ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হল। ১৯০০ সালে তার পরিমাণ হল ২২৪০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৯ সালে তার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াল ৮৮৪২ লক্ষ পাউণ্ড।

এইভাবেই ভারতের জনসাধারণের ঘাড়ে এই বিপুল ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হল। ১৮৫৭ সালের 'মিউটিনি দমন' কোম্পানী থেকে রাণীর হাতে হস্তান্তর, চীন ও আবিসিনিয়ার যুদ্ধ, ইংলণ্ডে ভারত অফিসের প্রতিটি খরচ প্রভৃতির জন্য যে-টাকা ব্রিটেন খরচা করেছিল, তার দরুণ প্রতিটি ঋণ ভারতের সঙ্গে যার মাথা-মুণ্ডু কোনো সম্পর্কও নেই—"ভারতের জনসাধারণের ঋণ" বলে চালিয়ে দেওয়া হল।

রেলপথ নির্মাণের ফলে এই ঋণের বোঝা আরও ভয়ানকভাবে বেড়ে চলল। রেলপথ নির্মাণের কাজের ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা যে টাকাই খরচা করুক না কেন তার উপর শতকরা ৫ টাকা সুদের গ্যারাণ্টি দেবার ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থার দরুণ ১৮৭২ সাল পর্যন্ত যে ৬০০০ মাইল রেলপথ তৈরি হল, তার অন্য খরচা পড়ল ১০০০ লক্ষ পাউণ্ড অথবা মাইল পিছু ১৬০০০ পাউণ্ডেরও ওপর। ১৮৭২ সালে আয় ব্যয় সম্পর্কে পার্লামেণ্টারী তদন্ত কমিটির সমক্ষে ভারতের ভূতপূর্ব অর্থসচিব মেসি বলেন—"পরিমিত ব্যয়ের কোন অভিপ্রায় (রেলওয়ে) ঠিকাদারদের ছিল না।......সমস্ত টাকাই আসত ইংরেজ পুঁজিপতিদের কাছ থেকে। যতক্ষণ তাদের ভারতের রাজস্ব থেকে শতকরা পাঁচ টাকা সুদের গ্যারাণ্টি দেওয়া হত, ততক্ষণ তাদের ধার দেওয়া টাকা গঙ্গায় ফেলে দেওয়াই হোক অথবা ইট চুন সুরকিতেই পরিণত করা হোক, তাদের কাছে সে কথার কোনো

গুরুত্বই ছিল না !...আমার মনে হয়, এই সব কাজে যত বাজে খরচ হয়েছে, তেমন আর কোথাও কখনও হয়নি।”

রেলপথ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং চা, কফি, এবং রবাবের চাষ ও ছোট খাটো আরও কয়েকটা শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে বে-সরকারী ব্রিটিশ পুঁজি খাটানোর কাজটা দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে থাকল।

এই সময়ে কোম্পানীর একচেটে ব্যবসা সম্পর্কিত বিধি নিষেধ উঠে যাবার পরে বে-সরকারী ব্রিটিশ ব্যাঙ্কও ভারতে গড়ে উঠল। এই ব্যাঙ্কগুলোকে 'এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক' বলা হত। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলোর হেডকোয়ার্টার ছিল ভারতের বাইরে। এই ব্যাঙ্কগুলো সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ভারতের অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হল।

১৯১১ সালে স্যার জর্জ পেইস হিসাব করে দেখান—(কোম্পানি নিরপেক্ষ ব্যক্তিগত পুঁজির হিসাব নেই সুতরাং সেই পুঁজি বাদ দিয়েই) ভারত ও সিংহলে নিয়োগীকৃত মোট ব্রিটিশ লগ্নী পুঁজির পরিমাণ হল—৩৬৫০ লক্ষ পাউণ্ড। পেইস যা হিসাব দিয়েছেন সেই অনুযায়ী কোন শিল্পে কত টাকা নিয়োগ করা হয়েছিল, তা নিচে দেখান হল—

	লক্ষ পাউণ্ডের হিসাব
সরকার ও মিউনিসিপ্যালিটি-সক্রান্ত	১৮২৫
রেলওয়ে	১৩৬৫
চাষ (চা, কফি, রবার)	১৪২
ট্রামওয়ে	৪১
খনি	৩৫
ব্যাঙ্ক	৩৪
তৈল	৩২
শিল্প-বাণিজ্য	২৫
অর্থ ভূমি, ইনভেস্টমেণ্ট	১৮
বিবিধ	৩৩

উপরের তালিকাটি খুবই শিক্ষাপ্রদ। এর থেকে দেখা যায়, ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি খাটাবার ব্যবস্থা বা তথাকথিত ব্রিটিশ পুঁজি রপ্তানির মধ্যে কোনো

দিক দিয়েই ভারতে আধুনিক শিল্পের উন্নতির কথা ছিল না। ১৯১৪ সালের যুদ্ধের আগে ভারতে লগ্নী ব্রিটিশ পুঁজির শতকরা ৯৭ ভাগই খাটত গভর্ণমেন্টে, যানবাহন, চাষ এবং অর্থ সম্পর্কিত কাজে; অর্থাৎ বাণিজ্যের দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশ করা এবং কাঁচা মালের উৎস ও ব্রিটিশ পণ্যের বাজার হিসাবে ভারতকে শোষণ করার জন্যেই পুঁজি নিয়োগ করা হত; শিল্পোন্নতি সাধনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ ব্যাঙ্কপুঁজি কর্তৃক ভারত শোষণের বনিয়াদটি মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও পরবর্তী যুগেই এই শোষণের রীতি পুরোপুরি কার্যকরী হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ভারতে লগ্নীকৃত ব্রিটিশ মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫০০০ লক্ষ পাউণ্ডের ওপর। উপরোক্ত লগ্নীকৃত মূলধনের মুনাফা এবং প্রত্যক্ষ কর দুইয়ে মিলে মোট ৫০০ লক্ষ পাউণ্ড ভারতকে ব্রিটেনে প্রতি বছর পাঠাতে হত।

১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী যুগে ব্রিটিশপুঁজি নিয়োগের পরিমাণ আরও দ্রুত গতিতে বেড়ে চলল।

১৯২৯ সালে ভারতে লগ্নীকৃত ব্রিটিশ মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০০০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৩ সালে এই হিসাব আরও বাড়ল এবং ১০,০০০ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়ে দাঁড়াল।

নিজের দেশের বাইরে ব্রিটিশের মোট টাকা খাটছে ৪০,০০০ পাউণ্ড। দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে এক ভারতবর্ষেই ১০,০০০ পাউণ্ড লগ্নী করা রয়েছে।

উপরের হিসাবগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পূর্বের চেয়ে আধুনিক যুগেই ভারতে ব্রিটিশ শোষণ অনেক তীব্রতর হয়ে উঠেছে। হিসাব মত দেখা যায় যে সম্রাট কর্তৃক ভারতের শাসন ভার নেবার আগে কোম্পানীর শাসনের ৭৫ বছরের ভেতর ভারত থেকে সংগৃহীত করের মোট পরিমাণ ছিল ১৫০০ লক্ষ পাউণ্ড। আর আধুনিক যুগে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বের ২০ বছরের ভিতরেই ভারত থেকে ব্রিটেনে প্রেরিত করের পরিমাণ হল প্রতি বছরেই ১৩৫০ লক্ষ থেকে ১৫০০ লক্ষ পাউণ্ডের কাছাকাছি। ভারতে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের কার্যকলাপের উপরোক্ত বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থিত করে রজনীপাম দত্ত মন্তব্য করেছেন—ব্যাঙ্কপুঁজির আওতায় ভারতকে তীব্রতর ভাবে শোষণের

ভিতরেই ভারতের বর্তমান ঘনায়মান সঙ্কট এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুতীব্র বিদ্রোহের মূল কারণটি নিহিত রয়েছে। (২)

ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশ

সংক্ষেপে বলা চলে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসকারী ভূমিকা সম্পর্কে কার্ল মার্কস যে মন্তব্য করেন পরবর্তী যুগের ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কেও সেই মন্তব্য বেশ খাটে। কেবল সময়ের পরিবর্তনে শোষণের কায়দাটিরও পরিবর্তন হয়েছে মাত্র।

কার্ল মার্কস আরও বলেছিলেন যে শোষণের তাগিদেই ব্রিটিশ শাসন ভারতে নবতর উৎপাদন ব্যবস্থার কতকগুলি উপকরণ প্রবর্তন করতে বাধ্য হবে। পরবর্তী যুগের ইতিহাসে মার্কসের এই মন্তব্যটিরও সারবত্তা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। নিজের সংকীর্ণ বাণিজ্যিক স্বার্থেই ব্রিটিশ সরকার ভারতে এক ধরণের সীমাবদ্ধ পুঁজিতন্ত্র প্রবর্তন করেছে।

ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে ভারতের মাটিতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের কাজটা কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। বলাই বাহুল্য, সাধারণত বিদেশী ব্রিটিশ পুঁজির নেতৃত্বেই ভারতে অগ্রসর হয়েছে এই সীমাবদ্ধ পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের প্রক্রিয়াটিকে ইচ্ছা থাকলেও সর্বক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির এক্তিয়ারে রাখা সম্ভব হল না। এই প্রক্রিয়ার সাথে সাথে ভারতীয় পুঁজি নিয়োগেরও কিছু কিছু সুবিধা দিতে হল। অবশ্য সেই সুবিধা এমন ভাবে দেওয়া হল যাতে ব্রিটিশ পুঁজির মূল স্বার্থে আঘাত না পড়ে। তবে যে-ভাবেই হোক্ আর যতটুকুই হোক্, ভারতের বুকে এই সময়ে যে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ হল এইটুকুই লাভ। এই পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের লক্ষ্যগুলি সবচেয়ে বেশি দেখা গেল ভারতের তিনটি শিল্পে—চা বাগান, কাপড়ের কল ও চটকলে।

এই তিনটি শিল্পে কতটা অগ্রগতি হল নিম্নলিখিত হিসাব থেকেই সেটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই শিল্পগুলিতে ভারতীয় পুঁজির নিয়োগ কতটা অগ্রসর হল তারও পরিচয় নিম্নলিখিত হিসাবে কিছুটা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে:

চা-বাগান	১৯১১	১৯২১
ইওরোপীয় ডিরেক্টর পরিচালিত কোম্পানী—	১৫৮	১৮৪
ভারতীয় ডিরেক্টর পরিচালিত কোম্পানী—	১৮	৮২
ইওরোপীয় মালিকানায়—	৪৬	৩৬
ভারতীয় মালিকানায়—	১৮	২৭

কাপড়ের কল	মিলের সংখ্যা
১৮৬১	৮
১৯০০	১৯৩
১৯১৯	২৭১

এই শিল্পে শতকরা ৯৯ ভাগ পুঁজি ভারতীয়।

১৯২১ সালে ভারতীয় ও ইওরোপীয় কর্তৃত্ব নিম্নরূপ—

মোট মিলের সংখ্যা—	৩৩৫
ইওরোপীয় কর্তৃত্বে—	৯
ভারতীয় কর্তৃত্বে—	৩২২

চটকল	তাঁতের সংখ্যা
১৮৭৫	৩,৫০০
১৯০০	১৫,০০০
১৯৩২	৬০,০০০

এই শিল্পে ইওরোপীয় কর্তৃত্বই প্রধান।

১৯০৫ সালে ভারতে মোট ফ্যাক্টরীর সংখ্যা দাঁড়াল ২,৬৮৮। বলাই বাহুল্য এই শিল্পোন্নতির মূলে ছিল ব্রিটিশ পুঁজি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই পর্বে ভারতীয় পুঁজির ক্রমবর্ধমান শক্তি উপেক্ষণীয় নয়।

শিল্পে নিয়োগীকৃত ভারতীয় পুঁজির পরিমাণ ১৯০০ সালের তুলনায় দশগুণ বৃদ্ধি পেল ১৯০৫ সালের মধ্যে। (৩) শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পুঁজির উদ্যোগে আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠল। ১৯০৫ সালে ভারতীয় পুঁজি নিয়ে ৯টি আধুনিক ব্যাঙ্ক খোলা হয়।

১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে বাঙলায় যে স্বদেশী আন্দোলন দেখা দেয় তার ফলে দেশে শিল্পোন্নতির প্রসার হয় আরও। দেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ২১২। জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর সংখ্যা ১৯০৫ সালে ছিল ১,৫৩০, ১৯১০ সালে দাঁড়াল ২,০৬১। ১৯০৭ সালে লোহা ও ইস্পাত শিল্পেরও উন্নতি হল টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার পরে।

এতকাল ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের পথে নিত্য নতুন বাধা সৃষ্টি করত ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে সংগ্রাম করেই ভারতীয় পুঁজিকে উপরোক্ত স্থানটুকু করে নিতে হয়েছিল।

কিন্তু ১৯১৪-১৯ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারকে অবস্থার চাপে পড়ে নীতি কিছুটা পরিবর্তন করতে হল।

যুদ্ধের মধ্যে ইংলণ্ডের কলগুলি ইংলণ্ডের যুদ্ধ-প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাজেই তাদের পক্ষে ভারতের বাজারে মাল যোগান দেওয়া আগের মত সম্ভব হল না। এই সুযোগে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বাজারটি দখল করে নিতে চেষ্টা করল। ব্রিটিশ বণিকেরা দেখল ভারতের বাজার চিরতরে হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই তারা ভাবল—বরং ভারতীয় শিল্পপতি শ্রেণীকে কিছুটা সুযোগ দেওয়া ভাল। তাছাড়া, যুদ্ধের মধ্যে ইংলণ্ডে উৎপন্ন লোহা ও ইস্পাত ইংলণ্ড থেকে ভারতে রপ্তানী করাও সম্ভব হল না। তাই ভারতে ভারী শিল্প গড়ে তোলার বিষয়টিতেও ব্রিটিশ সরকারকে কিছুটা উৎসাহ দিতে হল। সর্বোপরি, এই সময়ে ব্রিটেন যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় এবং ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠায় ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর দাবিগুলিকে আর একেবারে অস্বীকার করাও রাজনীতির দিক থেকে নিরাপদ বলে মনে হল না। কাজেই নানা কারণে ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয় পুঁজিকে যুদ্ধের সময়ে কিছুটা সুযোগ দিতে হয়েছিল। (৪)

যুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় পুঁজিতন্ত্র কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছিল। এই সময়ে কাপড়ের কল আর লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে অনেকটা উন্নতি লক্ষিত হল। যুদ্ধের আগে ভারতের বস্ত্রের(Textiles) শতকরা ৭০ ভাগ আসত ইংলণ্ড থেকে, আর শতকরা ২৮ ভাগ আসত ভারতীয় কলগুলি থেকে। যুদ্ধের পরে ব্রিটেন থেকে বস্ত্র এল শতকরা ৩৫ ভাগ। আর ভারতে উৎপন্ন হল শতকরা ৬১ ভাগ। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেও অনেকটা উন্নতি দেখা গেল। 'টাটা আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী' এবং 'বেঙ্গল আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর, উদ্যোগে এই শিল্প অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল।

যুদ্ধের সুযোগে 'এতদিন যে-সব ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুঁজির একাধিপত্য ছিল যেমন চটকল ও চা-বাগান সেখানেও ভারতীয় পুঁজি কিছুটা স্থান দখল করে নিল। ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলির পাশাপাশি ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিরও প্রতিষ্ঠা বাড়ল। ১৯২০ সালে ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কগুলির পেইড-আপ-ক্যাপিটাল হয়েছিল ৮·৩৭ কোটি টাকা।

এইভাবে যুদ্ধের মধ্যে ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের কিছুটা উন্নতি হলেও ভারতের

শিল্প-বিস্তৃতির মূল ঔপনিবেশিক চরিত্রটি বদলাল না। কোন্ শিল্পে কতজন মজুর কাজ করত (১৯২১ সালের লোক গনণার হিসাব অনুযায়ী) তার হিসাব থেকেই ভারতের শিল্পোন্নতির এই ঔপনিবেশিক চরিত্রটি উপলব্ধি করা যায়—

সমস্ত শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের সংখ্যা—	১৫,৭০০,০০০
লৌহশিল্পে—	৭৩০,০০০
গৃহ নির্ম্মাণ শিল্পে—	৮১০,০০০
বস্ত্র শিল্প—	৪,০৩০,০০০

উপরোক্ত সংখ্যা থেকেই বোঝা যায় যে আধুনিক পুঁজিবাদী শিল্পব্যবস্থার যা প্রাণ সেই লৌহ ও গৃহ নির্ম্মাণ শিল্প ভারতে হয়ে রইল একান্ত অনগ্রসর, মোট শিল্পের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ।

যুদ্ধের পরে ব্রিটেনের অস্বাভাবিক অবস্থা যেমন দুরীভূত হল তেমনি নতুন করে আবার ব্রিটিশ পুঁজি ভারতীয় পুঁজিকে কোণঠাসা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। কাজেই বিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের কর্তৃত্বে ভারতের বিরাট শিল্পোন্নতি হয়েছিল ভাবলে ভুল হবে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধি

১৮৫৭ থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে কিভাবে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের ক্রমপ্রসারের ফলে উপরোক্ত তিনটি শ্রেণীরই শক্তি অনেকটা বৃদ্ধি পেল।

বিংশ শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী যৌবনে পদার্পণ করল। বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের শক্তি সম্পর্কে এতটা সজাগ হয়ে উঠল যে তারা ইংরেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামেও অবতীর্ণ হতে সাহস পেল। যুদ্ধোত্তর যুগের অসহযোগ আন্দোলনটি বিশেষ করে বিলাতী বর্জন আন্দোলনটি বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থে, বুর্জোয়া শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

এই পর্বে ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীরও যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। ১৯১১ সালের লোক গণনার হিসাবে দেখা যায় যে সরকারী চাকুরী আর স্বাধীন পেশায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ৭,৯৭৩,৬৬২। এই সংখ্যার মধ্যে মার্চেণ্ট

অফিসের কেরাণী ও চাকুরেদের কথা ধরা হয়নি। এ ত গেল যাদের চাকরী ছিল তাদের কথা। আর যাদের চাকরী ছিল না তাদের সংখ্যাও এই সময়ে ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকল। শিক্ষিত বেকার, অল্প বেতনভোগী চাকরীজীবী—ছাত্র, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ চরমে উঠল। বুর্জোয়াশ্রেণীর মত এদের না ছিল সম্পত্তি, আর না ছিল রায়-সাহেবী, খাঁ সাহেবী পদমর্যাদার পিছুটান। তাই মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকদের মধ্যে অনেক বেশি 'র‍্যাডিকাল' মনোভাব দেখা দিয়েছিল। মধ্যবিত্তশ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধি ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামকেও অনেক বেশি শক্তিশালী করে তুলতে সক্ষম হল। ১৯০৫-১১ সালের স্বদেশী আন্দোলন, ১৯২০-২৪ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও ১৯০৫-৩০ সালের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ছিল সব চেয়ে অগ্রগামী শক্তি। এই শ্রেণীটির রক্তে, এই শ্রেণীটির নির্ভীকতায় এই আন্দোলনগুলির হয়েছিল প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

তবে এই পর্বে বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি হলেও এই সঙ্গে এই সময় থেকে জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে একটি নতুন সমস্যারও সৃষ্টি হল। এই সমস্যাটিকে উপেক্ষা করা চলে না। এই সমস্যাটি দেখা দিল শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধির প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে।

আমরা আগে দেখেছি—১৮৫৭ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হলেও এই সময়ে তার শক্তি ছিল নাম মাত্র। ১৮৮০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেল, এই শ্রেণীটির মধ্যে ঐক্যবোধ জাগল, শ্রেণী-চেতনা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ক্রমশ শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও গড়ে উঠল। শ্রমিক শ্রেণী জাতীয় রাজনীতিতেও একটি নতুন সবল শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হল।

শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধিতে একদিকে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা শঙ্কিত হল তেমনি অপরদিকে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীও শ্রমিক শ্রেণীর এই অগ্রগতি ভাল চোখে দেখল না। প্রথম দিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতারা এই নতুন শক্তিটিকে নিজেদের আন্দোলনের কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করল, শ্রমিক আন্দোলনগুলির সুযোগ নিতে সচেষ্ট হল, কিন্তু চরম বিচারে তারা শ্রমিক শ্রেণীকে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একটি অবাঞ্ছিত শক্তি হিসাবে দেখতে

আরম্ভ করল। ফলে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণী আর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে একটা বিরোধ দেখা দিতে থাকল।

তবে এই বিরোধ থাকলেও আন্দোলন বন্ধ হল না। কেননা নিজেদের মধ্যে বিরোধ সত্ত্বেও বুর্জোয়া শ্রেণী, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী প্রত্যেকেই দেখল তাদের সমশত্রু হল ব্রিটিশ। তাই ১৮৮৪ থেকে ১৯২১—এই পর্বে উপরোক্ত শ্রেণীগুলি একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

(১) R. P. Dutt—India To-day, P. 110—122
(২) ঐ, পৃঃ ১২২
(৩) M. N. Roy—India in Transition, P. 26
(৪) Joan Beauchamp—British Imperialism in India, P. 46.

দশম অধ্যায়

জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্রেস
(১৮৮৫—১৯২৭)

রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র—বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের প্রচারে প্রায় ষাট বছর অতিক্রান্ত হল। এই দীর্ঘ প্রচারকর্মের ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জমি প্রস্তুত হল।

অপর দিকে, ১৮৫৭ সালের জাতীয় বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন, জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম—এইগুলিও পরবর্তী যুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে প্রেরণা জোগাল।

এই দুই ধারার প্রভাবেই শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল বাঙলার তথা সারা ভারতের জাতীয় আন্দোলন।

চরিত্রের দিক থেকে এই আন্দোলন ছিল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ভারতের পরাধীনতার চেতনা থেকে এই আন্দোলনের সূচনা। তাই এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল ধনিক, মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক প্রত্যেকটি শ্রেণীই, যারাই ছিল সাম্রাজ্যবাদের পীড়নে পীড়িত। তবে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল বুর্জোয়া জীবন ধারার প্রবর্তক, বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয়, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা।

ভারত সভার ভূমিকা

ইংরেজ শাসনের এই আওতায় জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে সর্বপ্রথম যে সমিতিটি গঠিত হয় তার নাম হল 'জমিদার সভা' (১৮৩৭)। এই সভার

প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রামমোহন-শিষ্য দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এই সভার উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করা হল—জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল রকম মানুষকে গ্রহণ করা জন্যে এই সভা গঠিত হল। একে চাই না, ওকে নেওয়া হবে না, এইরূপ সকল রকমের ছুঁৎমার্গ বাদ দিয়েও উদারনীতির উপর এই সভা প্রতিষ্ঠিত। এ দেশের মাটির সঙ্গে নিজের স্বার্থ জড়িত থাকাই সভ্যপদ লাভের একমাত্র যোগ্যতা। (১)

এই সভা ছাড়া, পরে ইয়ং বেংগলের নেতৃত্বে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে (১৮৪৩)। তারপরে 'জমিদার সভা' ও 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' দুটিকে মিশিয়ে গড়ে ওঠে নতুন আর একটি প্রতিষ্ঠান। তার নাম ছিল 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন' (১৮৫১)। এই এসোশিয়েশনের নেতৃত্বে ছিল ইংরেজী-শিক্ষিত জমিদারেরা—রাজা রাধাকান্ত ছিলেন এই সভার সভাপতি। এই সভা জমিদারদের দাবি-দাওয়া নিয়ে যেমন আন্দোলন করত তেমনি দেশের পক্ষ থেকে সাধারণ রাজনৈতিক মতামতও কিছুটা প্রকাশ করত।

তবে এই সময়ে দেশের রাজনীতি-চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল দেশীয় সংবাদপত্র-গুলি। রামমোহনের 'সংবাদ কৌমুদী', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'প্রভাকর' হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট', নরেন্দ্রনাথ সেনের 'ইণ্ডিয়ান মিরর', শিশিরকুমার ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' শম্ভুচন্দ্র মুখার্জীর 'রাইস এ্যাণ্ড রায়টস্' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা—দেশপ্রেমিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করল। ১৮৭৫ সালের দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৪৭৪ খানি। এই সংখ্যা থেকেই সংবাদ-পত্রের প্রভাব বোঝা যাচ্ছে।

ক্রমশ এই রাজনৈতিক চেতনা যতই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হতে থাকল ততই একটি নতুন মধ্যবিত্ত-প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকল।

এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য ১৮৭৫ সালে "ইণ্ডিয়ান লীগ" (১৮৭৫) প্রতিষ্ঠা করা হল। এই সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এই সভা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এর পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও

আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে 'ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন' বা 'ভারত-সভা' (১৮৭৬) স্থাপিত হল।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন থাকা সত্ত্বেও এই সভার প্রয়োজন কি, এই প্রশ্নের উত্তরে উপরোক্ত সভার জনৈক উদ্যোক্তা লিখলেন—

"ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষের কর্ম নয়। অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে একটি উপযুক্ত সভা থাকা আবশ্যক।"

নব প্রতিষ্ঠিত ভারত-সভার উদ্দেশ্য হিসাবে উল্লেখ করা হল—

১। বলিষ্ঠ জনমত গঠন

২। সাধারণ রাজনৈতিক স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের একত্রীকরণ,

৩। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্যবোধ গঠন,

৪। বিভিন্ন আন্দোলনে গণ-সংযোগ প্রতিষ্ঠা।

ক্রমশ শুধু কথায় নয় কাজেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সাহসের পরিচয় পাওয়া গেল। ১৮৭৬ সালে টাউন হলে ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুকের সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন হয়েছিল। এই সভায় উপস্থিত হয়ে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর নয় জন সহকর্মী ভাইসরয়ের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে চান। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব উত্থাপন করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। (২)

এই ঘটনাটি উপলক্ষ ক'রে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' মন্তব্য করেছিল—

"We only wish there were many such tens in our country, the political significance of the action of the ten can scarcely be over-rated."

মধ্যবিত্তের মধ্যে এই রাজনৈতিক আলোড়ন বাঙলা দেশে আরম্ভ হলেও ক্রমশ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। ইংরেজী সংবাদপত্র, রাস্তা ঘাটের উন্নতি, টেলিগ্রাফ, পোষ্ট অফিস, রেলপথ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ফলে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধা হল। ১৮৭৭ সালে সুরেন্দ্রনাথ সর্ব-ভারতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভারত সভার পক্ষ থেকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (বর্তমান উত্তর প্রদেশ), পাঞ্জাব ও বোম্বাই প্রদেশ ভ্রমণ করলেন

এবং সারা ভারতব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা সর্বত্র প্রচার করলেন।

মধ্যবিত্ত-প্রধান এই আন্দোলনটি মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে জাতির বিভিন্ন বিভিন্ন অংশকে জাগরিত করার সংকল্প গ্রহণ করল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু ছাত্রদের আন্দোলনে টেনে আনার উদ্দেশ্যে 'ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৮৮৩ সালে কলিকাতায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় সুরেন্দ্রনাথ উকিলদের স্মরণ করিয়ে দিলেন তাদের জাতীয় দায়িত্বের কথা। (৩)

"উকিলদের সরকারী কৃপার প্রতি চেয়ে থাকার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তাঁদের অধিকারের বলে তাঁদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি ও সামর্থ্য আছে। সব দেশেই উকিলেরা দেশের সব রকম সংগ্রামে সব চেয়ে অগ্রণী।"

তিনি আরও বললেন—"তারপরে যাঁরা এগিয়ে আসতে পারেন তাঁরা হলেন দোকানদার ও কৃষক। দোকানীরা কারুর উপর নির্ভরশীল নয়, তারা স্বাধীন। কাজেই তদের নিয়ে 'দোকানী সমিতি' গঠন করা যাবে না কেন? কৃষকদের নিয়েই বা 'কৃষক সমিতি' গঠন করায় বাধা কোথায়? বস্তুত জনসাধারণকে (masses) রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে আসার দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁরা সর্বপ্রথম সচেতন হলেন।

'ভারত-সভা'র উদ্যোগে স্থানে স্থানে 'রায়ত-সভার' প্রতিষ্ঠা হল। এই রায়ত-সভা সম্পর্কে কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন—

"ভারত সভার সম্পাদক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী আমাকে সঙ্গে লইয়া নদীয়া, হুগলী ও হাওড়া জেলার নানা স্থানে গমন করিয়া 'প্রজা সভা'র আয়োজন করিতেন। আনন্দমোহনবাবু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন কোন সভায় গমন করিয়া জমিদার-ভয়ে ভীত প্রজাগণের মনে সাহসের সঞ্চার করিয়া দিতেন। নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জের সভায় প্রায় বিশ হাজার প্রজা সমবেত হইয়াছিল। কোন কোন প্রজা জমিদারের ভীষণ অত্যাচার-কাহিনী সভাস্থলে বর্ণনা করিয়া সমাগত লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। পোড়াদহের সভায় প্রায় দশ হাজার লোক, কুষ্টিয়ার সভায় প্রায় পনর হাজার লোক যোগদান করিয়াছিল। তারকেশ্বরে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভাবাজারের রাজকুমার নীলকৃষ্ণ,

বিনয়কৃষ্ণ প্রভৃতি কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ লোক তারকেশ্বরে গমন করিয়া জমিদারের অত্যাচার কাহিনী প্রজার মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই সকল আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেণ্ট প্রজাসত্ব আইনের এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।” (৪)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন দাস সম্পাদিত ‘ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনয়ন’-এ এই রায়ত সভাগুলিকে কখনও কখনও ‘Rent Union’ও বলা হয়েছে। ঐ পত্রিকায় বলা হয়েছে—এই ‘রেণ্ট ইউনিয়ন’গুলির লক্ষ্য হল—কৃষকদের ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন। এই সমিতিগুলি খাজনা-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি অবশ্যই আলোচনা করবে, তবে এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে অহেতুক গুরুত্ব দেওয়া হবে না। জমিদারদের অত্যাচারের খবর পেলে এই সমিতি-গুলি আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে তা নিরসন করার চেষ্টা করবে। (৫)

শুধু কৃষক নয়, ‘ভারত-সভা’ কুলিদের নিয়েও আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হল। ‘ভারতসভার’ পক্ষ থেকে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী আসামে গেলেন ও কুলিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে আনলেন। ১৮৫৯ সালে ৩ আইনের বলে চা-বাগানের মালিকেরা কুলিদের উপরে যে অত্যাচার আরম্ভ করেছিল, দ্বারকা-নাথ তার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল কুলিদের সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। কৃষক ও কুলিদের প্রতি সহানুভূতি জানালেও ‘ভারতসভা’ আন্দোলনের মূল আবেদন ছিল মধ্যবিত্তের কাছে। তাই মধ্য-বিত্তের সমস্যাবলী নিয়েই এই আন্দোলনের হয়েছিল প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

লর্ড লিটন এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ‘রাজদ্রোহ প্রচারের আড্ডা’ বলে অভিহিত করায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশেষ বিরাগভাজন হলেন। তাছাড়া, এই সময়ে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীর বয়স উনিশ বছরে ধার্য করা হল। ফলে ভারতবাসীর পক্ষে এই পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করার কোনোই উপায় রইল না। এই সঙ্গে লর্ড লিটন অস্ত্র আইন, সংবাদপত্র আইন, তুলা-আমদানি-শুল্ক রহিত আইন প্রভৃতি পাশ করে মধ্যবিত্তের অসন্তোষ অধিকতর বৃদ্ধি করলেন।

লর্ড রিপনের আমলে আইন-সচিব ইলবার্ট দেশীয় বিচারকদের শ্বেতাঙ্গ আসামীদের বিচার করবার যে অন্তরায় ছিল, তা রহিত করে একটি বিল

উত্থাপন করেন। এইটি 'ইলবার্ট বিল' নামে পরিচিত। ভারতসভা এই বিলের সমর্থনে আন্দোলন আরম্ভ করে। অপর পক্ষে স্থানীয় ইংরেজরা এই বিলের বিপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করে। ইংরেজ পক্ষেরই শেষ পর্যন্ত জয় হল। ঘটনাটি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে গভীর অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়াল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। তিনি ইংরেজের কাছে 'রাজদ্রোহী' বলে পরিচিত হলেন। জাষ্টিস নরিস্‌কে অবমাননা করার অজুহাতে সুরেন্দ্রনাথকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

প্রধানত চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তের দাবিগুলি সম্বলিত করে 'ভারত-সভা' ভারত ব্যাপী একটি আন্দোলন গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮৩ খ্রীঃ ২৮শে, ২৯শে এবং ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে কলকাতায় 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' নামে একটি সম্মেলন ডাকা হল। এই সম্মেলনে বাংলার প্রায় প্রত্যেকটি জেলা, এমন কি বাঙলার বাইরে থেকেও প্রতিনিধিরা এলেন। এই সম্মেলনে শিল্প ও কারুবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সিভিল সার্ভিস, অস্ত্রআইন নিরোধ, বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রস্তাব পাশ হল। ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ন্যাশনাল কনফারেন্সের' দ্বিতীয় অধিবেশন আহ্বান করা হল। তবে এই বছরেই বোম্বাই শহরে 'কংগ্রেসের' প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। কংগ্রেসের জন্মের পরে ন্যাশনাল কনফারেন্সের ভূমিকাটি শেষ হল। ন্যাশনাল কনফারেন্স কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে গেল।

কংগ্রেসের জন্ম

অবশ্য প্রথমেই মনে রাখার দরকার যে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল ইংরেজ শাসনের শত্রু হিসাবে নয়, বরং মিত্র হিসাবেই। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের নির্দেশে ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হিউমের উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রথম স্থাপনা হয়েছিল। কৃষক ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, তার চেয়ে বড় কথা এই দুই শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ, ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। আগেই বলেছি উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে হিউমের সুযোগ হয়েছিল অনেক গুপ্ত ফাইল অনুসন্ধান করার, যার

ফলে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে প্রায় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের মত আর একটি বিদ্রোহেব সম্ভাবনা দানা বেঁধে উঠছে।

এই অবস্থায় সরকারের আশু স্বার্থেই প্রয়োজন হয়েছিল কৃষক ও ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দেওয়া। কৃষক বিদ্রোহের পথ ছিল হিংসার পথ। মধ্যবিত্তদের এই পথের সীমানা থেকে সরিয়ে এনে তাদের নিয়ে ইংরেজ শাসনের অনুগামী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলাই ছিল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি লিখলেন। এই উদ্দেশ্যে লর্ড ডাফরিন আশীর্বাদ করে বললেন—"কংগ্রেস হবে ভারতের সাম্রাজ্ঞীর স্থায়ী বিরোধী দল।" এই দিক থেকে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্যে বোম্বে প্রদেশের গভর্ণরকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু ধুরন্ধর ভাইসরয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সম্রাজ্ঞী-বিরোধী দলের অভিনয়ের কাজটা ভাল জমবে না বলে এই কাজে উৎসাহ দেন নেই। তাই শেষ পর্যন্ত বাঙলার উকিলদের মধ্যে প্রধান, ধনী বুদ্ধি-জীবীদের প্রতিনিধি ডব্লুউ সি ব্যানার্জীকে সভাপতিপদে বরণ করা হল। এই অধিবেশনে দর্শক হিসাবে উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মচারীরাও উপস্থিত রইলেন। কাজেই আনুগত্য প্রদর্শনের ঘটার আর কিছুই বাকী রইল না।

সভাপতির অভিভাষণেও ইংরেজ শাসনের, বিশেষ করে লর্ড রিপনের আমলের ভূয়সী প্রশংসা করা হল। তবে হিউম ডাফরিনের উদ্দশ্য যাই থাক না কেন, ধনী বুদ্ধিজীবী নেতারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে চাইলেন নিজেদের শ্রেণীগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসল বোম্বাই শহরে, যেখানে দেশীয় পুঁজিপতিদের ছিল মূল আড্ডা। এই কংগ্রেসে ডব্লু সি ব্যানার্জী, ফিরোজ শাহ্ মেহতা, দাদাভাই নওরোজ, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি যাঁরাই নেতৃত্ব করলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ধনী বুদ্ধিজীবী। এই ধনী বুদ্ধিজীবীদের সঞ্চিত পুঁজি গচ্ছিত ছিল সরকারী কাগজে, ব্যাঙ্কে, শিল্পে, শেয়ারে। প্রকৃত পক্ষে এই বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি। এঁরা অনেকেই ছিলেন নিজে জমিদার, অথবা উচ্চপদস্থ চাকুরে, অথবা সরকারী কাগজে পুঁজি নিয়োগকারী, কাজেই সরকারের অনুগ্রহের উপরে অনেকটা নির্ভরশীল।

আবার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে ভারতের শিল্পোন্নয়নের রাস্তাটি যে-ভাবে বন্ধ করে রেখেছিল তাতেও তাঁরা ছিলেন বিক্ষুব্ধ। এই অবস্থায় উপরোক্ত ধনী বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে দু'দিক বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা চলল। এক দিকে সরকারের প্রতি আনুগত্য আর একদিকে সরকারের মৃদু সমালোচনা। বিদেশী ব্রিটিশের আওতায় যতটুকু অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করা যায় ততটুকুই 'দেশের পক্ষে মঙ্গল'—এই ছিল প্রথম যুগের কংগ্রেস নেতাদের হিসাব।

এই হিসাব অনুযায়ীই কংগ্রেসের কাজকর্ম পরিচালিত হয়েছিল প্রথম দশ বছর।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনগুলিতে দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, জমিদারশ্রেণী আর শিক্ষিত ধনী বুদ্ধিজীবী—এই তিনের স্বার্থে প্রস্তাবাদি গৃহীত হল।

প্রস্তাব নেওয়া হল—তুলার উপর শুল্ক বসানো অসঙ্গত; এই শুল্ক ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ রক্ষা করছে, আর ভারতীয় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সম্ভাবনা রোধ করছে। বলাই বাহুল্য, ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল।

কংগ্রেস আরও প্রস্তাব নিল—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সারা ভারতে প্রবর্তন করা হোক। এই প্রস্তাবটি ছিল জমিদারদের স্বার্থে। সাধারণভাবে ধনী বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থের প্রতিও যথেষ্ট নজর দেওয়া হল। আয়করের ভিত্তিটি পরিবর্তন করার দাবি উঠল। ভারত শাসনে বুদ্ধিজীবীদের অধিকতর অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হোক—এই দাবিও বার বার উঠল। এই উদ্দেশ্যে দাবি উঠল —আইন সভার আয়তন ও ক্ষমতা বাড়ানো হোক। ভারতে ও ইংলণ্ডে একই সঙ্গে সরকারী চাকুরিতে নিয়োগের জন্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হোক্, কমিশনড্ র‍্যাঙ্কে ভারতবাসীর প্রবেশের অধিকার দেওয়া হোক্। শিক্ষা প্রসারের আর সামরিক ব্যয় বরাদ্দ হ্রাসের দাবি করেও এই অধিবেশনগুলিতে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল।

সংগ্রাম নয়, আবেদন-নিবেদন—এই ছিল এই যুগে কংগ্রেস নেতাদের দাবি আদায়ের পথ।

স্বদেশী আন্দোলন

এইভাবে কংগ্রেস নেতারা আবেদন-নিবেদনের পথে আন্দোলনের গতি পরিচালিত করার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু দেশের অবস্থা আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির অনুকূল ছিল না।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পরে বোম্বাই প্রদেশে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবে, আর ম্যালেরিয়া, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের ব্যাপক আক্রমণে দেশের লোকের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এই সময়ে বাংলা দেশেও বেকার সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠায় মধ্যবিত্তের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল। ক্রমশ কংগ্রেসের ভিতরে মধ্যবিত্তের এই অসন্তোষ ধ্বনিত হতে লাগল।

১৮৮৭ সালে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে বরিশালের স্থানীয় নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত একটি আবেদনপত্র পেশ করলেন। এই আবেদনটিতে ৪৫,০০০ হাজার স্থানীয় লোক স্বাক্ষর করেছিলেন। (৬)

১৮৯০ সালে 'সম্মতি আইন' উপলক্ষ ক'রে বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল। (৭) রক্ষণশীল দৃষ্টি থেকে সমাজ সংস্কারের বিরোধিতা—এইটিই এই আন্দোলনের বহিরাবরণ হলেও এই আন্দোলনকে উপলক্ষ করে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল। সেই জন্যেই এই আন্দোলনের পক্ষ থেকে কতকগুলি রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। ইংরেজ শাসন দেশের শত্রু—এইটি প্রচার করায় এই আন্দোলনের মুখপত্র 'বঙ্গবাসী'-র মালিক ও সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের ফলে একটি ছোট রেলওয়ে, কয়েকটি কারখানা এবং শিল্পের পুনরুজ্জীবনের কাজ কিছুটা অগ্রসর হল।

বোম্বাই প্রদেশে মহারাষ্ট্রে ১৮৯০ সালের পরে অনুরূপ ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দেলন আরম্ভ হল। গুপ্ত সমিতি ছাড়াও 'গণপতি মেলা' 'শিবাজী উৎসব প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এক বলিষ্ঠ গণআন্দোলন আরম্ভ হল। এই আন্দোলন খর্ব করার জন্যে সরকার নিষ্ঠুর দমন-নীতির আশ্রয় নিল। তিলক এর বিরুদ্ধে মত জ্ঞাপন করায় রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত ও দুবছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

ইংরেজ শাসকদের খড়্গ প্রথম থেকেই উদ্যত ছিল বাঙলার উপর। তাছাড়া কার্জন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেন এবং শিক্ষা সংকোচেরও চেষ্টা করলেন। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির স্বাধীনতা খর্ব করা হল। ১৮৯১ সাল থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বাঙলা বিভাগের ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছিল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের আমলে বঙ্গ বিভাগের এই ষড়-যন্ত্র কার্যকরী করা হল।

ফলে সারা বাঙলা দেশ বিক্ষোভে ভেঙে পড়ল। এই বিক্ষোভ প্রকাশের প্রয়োজনে নতুন বলিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণেরও আবশ্যক হল। এই কর্ম্মসূচীতে প্রাধান্য দেওয়া হল তিনটি বিষয়ে—(১) বয়কট, (২) স্বদেশী, (৩) জাতীয় শিক্ষা।

ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে বিলাতী দ্রব্য বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' লিখলেন—

"স্বদেশে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইংলণ্ডের সে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিব না। স্তব-স্তুতি অনেক হইয়াছে, আর নয়। এখন আইস আমরা নিজের পদভরে দণ্ডায়মান হই।"

বয়কট আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে স্বদেশী শিল্প চালু করার জন্যেও চেষ্টা চলল। এই সময়ে কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী, সাবানের ফ্যাক্টরী, চামড়ার কারখানা, ওষুধের কারখানা প্রভৃতি স্বদেশী মূলধনে গড়ে উঠতে লাগল। এই স্বদেশী মনোভাবের তাগিদে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে সরলা দেবী চৌধুরাণী "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার" নামে স্বদেশী দ্রব্যের এক আড়ৎ খুললেন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত "অনুশীলন সমিতির" তরুণেরা "বেঙ্গল ষ্টোর" ও যোগেশ চৌধুরী "ইণ্ডিয়ান ষ্টোর" নামে স্বদেশী দ্রব্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করলেন।

এই আন্দোলনে বাঙলার ছাত্রসমাজ সব চেয়ে এগিয়ে এল। ছাত্র আন্দোলনের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে কুখ্যাত কারলাইল সার্কুলার জারি করা হল। ফলে ছাত্র বিক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। সরকারী স্কুল কলেজ বর্জনের রব উঠল। ব্রিটিশ আদালত বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। সারা বাঙলায় প্রতিষ্ঠা হল বহু জাতীয় বিদ্যালয়, এমন কি একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত।

সাহিত্যে ও সঙ্গীতেও এই স্বদেশী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেল।

রাজদ্রোহের দায়ে তিলক অভিযুক্ত হলে রবীন্দ্রনাথ তিলকের মোকদ্দমায় সাহায্যের জন্যে সাধারণের নিকট আবেদন জানালেন (১৮৯৮)। বাঙলায় কার্জনী শাসন ও মহারাষ্ট্রে নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্বাসন উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে এক প্রবন্ধ রচনা করলেন। "শিবাজী উৎসব" কবিতাটি লিখে তিনি 'বীরপূজা' অনুষ্ঠানটিকে উৎসাহিত করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারতে' প্রচারিত সামাজিক আদর্শ অনুসরণ করে এক বলিষ্ঠ জাতীয়তার আদর্শও প্রসারিত হল।

রবীন্দ্রনাথ ও রজনীকান্তের গান বাঙলার ছাত্র ও যুবকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। রজনীকান্ত উদাত্ত স্বরে গেয়ে উঠলেন—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই," রবীন্দ্রনাথের "বাঙলার মাটি, বাঙলার জল" হয়ে উঠল সব চেয়ে জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীত।

এই সঙ্গে চলতে লাগল শক্তিমন্ত্রেরও উপাসনা। সরলা দেবী 'বীরাষ্টমী' মেলার আয়োজন করে শক্তি চর্চার উদ্বোধন করলেন। 'ভারতী' পত্রিকায় 'বিদেশী ঘুঁষি বনাম দেশী কীল' নামে এক প্রবন্ধে যে সব ক্ষেত্রে সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীরা যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পেরেছিল তার বিবরণ বেরুতে থাকল।

এইভাবেই বাঙলা দেশে ১৯০৩ থেকে ১৯১০ এই ক'বছর ধরে একটি গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত হল।

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ২০০০ হাজারটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। (৮)

এই সভাগুলিতে মুসলমানেরাও যোগ দিয়েছিল। ১৯০৫ সালে টাউন হলে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় ভাইসরয়ের উপর কার্যত একটি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। ঐ বছরেই ১৬ই অক্টোবর বাঙলার মৈত্রীর নিদর্শন স্বরূপ রাখী বন্ধন দিবস পালিত হয়েছিল।

মহারাষ্ট্র ও বাঙলার এই গণ-আন্দোলনটি ইওরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের গণ-আন্দোলন থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছিল।

আয়র্ল্যাণ্ডের আন্দোলন, নবীন তুরস্ক আন্দোলন, পারস্যে মজলিশ প্রতিষ্ঠা, জাপানের জাতীয় জাগরণ, চীনের বক্সার বিদ্রোহ—এইগুলি যুবক দলের মনে নতুন সাহস সঞ্চার করেছিল।

স্বদেশী আন্দোলন ও কংগ্রেস

ক্রমশ কংগ্রেসের ভিতরেও এই স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হল। কংগ্রেসের প্রাচীন নেতারা রাজনৈতিক সংস্কার ও আবেদন-নিবেদনের পথ ছাড়তে নারাজ। অপর পক্ষে যুবকদল (এই দলের প্রধান নেতা ছিলেন তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি) এই নতুন কর্মসূচী গ্রহণের পক্ষপাতী ফলে কংগ্রেসের ভিতরে

দুটি ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটি ধনিক-প্রভাবিত রক্ষণশীল সংস্কারবাদী ধারা অথবা লিবারেল ধারা আর একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রভাবিত প্রগতিশীল জাতীয়তা-বাদী ধারা অথবা গণতান্ত্রিক ধারা। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী প্রাচীন দলের নাম হল 'নরমপন্থী' আর নবীন দলের নাম হল 'চরমপন্থী'। দুটি ধারার লক্ষ্যে, কর্মসূচীতে, বৈদেশিক নীতিতে সর্বক্ষেত্রেই দেখা গেল বিরাট পার্থক্য।

প্রাচীন নেতারা বললেন—কংগ্রেসের লক্ষ্য হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন অর্জন। নবীনেরা বললেন—'স্বরাজ' ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার। ১৮৯৫ সালে মহারাষ্ট্রে শিবাজী উৎসবে তিলক সর্বপ্রথম এই 'স্বরাজ' কথাটি ব্যবহার করেন। তারপর থেকে নবীন দল এই 'স্বরাজ' কথাটির ব্যবহার করতে থাকলেন। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনের বদলে এখন থেকে 'স্বরাজের' লক্ষ্যটিই নবীন দল গ্রহণ করলেন।

প্রাচীনপন্থী নেতারা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গণসংযোগ প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। প্রাচীনপন্থীদের আবেদন-নিবেদনের পথে শাসন-সংস্কারের দাবি আর নবীনপন্থীদের গণআন্দোলনের পথে স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কটের দাবি—বলাই বাহুল্য, এই দুই ধারার মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য ছিল তা কোনো দিনই মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নেই।

যদিও জনমতের চাপে কংগ্রেসের প্রাচীন নেতারা ১৯০৪ সালের বেনারস অধিবেশনে 'বয়কটকে' একটি রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি দান করলেন, তবুও স্বদেশী আন্দোলনের মূল দাবিগুলি স্বীকার করতে তাঁরা গররাজি ছিলেন। ১৯০৬ সালে দাদাভাই নওরোজি কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে ঘোষণা করলেন স্বরাজ আর স্বায়ত্ত-শাসন সম-অর্থ বাচক। কিন্তু ইংরেজের দমন-নীতি এতই বেড়ে গেল যে নরমপন্থীদের পক্ষেও নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা আর সম্ভব হল না। ১৯০৬ সালে এপ্রিল মাসে বরিশালে যে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল তা সরকার জোর করে ভেঙে দেয়। এই অবস্থায় কংগ্রেস পরবর্তী কলকাতা অধিবেশনে বঙ্গ-ভঙ্গ নিরোধের জন্যে বয়কট অস্ত্র প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

কিন্তু নরমপন্থী-চরমপন্থী বিরোধ মিটল না। সুরাট কংগ্রেসে এই দুই দলের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ দেখা দিল। প্রাচীনপন্থীদের রক্ষণশীলতার প্রতিবাদে সুরাটের পর থেকে কিছুদিন চরমপন্থীরা কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াল। এই সময়েই প্রাচীন নেতারা ব্যস্তসমস্ত হয়ে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচনা করলেন।

মাদ্রাজে কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হল—নিয়মতন্ত্রের পথে লক্ষ্যে (ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন) পৌঁছানোই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে কংগ্রেস মিণ্টো-মার্লে শাসন-সংস্কারের অনুমোদন করল।

কংগ্রেস যখন এইভাবে সংস্কারবাদের পথে আন্দোলনকে পরিচালিত করতে চেষ্টা করছিল, ঠিক সেই সময়ে ইংরেজ সুযোগ বুঝে আঘাত হানল চরমপন্থীদের ওপর। পাঞ্জাব থেকে লালা লাজপত রায়কে নির্বাসিত করা হল। বাংলায় অরবিন্দের রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল। 'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' নামক একটি প্রবন্ধের জন্যে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করা হল। তাছাড়া, নেতৃস্থানীয় আরও ন'জন ব্যক্তিকে বিনাবিচারে আটক রাখা হল। কতকগুলি পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হল, কতকগুলি সমিতি বে-আইনী ঘোষণা করা হল।

১৯০৫-১১ সালের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করল। বস্তুত এইটিই ভারতে প্রমুখ জাতীয় গণ-আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীরা। এই আন্দোলন একটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক কর্মসূচী দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিল। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সাধনের জন্যেও এই আন্দোলন চেষ্টা করেছিল।

১৯০৬ সালে মৌলবী মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে 'দি মুসলমান' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করা হল। এই পত্রিকার সম্পাদকেরা সাম্প্রদায়িকতা বর্জনের নির্দেশ দিলেন। তাঁরা বললেন—

"It is ours economical and political situation that makes all of us Indians and so far as we have to live our practical lives, we are Indians first and Mahomedans afterwards."(৯)—

ঐ পত্রিকাটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়কে যোগদানের জন্যে অনুরোধ জানাল। ঐ পত্রিকায় প্রকাশ হল যে ফরিদপুর জেলায় ১০০০ মুসলমান, জমিদার, তালুকদার, জোতদার, ব্যবসাদার ও অন্যান্যে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আবেদন পত্র পেশ করেছে। (১০) মালদহতে একটি স্বদেশী সভার

বিবরণও প্রকাশিত হল। তাতে বলা হয়েছে দু'হাজার লোকের এই সভায় অধেক যোগদানকারী ছিল মুসলমান। এই সভা 'অন্নরক্ষা'ও 'ধর্মগোলা' এই দুই বিষয়ে দুটি প্রস্তাবও নিয়েছিল। (১১)

হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর আরও একটি নিদর্শন রয়েছে এই পত্রিকার পাতায়। এই সময়ে 'ষ্টার থিয়েটারে' "রাজসিংহ" অভিনয় চলছিল। এই নাটকে মুসলিম বিরোধী কিছু কিছু সংলাপ ছিল। মুসলমান সম্প্রদায় আপত্তি জানালে এই অভিনয়টি বন্ধ করে অন্য একটি বইয়ের অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই জন্যে মুসলমান সমাজ 'ষ্টার থিয়েটারের' কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। (১২)

শুধু হিন্দু-মুসলিম ঐক্য নয়, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক দাবির ব্যাপারেও এই নবীনেরা পূর্ণাঙ্গ এক কর্মসূচী উপস্থিত করলেন।

তিলক মৃত্যুর আগে কাউন্সিলের নির্বাচন উপলক্ষে যে কর্মসূচীটি প্রণয়ন করেন বোধহয় সেইটিতেই চরমপন্থীদের সব চেয়ে পরিণত বুদ্ধির প্রকাশ। সেই কর্মসূচীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই—

(১) জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

(২) হিন্দু মুসলিম ঐক্য

(৩) ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন

(৪) জাতীয় ঐক্যসাধনের জন্যে সর্বভারতীয় একটি ভাষাগত মাধ্যম স্থির করা।

(৫) মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা

(৬) বিনা বেতনে বাধ্যতামুলক শিক্ষা প্রবর্তন

(৭) স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে নির্বাচনের অধিকার প্রসারিত করা

(৮) শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির (শ্রমিক ও কৃষক) জন্যে ন্যায্য মজুরী

(৯) রেলপথ জাতীয়করণ

(১০) দেশীয় অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত একটি 'citizen army' গঠন।

উপরোক্ত কর্মসূচীটি পরবর্তী যুগে কংগ্রেস মোটামুটি মেনে নিয়েছিল। এই কর্মসূচীটিই ভারতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাথমিক কর্মসূচী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলন

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধ বাধার পর থেকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকল।

ভারতের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা যুদ্ধের অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতে চেষ্টা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্রিটেনের যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। আশা ছিল এইভাবে ব্রিটেনকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করলে হয়তো পুরস্কার মিলবে। হয়তো ভারত স্বায়ত্ত শাসনের পথে অগ্রসর হতে পারবে ইংরেজের অনুগ্রহে।

কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের আশাভঙ্গ হতে বেশী দেরী হল না। ইংরেজের কাছ থেকে হৃদয় পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

বরং যুদ্ধের মধ্যে দেশের জনসাধারণকে চরম দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে হল। যুদ্ধাবস্থার দরুণ জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য হল, জীবনযাত্রার মান দ্রুত অবনতির দিকে যেতে থাকল।

জনতার সব চেয়ে গরীব অংশ অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনে দেখা দিল ঘোর অর্থনৈতিক বিপর্যয়। শ্রমিকেরা ঘন ঘন ষ্ট্রাইক করতে লাগল, কৃষকেরাও মরীয়া হয়ে খাজনা বন্ধ করার কথা ভাবতে লাগল। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীরা সন্ত্রাসবাদের পথে পা বাড়াল। সারা দেশ যেন বারুদের স্তূপে পরিণত হল।

এই অবস্থায় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতাদের ব্রিটেনের প্রতি ভরসার কথা দেশের লোকের কাছে উপহাসের মত শোনাল। কংগ্রেস নেতারা যে সহানুভূতি আশা করেছিল ব্রিটেনের কাছে তা মিলল না। জাতীয় পরিস্থিতিও ক্রমশ তাদের হাতের বাইরে চলে যাওয়ার লক্ষণ দেখা দিল।

এই অবস্থায় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতারা অনুভব করলেন নতুন কর্মপন্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা।

এই নতুন কর্মপন্থার প্রবর্তক হিসাবে এই সময়ে ভারতের রাজনীতিতে আবির্ভাব হল এই প্রথম মহাত্মা গান্ধীর।

মহাত্মা গান্ধী ১৯১৪ সালে আফ্রিকা থেকে ভারতে এলেন এবং ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায়

অধিকার বিহীন ভারতীয়দের পক্ষ থেকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন।

এ-দেশে ফেরার পরে এই অস্ত্রটি সর্বপ্রথম তিনি ব্যবহার করলেন বিহারের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত চম্পারণের নীল চাষীদের সংগ্রামে।

এই সময়ে চম্পারণে একদল ইওরোপীয় নীলকর বাস করত। নীল চাষীদের ওপর তাদের অত্যাচারের সীমা ছিল না। নীলকরেরা নীল চাষীদের প্রতি তাদের ভূমিদাসের মত ব্যবহার করত। নীল চাষীরা মরীয়া হয়ে এই অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতির পথ খুঁজতে লাগল। গান্ধীজী নীল চাষীদের নিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করলেন। গান্ধীজী চম্পারণে প্রবেশ করবেন (এপ্রিল ১৯১৭) এমন সময়ে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করল। গান্ধীজী এই নির্দেশ অমান্য করলেন। সরকার শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর নির্ভীকতার কাছে নতি স্বীকার করল। তাঁর বিরুদ্ধে আইন ভাঙ্গার অপরাধে যে মামলা চলছিল সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করা হল। কুড়ি হাজার কৃষক তাদের অভিযোগ জানিয়ে বিবৃতি দিল। এই আন্দোলনের চাপে সরকার বিষয়টি অনুসন্ধান করতে রাজি হল এবং পরিশেষে বিষয়টি তদন্ত করার জন্যে একটি অনুসন্ধান সমিতি নিয়োগ করা হল। এই সমিতির অনুমোদনক্রমে শেষ পর্যন্ত এই পীড়নমূলক ব্যবস্থাটি রহিত করা হয়েছিল।

গান্ধীজী সত্যাগ্রহের অস্ত্রটি ব্যবহার করলেন পুনর্বার গুজরাটে। এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কায়রা জেলায় কৃষকদের অবস্থা দুঃসহনীয় হয়ে ওঠে। যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক সংকট ত ছিলই। তাছাড়া, এই অঞ্চলে এইবার অজন্মা হওয়ার দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এই অবস্থায় কৃষকদের পক্ষে রাজস্ব দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। কৃষকেরা নিয়মতন্ত্রের পথে রাজস্ব মকুব করার জন্যে সরকারের কাছে বহু আবেদন করল, কিন্তু ফল হল না। শেষে তাদের গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহের আশ্রয় নিতে হল। কৃষকেরা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করল। এই অপরাধে কয়েকজন কৃষককে গ্রেপ্তার করা হল এবং জেলে পাঠানো হল। এক্ষেত্রেও সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আন্দোলনে সত্যাগ্রহ পন্থাটি গৃহীত হল সত্যি, কিন্তু তাই বলে কংগ্রেসের লক্ষ্য বা ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার সুর পরিবর্তিত

হল না। আগের মতই কংগ্রেস নেতারা এক সঙ্গে দুই সুরে কথা বলতে লাগলেন। একদিকে ভারতীয় ধনবাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তাঁরা ব্রিটিশের বিরোধিতার পথ ধরলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা কৃষক ও মজুরদের সাহায্য পাবার জন্যে তাদের দাবি নিয়েও একটু আধটু আন্দোলন আরম্ভ করলেন। অন্যদিকে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার জন্যে দরজা খোলা রাখা হল। যুদ্ধ শেষে কংগ্রেস নেতারা ব্রিটিশ রাজকে অভিনন্দন জানালেন যুদ্ধজয়ের জন্যে এবং এই যুদ্ধটিকে মুক্তি ও স্বাধীনতার যুদ্ধ বলেই ঘোষণা করলেন। (১৫)

কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের দিক থেকে আপোষের কোনো চেষ্টা না থাকায় ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে পুনরায় বিরোধিতার পথ ধরতে হল।

এই সময়ে 'মণ্টেগু সংস্কার' ঘোষণা করা হল। মণ্টেগু কংগ্রেসের কোনো দাবিই মানলেন না। কাজেই এই সংস্কারকে কংগ্রেস 'নৈরাশ্যজনক' বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হল।

এই সময়ে ভারতের একদল যুবক জার্মানির সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে এই অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার 'রাওলাত আইন' নামে কতকগুলি দমন মূলক আইন পাশ করল। কংগ্রেস এই আইনগুলোর বিরোধিতা করার সংকল্প গ্রহণ করল।

১৯১৯ সালের ৩রা মার্চ তারিখে 'রাওলাত আইন' পাশ হল। গান্ধীজীও সঙ্গে সঙ্গেই এই আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ৬ই এপ্রিল তারিখে সারা ভারতে হরতাল পালন করা স্থির হল। ঐদিন ভারত জুড়ে উপবাস, উপাসনা, এবং সভা করা স্থির হল। ৬ই এপ্রিল সারা ভারত জুড়ে হরতাল প্রতিপালিত হল। হিন্দু ও মুসলমান একযোগে সভা সমিতিতে মিলিত হল, প্রতিবাদ জানাল। গোটা ভারতে আন্দোলনের নেশা লাগল।

ব্রিটিশ সরকারও প্রচণ্ড দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করল। এই সময়েই অনুষ্ঠিত হল নিষ্ঠুর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারা দেশ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল। এই অবস্থায় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতাদের পক্ষে সংগ্রামী কর্মপন্থা অবলম্বন ছাড়া আর উপায় রইল না।

অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিল কংগ্রেস। সঙ্গে সঙ্গে হুশিয়ার করে

দেওয়া হল দেশবাসীকে—এই অসহযোগ আন্দোলন হবে অহিংস আন্দোলন। (১৬)

কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অহিংসার চৌহদ্দীর মধ্যে আন্দোলনকে বেঁধে রাখা সম্ভব হল না। ৩০শে মার্চ দিল্লীতে রেলওয়ে ষ্টেশনে পিকেটিং করা হল। পিকেটিং রত দুজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হল। জনতা যুবকদ্বয়ের মুক্তির দাবি করল। পুলিস ও মিলিটারী জনতার উপর গুলি ছুঁড়ল। কয়েকজন লোক গুলিতে নিহত হল।

৯ই এপ্রিল সত্যাগ্রহের প্রস্তুতিকারীদের মধ্যে দুজনকে পাঞ্জাব থেকে নির্বাসিত করা হল। এই আদেশের প্রতিবাদে অমৃতসরে দারুণ হাঙ্গামা আরম্ভ হল। কতকগুলি ব্যাঙ্ক পুড়িয়ে দেওয়া হল এবং ব্যাঙ্কের টাকাকড়ি লুণ্ঠন করা হল। অনেক ইওরোপীয়কে প্রহার করা হল, কয়েকজনকে হত্যা করা হল। কয়েকটি সরকারী আপিস ভেঙে তচনচ করে দেওয়া হল। মিলিটারী এসে শহর ঘিরে ফেলল। শহরে সামরিক আইন জারি হল। (১৭)

যখন সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি চলছিল তখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অপূর্ব মিলনক্ষেত্রও তৈরি হয়েছিল। এই সময়ে ভারতের মুসলমানের ইংরেজের ওপর খুব বিক্ষুব্ধ ছিল।

মুসলমানদের বিক্ষোভের কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ এই সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরেজের প্রতিপক্ষ ছিল তুরস্ক। তুরস্কের প্রতি ভারতীয় মুসলমান সমাজের ছিল সহানুভূতি। এই সহানুভূতি থেকে তাদের মধ্যে ব্রিটিশ বিক্ষোভ জাগতে আরম্ভ করে। পরে এই বিক্ষোভ থেকেই খিলাফৎ আন্দোলনের সূত্রপাত।

১৯২০ সালে খিলাফৎ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন—এই দুটি মিলিত হল। এই দুটি আন্দোলনের মিলনে জাতীয় আন্দোলনে এক অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চারিত হল। ১লা আগস্ট তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করা হল।

কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করে যে প্রস্তাব গ্রহণ করল তাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হল—

(১) সরকার প্রদত্ত পদবী ত্যাগ,

(২) সরকারী দরবার পরিহার,

(৩) সরকারী স্কুল কলেজ থেকে ছাত্র অপসারণ,

(৪) ব্রিটিশ আদালত বর্জন

(৫) মেসোপটেমিয়া রণাঙ্গনে পাঠাবার জন্যে যে সৈন্য রিক্রুট করা হচ্ছিল তাতে যেতে অসম্মতি জ্ঞাপন

(৬) কাউন্সিল বর্জন

(৭) বিলাতী বর্জন

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণ পরিণতি লাভ করল। কাউন্সিল বর্জন ও ভোটদানে বিরতির আন্দোলনটি বেশ সাফল্যলাভ করল। অসংখ্য উকীল আদালত ছেড়ে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিল। দলে দলে ছাত্রেরাও যোগ দিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় স্কুল, জাতীয় কলেজ প্রভৃতি গজিয়ে উঠল।

দেশের সর্ব অঞ্চল থেকে আরও অগ্রগামী ধাপের জন্যে দাবি উঠল। ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন শুরু করার দাবি উঠল। আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার জন্যে দাবি উঠল। এখনও সময় হয়নি এই অজুহাতে কংগ্রেস আন্দোলন আরম্ভ করল না। কংগ্রেস দেশবাসীকে তিলক স্বরাজ ফাণ্ডের জন্যে এক কোটি টাকা তোলার জন্যে, কংগ্রেসের এক কোটি সভ্য সংগ্রহ করার জন্যে, কুড়ি লক্ষ চরকার কাজ আরম্ভ করার জন্যে দেশবাসীকে ডাক দিল।

খিলাফৎ আন্দোলনও ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকল। ১৯২১ সালে সারা ভারত খিলাফৎ সম্মেলনে ঘোষণা করা হল—মুসলমানদের পক্ষে সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেওয়া বা এই কাজে সাহায্য করা বে-আইনী কাজ। আরও ঘোষণা করা হল ব্রিটিশ সরকার তাদের আন্দোলনের মূল দাবি মেনে না নিলে মুসলমানেরা গণ-আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করবে এবং আগামী কংগ্রেস অধিবেশনে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পতাকা উত্তোলন করবে। (১৮)

এই সময়ে প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত ভ্রমণ নির্দিষ্ট হয়। কংগ্রেস এই উপলক্ষে প্রতিবাদ স্বরূপ সমস্ত অভিনন্দন সুচক অনুষ্ঠান পরিহার করল এবং বিলাতী কাপড় পোড়ানোর সংকল্প নিল। বিষয়টি উপলক্ষ করে জনসাধারণ অহিংসার চৌহদ্দী অতিক্রম করে বোম্বাইতে প্রতিরোধ আন্দোলন গঠন করল। এর ফলে ৫৩ জন লোক নিহত হল, ৪০০ জন গ্রেপ্তার হল। গান্ধীজী এই

রক্তারক্তির বিরুদ্ধে মতজ্ঞাপন করলেন। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উপবাস করলেন। ঘোষণা করলেন—স্বরাজের গন্ধ তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। (১৯)

অবশেষে, কংগ্রেস ব্যক্তিগত অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করতে রাজি হল। তার ফলে ৩০,০০০ সত্যাগ্রহী জেল বরণ করল। গান্ধীজী গুজরাটে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কংগ্রেস ঘোষণা করল—সশস্ত্র বিদ্রোহের বিকল্প হিসাবেই তারা অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেছে। (২০)

গান্ধীজী গুজরাটের বারদৌলি তালুকেই সর্বপ্রথম আইন অমান্য আন্দোলনের পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। এই সময়ে অন্ধ্রদেশেও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছিল। গান্ধীজীর নির্দেশে বারদৌলির আন্দোলন চলাকালীন অন্ধ্রের আন্দোলন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। শুধু গুন্টুরে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন শুরু করা হল।

আন্দোলন দু' জায়গাতেই ভালভাবেই চলছিল। এই দুজায়গার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যাপক আইন অমান্য আরম্ভ করারও কথা ছিল।

কিন্তু এমন সময়ে হঠাৎ বারদৌলির আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হল। অজুহাতটা হল নিম্নরূপ ঃ চৌরিচৌরাতে (গোরক্ষপুরের কাছে) একদল জনতা একটি থানা আক্রমণ করে এবং থানা ও তার ভিতরে ২১ জন কনষ্টেবল ও এক জন সাব ইনস্‌পেক্টরকে জীবন্ত দগ্ধ করে। এই ঘটনাটি উপলক্ষ করে আইন অমান্য আন্দোলন একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল। (২১)

গান্ধীজীর এই কাজ সারা দেশে একদিকে বিক্ষোভ আর এক দিকে অবসাদ এনে দিল। আন্দোলনের মধ্যে দারুণ হতাশা এসে গেল।

সরকারও কংগ্রেসের দুর্বলতার চিহ্ন দেখে সাহস পেল এবং ১৩ই মার্চ তারিখে (১৯২২) গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করল। এই ভাবেই অসাফল্যের মধ্যে দিয়ে শেষ হল ১৯২১ সালের অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ইতিহাস।

তবে ব্যর্থ হলেও এই আন্দোলন নতুন আদর্শ স্থাপন করল। স্বদেশী আন্দোলন গণ আন্দোলনের সুত্রপাত করলেও এই আন্দোলন বাঙলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবেই সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই এইটিই হল প্রথম সর্বভারতীয় গণজাতীয় আন্দোলন। এই আন্দোলন এক দিকে প্রমাণ করল যে শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন

মধ্যবিত্ত—দেশের ব্যাপক জনসাধারণের সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি ব্যাপক গণজাতীয় আন্দোলনের জমি প্রস্তুত। অপর দিকে এই প্রশ্নটিও প্রথম উত্থাপিত হল—ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এই ব্যাপক গণআন্দোলন পরিচালনা সম্ভব নয়।

অসহযোগ আন্দোলন ও বাঙলা

অসহযোগ আন্দোলনে অন্য প্রদেশের মত বাঙলা দেশও উৎসাহের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিল।

তবে বাঙলা দেশের অবস্থা অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনেক দিক থেকে ছিল স্বতন্ত্র। বাঙলা দেশে ইংরেজী শিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চেতনা অন্যান্য প্রদেশ থেকে ছিল অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। বাঙলা দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইতিপূর্বেই আইন অমান্য আন্দোলন ও বিলাতী বর্জন আন্দোলনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। বস্তুত স্বদেশী আন্দোলনটিকে যুদ্ধোত্তর যুগের অসহযোগ আন্দোলনেরই প্রথম মহড়া বলা যেতে পারে।

বাঙলা দেশের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে উদ্দাম দেশপ্রেমের প্রকাশ হয়েছিল তা অনেক সময়ে সন্ত্রাসবাদের পথ বেয়ে বয়ে চলেছিল। এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বাঙলা দেশকে চরমপন্থী মতবাদে দীক্ষিত করে তুলেছিল।

বাঙলা দেশে আবার শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যুদ্ধোত্তর যুগের অসহযোগ আন্দোলনের আগে। শ্রমিকেরা শুধু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেনি। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের আদর্শটিও অসহযোগ আন্দোলনের আগেই বাঙলা দেশের বুদ্ধিজীবীদের মনে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

এই সমস্ত কারণে বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে র‍্যাডিকাল মনোভাবের প্রসার হয়েছিল অনেকটাই। এই অবস্থায় বাঙলা দেশের মাটিতে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল তখন এই আন্দোলনে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল।

এই সময়ে বাঙলা দেশে ধনিক শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। দেশবন্ধু প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। তিনি নরমপন্থী নেতাদের বিরোধী ছিলেন। প্রথমেই তিনি

তদানীন্তন বামপন্থী মনোভাবাপন্ন আন্দোলন মিসেস বেসান্তের হোম রুলের প্রতি সমর্থন জানালেন। এই সময়ে বেসান্তকে গ্রেপ্তার করা হলে আইন অমান্য আন্দোলন করার কথা ওঠে। এই সময়ে মডারেট নেতারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। তিলক ও দেশবন্ধু এই প্রস্তাবের ছিলেন বড় সমর্থক।

তারপরে যখন রাওলাত আইন পাশ হল তখনও বাঙলা দেশ থেকে প্রচণ্ড প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। এই সময়ে কংগ্রেস অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল রাওলাত আইন বিষয়ক প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন।

তারপরেই ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। সারা বাঙলা প্রতিবাদে জ্বলে উঠল। বাঙলার জাগ্রত বিবেক রবীন্দ্রনাথ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে ইংরেজ প্রদত্ত সম্মান পরিত্যাগ করলেন। তাঁর এই কাজের মধ্যে দিয়ে বাঙলার প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে উঠল।

তারপরে মন্টেগু সংস্কার যখন কংগ্রেসে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল তখনও বাঙলা এই আলোচনায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করল। দেশবন্ধু মন্টেগু সংস্কারকে 'inadequate, unsatisfactory, and disappointing' এই মর্মে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং তিলক দেশবন্ধুকে এই বিষয়েও যথেষ্ট সাহায্য করেন। গান্ধীজী উপরোক্ত বিশেষণগুলি প্রত্যাহার করে প্রস্তাবটিকে নখদন্তহীন করার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং তাঁর চেষ্টায় প্রস্তাবটি এই মর্মে সংশোধিতও হয়েছিল।

অবশেষে কংগ্রেস যখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিল তখন প্রথম দিকে দেশবন্ধু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও পরে এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এলেন। এমন কি দেশবন্ধুই এই প্রস্তাবটি কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপন করলেন।

এই সময়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের কাজে লাগাবার চেষ্টা হয়েছিল। দেশবন্ধুকে কংগ্রেস শ্রমিক দপ্তরের ভার দেয়। এই সময়ে কতকগুলি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে দেশবন্ধু যুক্ত হলেন। চট্টগ্রামে একটি ষ্ট্রাইকে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

দেশবন্ধু রাজপুত্রের অভ্যর্থনা বয়কট করে কলকাতায় বড় আন্দোলন সৃষ্টি করলেন। এই অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। এই বয়কট আন্দোলনের

সমর্থনে কলকাতায় পূর্ণ হরতাল পালিত হল। এমন কি কসাইয়েরা পর্যন্ত দোকান বন্ধ রাখল।

তারপরে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যখন আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল তখন বাঙলা আন্তরিকতার সঙ্গে এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থ জানাল। কিন্তু হঠাৎ গান্ধীজী যখন হিংসার অজুহাতে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন তখন বাঙলা গান্ধীজীর এই কাজের তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করল। বাঙলার নেতারা জানিয়ে দিলেন—গান্ধীজী যাই বলুন, তাঁরা চৌকীদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবেনই।

বস্তুত রামপুরহাট, এবং অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় চৌকীদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলেছিল এই সময়ে।

বাঙলা দেশের যুবকদের প্রগতিশীল ভাবধারার প্রভাবে দেশবন্ধুকেও অনেক সময়ে প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তিনি ধনিক-সুলভ স্বার্থবোধ কখনও ভোলেন নি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ পার্টির কার্যক্রমে এই ধনিক সুলভ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশবন্ধুর জীবনী লেখক মন্তব্য করেছেন—"He was a socialist, particularly in his academic sympathy for Marxian doctrines; but he did not move his little finger to destroy the permanent settlement of Bengal, a pernicious institution which has for nearly a century and a half stood effectively between Bengal and progrees. Nor in his coquettings with Trade Unions, could he rise above capitalistic influence......" (২২)

কংগ্রেসের লক্ষ্য, কর্মসূচী ও কর্মপন্থা

প্রথম দিকে কংগ্রেস আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন অর্জন।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই স্বায়ত্ত শাসন কথাটির বদলে স্বরাজ কথাটি লক্ষ হিসাবে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল।

১৯০৬ সালে দাদাভাই নাওরোজী কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে এই

কথাটি ব্যবহার করলেন। নাওরোজী স্বরাজ বলতে ভাবতেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার। তার বেশি কিছু নয়।

১৯০৮ সাল থেকে বাল গঙ্গাধর তিলক স্বরাজ কথাটির মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত সংগ্রামী চেতনা আমদানি করলেন। তবে তিনিও স্বরাজ বলতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা মনে করেন নি।

১৯২০ সালে নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেসের লক্ষ্যের আর একটু পরিবর্তন হল। এই সময়ে বলা হল ন্যায় সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ লাভ করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। এর আগে বলা হত—নিয়মতান্ত্রিক পথে স্বরাজ অর্জন করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলতেন—"আমি চাই শতকরা আটানব্বুই জনের জন্যে স্বরাজ।" তবে তিনিও বললেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে যেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকলে অনেক সুবিধা রয়েছে। ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের মানে আজ আর অধীনতা বলা চলে না। (২৩)

মোট কথা ১৯২৬ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় নেতারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ভাবতে পারতেন না।

কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিটি নিম্ন মধ্যবিত্তের মধ্যে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে এই দাবিকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে এই নিম্ন মধ্যবিত্তই ছিল প্রধান শক্তি; তাই এই শ্রেণীর কথা বেশিদিন অগ্রাহ্য করা সম্ভব হল না।

পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শটি বাঙলা দেশে ১৯০৫—১১ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' প্রভৃতি চরমপন্থী পত্রিকাগুলি তুলে ধরেছিল দেশবাসীর কাছে। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের মধ্যেই একদল ডেলিগেট এই দাবিটি উত্থাপন করল। এই দলের পক্ষে মৌলানা হসরৎ মোহানী প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন। (২৪) কিন্তু গান্ধীজী প্রস্তাবটিকে নিন্দা করলেন এবং প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হল। তারপরে কংগ্রেসের প্রতিটি অধিবেশনেই একদল ডেলিগেট এই প্রস্তাবটি তুলতেন এবং প্রত্যেকটি অধিবেশনই এটিকে অগ্রাহ্য করত।

অবশেষে ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেসের ধনিক নেতাদের জনসাধারণের এই প্রিয় দাবিটিকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল।

জনসাধারণের এই দাবিটি স্বীকার করে নিলেও কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতারা অহিংসা নীতিটি ধরে থাকলেন চোখের মণির মত। প্রকৃত পক্ষে এই অহিংসাই হল তাঁদের নেতৃত্বের রক্ষা কবচ।

অহিংসার লাগাম হাতে রেখে তাঁরা চেষ্টা করলেন জাতীয় আন্দোলনের গতিরোধ করতে। এই কাজে তাঁরা সক্ষমও হলেন অনেকটাই। জাতীয় আন্দোলন বুর্জোয়া নেতৃত্বের বাধার জন্যে তার পূর্ণ পরিণতির দিকে প্রসারিত হতে পারেনি।

তবু যুদ্ধোত্তর যুগের অসহযোগ আন্দোলন নিম্ন মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিকের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামস্পৃহার মধ্য দিয়ে যে আদর্শ স্থাপন করল তা ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নতুন জীবন সঞ্চার করেছিল, অনাগত বৃহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

(১) প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া, পৃঃ ১৪

(২) The Congress and the National Movement (From a Bengali Stand-point)—Written under the direction of the Reception Committee of the Indian National Congress, 1928)—P. 12-13.

(৩) প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া, পৃঃ ৭৪

(৪) কৃষ্ণকুমার মিত্র—আত্মচরিত, পৃঃ ১১৭—১৯৮

(৫) প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া, পৃঃ ৪৬—৪৭

(৬) The Congress and the National Movement—P. 20

(৭) ঐ, পৃঃ ২১

(৮) „ পৃঃ ৩৪

(৯) "The Musalman", Dec. 14, 1906

(১০) ঐ, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭

(১১) "The Musalman", April. 26, 1907

(১২) " ৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৬

(১৩) P. Sitaramayya—The History of the Indian National Congress, P. 234—38

(১৪) ঐ, পৃঃ ২৩৮—৪০

(১৫) ঐ, পৃঃ ২৬৭

(১৬) " পৃঃ ৩২৩

(১৭) The Congress and the National Movement, P. 59

(১৮) Sitaramayya—The History of the Congress, P. 365

(১৯) ঐ, পৃঃ ৩৭২

(২০) " পৃঃ ৩৮২

(২১) " পৃঃ ৩৯৭

(২২) P. C. Roy—Life and Times of C. R. Das

(২৩) ঐ, দশম অধ্যায়

(২৪) Sitaramayya—The History of the Congress, P. 334—35

একাদশ অধ্যায়

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে কংগ্রেস আন্দোলনের পাশাপাশি বাঙলা দেশে আর একটি আন্দোলনের সূত্রপাত হল। এইটি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নামে খ্যাত।

এই আন্দোলনটিকে কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে কখনও স্বীকার করেনি। অবশ্য জনসাধারণের চোখে কংগ্রেস আন্দোলন থেকে ভিন্ন-ধর্মী হলেও এই আন্দোলনটি ছিল জাতীয় আন্দোলনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

আমরা আগেই বলেছি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে বেকার সমস্যা দেখা দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে এই বেকার সমস্যা তীব্র হয়ে উঠল। এই অবস্থায় দেশের ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিল। বিক্ষুব্ধ ছাত্র ও যুবকেরা কংগ্রেস আন্দোলন-অনুসৃত নিয়মতন্ত্রের পথটিকে যথেষ্ট কার্যকরী বলে মনে করতে পারল না। কাজেই তারা বেছে নিল হিংসার পথ অথবা সন্ত্রাসবাদের পথ।

প্রশ্ন উঠতে পারে—বাঙলার শিক্ষিত যুবকেরা এই সন্ত্রাসবাদের পথের সন্ধান পেল কি করে।

প্রথম কথা, দেশের বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় ছাত্র ও যুবকদের বিক্ষোভ প্রকাশের চরম পন্থা হিসাবেই এই পথটির সূত্রপাত। সেই দিক থেকে এটি একটি খাঁটি দেশীয় আন্দোলন।

তবে বাঙলা দেশের এই যুবকেরা তাদের একাজে প্রেরণা লাভ করেছিল ইওরোপের কয়েকটি দেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ইতিহাস থেকে। তারা বিশেষ করে অনুধাবন করেছিল ইতালীতে মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির নেতৃত্বে যে-সমস্ত গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল তার কথা। আর রাশিয়ায় একদল বুদ্ধিজীবী এই সময়ে সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিয়েছিল জারতন্ত্রের অত্যাচার থেকে দেশটাকে বাঁচাবার আগ্রহে। এদের বলা হত 'নিহিলিষ্ট'। এই নিহিলিষ্টদের সংগঠনের কায়দা ভারতের সন্ত্রাসবাদীরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করলেন। পরবর্তীযুগে তাঁরা আয়র্ল্যাণ্ডের কার্যকলাপ থেকেও যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

ভারতের সন্ত্রাসবাদীরা তাঁদের অনুসৃত পন্থাটিকে দেশের মানুষের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেবারও চেষ্টা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা 'গীতার' নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধের প্রতীক হিসাবে শিবাজী চরিত্রটি থেকে নতুন শিক্ষা গ্রহণ করা হল।

১৮৫৭ সালের সশস্ত্র বিদ্রোহটিকে এই সর্ব প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে প্রচার করা হতে লাগল। এই উদ্দেশ্যে সাভারকার "The Indian war of Independence" নামে 'মিউটিনীর' উপর একখানি বই লিখলেন।

ওয়াহবীদের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতিও তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ওয়াহবী নেতা আমির খাঁর বিচারের সময়ে তাঁর ব্যারিষ্টার তাঁর পক্ষ সমর্থন করে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। (১)

এমন কি পাবনার কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসও এই যুবকদের মনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। (২)

এককথায়, ইওরোপের সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহ্য আর ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহ্য—এই দুটিকে মিলিয়ে একটি নতুন আদর্শ ভারতের স্বাধীনতাকামী ছাত্র ও যুবকদের সামনে উপস্থিত করা হল।

শুধু তাই নয়, বঙ্কিমের 'আনন্দমঠে', বিশেষ করে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে, বিবেকানন্দের বক্তৃতায়, প্রবন্ধাবলীতে যে স্বাদেশিকতার সুর ছিল তার ভাবটিকে অনুসরণ করে তাঁরা একটি নতুন আদর্শ সৃষ্টি করলেন। বঙ্কিম, বিবেকানন্দের ভাবধারায় নতুন জীবনাবেগ সঞ্চারিত করা হল। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের লেখায় যা

দুর্বলতা ছিল তাকে বর্জন করে, তার সবলতাকে নতুন রূপদান করে তাঁরা গড়ে তুললেন বঙ্কিম বিবেকানন্দের জীবনদর্শন থেকেই নতুনতর এক জীবনদর্শন।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা

১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রে জনসাধারণের জীবনে দারুণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। মহাজন ও সাহুকারদের অত্যাচারের ফলে মহারাষ্ট্রে ১৮৭৫ সালে একটি ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এই বিদ্রোহটীকে ইংরেজরা 'দাক্ষিণাত্য সংঘর্ষ' বলে অভিহিত করেন। সংঘর্ষটি এতই তীব্র হয়েছিল যে ইংরেজদের এই সংঘর্ষের কারণ অনুসন্ধান করার জন্যে একটি কমিশন নিযুক্ত করতে হয়েছিল। এই ব্যাপক সংঘর্ষ শেষ হতে না হতে মহারাষ্ট্রে আবার একটি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের হাত ধরে মহারাষ্ট্রে আরও এসে প্রবেশ করল প্লেগ রোগের বিভীষিকা। এই সব কারণে দেশের লোকের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে এই সময়ে কয়েকটি মেলা বা উৎসবের আয়োজন চলে। 'গণপতি মেলা' ও 'শিবাজী মেলাই' এই প্রসঙ্গে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য।

মহারাষ্ট্রে 'গণপতি মেলা' ও 'শিবাজী মেলার 'সংগঠনে অগ্রণী ছিলেন বাপেকর ভ্রাতারা। এই মেলার বেদী থেকে অগ্নিময়ী বক্তৃতা বর্ষিত হতে থাকল। বক্তারা বলতে লাগলেন—শুধু শিবাজীর নামে শপথ নিলেই চলবে না। শিবাজীর মত অসম সাহসিক অভিযান সংগঠিত করতে হবে। নিজের হাতে তুলে নিতে হবে অস্ত্র আর বর্ম। অসংখ্য শত্রুর মস্তক ছেদন করতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে দিতে হবে প্রাণ। দুঃখ কিসে তাতে! এই যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ, স্বধর্ম রক্ষার জন্যে যুদ্ধ। (৩)

এই মর্মে বক্তৃতা দেওয়া হল, শ্লোক রচনা করা হল, হাজার হাজার ইস্তেহার বিলি করা হল। ইস্তেহারগুলিতে লেখা হল—মহারাষ্ট্রবাসী, ওঠ, জাগো, শিবাজীর উজ্জ্বল আদর্শ অনুসরণ করে অস্ত্র ধারণ কর, বিদেশী শাসনের অধীনে দাসত্বের জ্বালা মুছে ফেলে, বিদেশী শাসন উচ্ছেদের জন্যে ধর্মযুদ্ধে সমবেত হও। (৪)

শিবাজী মেলা, গণপতি মেলা প্রভৃতিকে উপলক্ষ করে এই সময়ে মহারাষ্ট্রে

যখন অভূতপূর্ব এক রাজনৈতিক আলোড়ন চলছিল, ঠিক সেই সময়ে সরকারী প্লেগ কমিশনার্স অফিসের কর্মচারীদের পক্ষ থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতি আপত্তিজনক ব্যবহারের অভিযোগ শোনা যেতে থাকল। এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হলেও প্লেগ কমিশনার র‍্যাণ্ড কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা করলেন না। ফলে র‍্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জনসাধারণের রাগ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। জনৈক মহারাষ্ট্রবাসী এই পাষণ্ডের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার সহজ উপায় হিসাবে র‍্যাণ্ডকে হত্যা করল। র‍্যাণ্ড হত্যার দায়ে দুজনকে ফাঁসি দেওয়া হল। বাল গঙ্গাধর তিলক দমনীতির প্রতিবাদ করলে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনীত হল। তিলককে রাজদ্রোহের দায়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

তিলকের প্রতি ইংরেজ সরকারের ব্যবহার সমগ্র দেশকে উত্তেজিত করে তুলল।

বাঙলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন

আগেই বলেছি, বাঙলায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই একটি বৃহৎ সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছিল। স্কুল কলেজের ছাত্রদের এই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের মনের মধ্যে তুষের আগুনের মত অসন্তোষ জিইয়ে রেখেছিল। এই অবস্থায় বাঙলা বিভাগের কার্জনী ষড়যন্ত্রের খবর ছড়িয়ে পড়ল। উচ্চ শিক্ষা সংকোচন, ভারতের জাতীয় চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ প্রভৃতি বারুদের আগুনের মধ্যে যেন একটি দেশলাইয়ের কাঠি নিক্ষেপ করল। সারা বাঙলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, উকীল, ব্যারিষ্টার, এমন কি কেরানীদের মনও বিদ্রোহ করে উঠল।

এইভাবেই বাঙলায় সন্ত্রাসবাদের জমি তৈরি হয়ে উঠল।

স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের বিলাতী বর্জনের আদর্শ বিক্ষুব্ধ যুবক দলের কাছে যথেষ্ট নয় বলে মনে হল। এই যুবক দল শুধু বিলাতী দ্রব্য বর্জন নয়, বিলাতী শাসন বরবাদ করার তাগিদও অনুভব করল। এই তাগিদেই তারা বর্জন করল নিয়মতন্ত্রের ছেঁদো পথ, গ্রহণ করল সশস্ত্র সংগ্রামের পথ। সে পথের লক্ষ্য হল ব্রিটিশকে এ-দেশ থেকে একেবারে বিতাড়ন করা।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রতিষ্ঠা করা হল "অনুশীলন সমিতি"। ১৯০৭ সালের মধ্যেই এই সমিতির এক ঢাকা কেন্দ্রের অধীনে অন্তত পক্ষে ৫০০টি শাখাকেন্দ্র খোলা হল। (৫)

এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যে 'যুগান্তর' নামে একখানি পত্রিকাও প্রকাশ করা হল। ১৯০৭ সালের এই পত্রিকাখানির প্রচার সংখ্যা দাঁড়াল সাত হাজার। (৬)

'অনুশীলন সমিতি' শরীর চর্চার আখড়া বলে পরিচয় দিলেও ভিতরে ভিতরে যুবকদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করতে লাগল। উচ্চ রাজকর্মচারীদের খুন করা, আর স্বদেশী ডাকাতি করার জন্যে এই সমিতি ব্যাপক আয়োজন আরম্ভ করল। এই সব কার্যকলাপ সরকারের নজরে আসার পরে ১৯০৯ সালে এই সমিতি বে-আইনী ঘোষণা করা হল।

কলকাতায় 'যুগান্তর' পত্রিকা শিক্ষিত যুবকদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করতে লাগল। 'যুগান্তর' লিখল—আমরা চাই ইংরেজ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা। এই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাই বিপ্লবের তরঙ্গ ডেকে আনবে। (৭)

সরকার 'যুগান্তরের' প্রকাশ বন্ধ করার জন্যে কোমর বাঁধল। ১৯১০ সালে পাস হল 'প্রেস আইন'। এই আইনের প্রথম শিকার হল 'যুগান্তর'। পত্রিকাটি হল বন্ধ।

কিন্তু ব্রিটিশের দমন-নীতি সন্ত্রাসবাদের তরঙ্গ রোধ করতে পারল না। এই তরঙ্গ কল কল নিনাদে সারা বাঙলা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বাঙলার কোনো অঞ্চলই এই আন্দোলনের বাইরে রইল না।

বাঙলায় প্রথম স্বদেশী খুন আরম্ভ হয় ১৯০৬-৭ সালে। এই পথের প্রথম পথিক হলেন ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীর বন্দুকের লক্ষ্যস্থল ছিল জজ কেনেডি। এই কেনেডি বাঙলায় যখন জজ ছিলেন তখন বাঙলার দেশপ্রেমিকদের প্রতি অবমাননাকর ব্যবহার করা হয়েছিল। কেনেডি মজঃফরপুরে স্থানান্তরিত হলেন। কিন্তু বাঙলার সন্ত্রাসবাদীরা তাঁকে ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। তাঁরা তাঁকে হত্যা করার জন্যে মজঃফরপুরে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে কেনেডি সাহেবের গাড়ী লক্ষ্য করে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী গুলি ছোঁড়েন। কিন্তু এই গাড়ীতে কেনেডি ছিলেন না, ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে। গুলির আঘাতে

তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে নিহত হলেন। কেনেডি হত্যাই হল বাঙলার প্রথম স্বদেশী খুন।

এরপরে চলল একটানা এক কাহিনী—স্বদেশী খুন, আর স্বদেশী ডাকাতি।

১৯০৬-৮ সালের মধ্যেই মজঃফরপুরের খুন ছাড়াও কলকাতার আরও একটি আক্রমণ হয়েছিল। এই খুনের দায়ে অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তার হলেন। এই মামলা আলিপুর বোমার মামলা বলে বিখ্যাত।

১৯১০ সালে হাওড়া ও ঢাকার আক্রমণকারীদের নিয়ে আরম্ভ হল হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা আর ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯১১ সালে সোনারঙ জাতীয় স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রের দায়ে গ্রেপ্তার করা হল। এই স্কুলের লাইব্রেরীতে খানাতল্লাসীর পরে পুলিস তিনখানি বই হস্তগত করে। (৮)

এই বই তিনখানি হল—(১) তিলকের মামলার ইতিহাস এবং তিলকের জীবনী। (২) শাস্ত্রী লিখিত—ছত্রপতি শিবাজী। (৩) সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস।

১৯১২ সালে মেদিনীপুরে স্বদেশী খুন ও স্বদেশী ডাকাতি শুরু হয়।

১৯১৩ সালে কয়েকজন পুলিস অফিসারের জীবননাশের চেষ্টা হয়। এই বছরে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা ও রাজাবাজার বোমার মামলা আরম্ভ হয়।

১৯১৪ সালের ২৬শে আগষ্ট 'রোডা এণ্ড কোম্পানী' নামে একটি বন্দুকের দোকান থেকে জনৈক দোকান কর্মচারীর সাহায্যে সন্ত্রাসবাদীরা ৫০টি মসার পিস্তল ও ৪৬ হাজার কার্তুজ হস্তগত করে।

যুদ্ধের সময়ে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ অধিকতর বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করার জন্যে চেষ্টা শুরু হয়।

শুধু বাঙলায় নয়, পাঞ্জাবে ও উত্তর ভারতে, এমন কি ভারতের বাইরে জার্মানীতেও সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়ে। শিখদের মধ্যে 'গদর' দল গড়ে ওঠে। এই দলের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা অনেকটা অগ্রসর হল। এই সময়ে নানা ঘাঁটিতে মোতায়েন সৈন্যদল বিদ্রোহে যোগ দেবার আশ্বাস দান করে। এক ব্যাপক বিদ্রোহের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন

প্রদেশের সরকারী খাজাঞ্চিখানা, ডাক ও ষ্টেশন আক্রমণ আরম্ভ হয়। আমীর আমানুল্লা শাসিত কাবুলে ভারতের অস্থায়ী সরকারও স্থাপিত হয়। ১৯১৫ সালে ভারতে সর্বত্র যুগপৎ এক অভ্যুত্থান ঘটাবার জন্যে প্রস্তুতি চলে। (৯)

ব্রিটিশ শাসকেরা বিদ্রোহ ঘটার আগেই সন্ধান পায় ও প্রচণ্ড আঘাত হানতে আরম্ভ করে। 'ভারত রক্ষা আইন' পাশ করে বিদ্রোহীদের সংশ্লিষ্ট বহু লোকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহে যারা লিপ্ত ছিল তাদের মীরাটে গুলি করে হত্যা করা হল। ৭নং রাজপুত পদাতিক বাহিনীর কয়েকজনকে দিল্লীতে ফাঁসি দেওয়া হল এবং ২৩নং রিশলী সৈন্য দলের ১৩ জনের আম্বালা জেলে ফাঁসি হল।

যুদ্ধের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করল। যুদ্ধ শেষ হবার পরেও এই আন্দোলনের তীব্রতা কমেনি।

১৯২৩-২৪ সালে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে পোষ্টাফিস পুড়িয়ে দেওয়া, ষ্টেশন পুড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতি চলতে থাকল।

১৯২৪-২৮ সালে সন্ত্রাসবাদীরা আরও সংগঠিত আক্রমণের কায়দা আবিষ্কার করল। এই সময়ে বাঙলার সন্ত্রাসবাদীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল পরিহার করে "রিভোল্ট গ্রুপ" (Revolt Group) নামে একটি মিলিত দল গঠন করল। এই দলটি সংগঠিত আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হিসাবে নির্বাচন করল ব্রিটিশের অস্ত্রাগার, খাজাঞ্চিখানা ইত্যাদি।

এই লক্ষ্য নিয়ে মেছুয়াবাজার বোমার আক্রমণ এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয়েছিল।

১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই পঁচিশ বছর ধরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বাঙলার বুকে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা

বলাই বাহুল্য, উপরোক্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পরিচালিত হত কতকগুলি গুপ্ত সমিতির উদ্যোগে। কাজেই এই আন্দোলনের মঞ্চ থেকে যে সাহিত্য প্রচার করা হত তাও ছিল গুপ্ত সাহিত্য। এই অবস্থায় এই আন্দোলনের ইতিহাস সংকলন করা যথেষ্ট শক্ত কাজ। সন্ত্রাসবাদী নেতাদের জবানবন্দী, মামলার দলিল, পুলিস রিপোর্ট, সরকারী কাগজপত্রের মধ্যে এই ইতিহাস

কিছুটা বেঁচে রয়েছে। এই দলিলগুলোর মধ্যে যা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বা এখনও প্রকাশিত হয়নি তা থেকে এই আন্দোলনের লক্ষ্য, কর্মসূচী ও কর্মপন্থা সম্পর্কে অল্প বিস্তর একটা ধারণা করা যেতে পারে।

'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা' এই দুখানি সংবাদপত্রে সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থনসূচক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। তাছাড়া, সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতির উদ্যোগে প্রায়ই গোপনে গোপনে ইস্তেহার বিলি করা হত। তাই এই পত্রিকা দুটির ও উপরোক্ত ইস্তেহারগুলির পাতা থেকে উপরোক্ত লক্ষ্য, কর্মসূচী ও কর্মপন্থার কিছুটা নির্দেশ পাওয়া যায়।

প্রথম থেকেই মনে রাখা প্রয়োজন কি লক্ষ্য, কি কর্মসূচী, কি কর্মপন্থা সর্ব দিক থেকেই এই আন্দোলন কংগ্রেস আন্দোলন থেকে ছিল স্বতন্ত্র। কংগ্রেসের লক্ষ্যের বিকল্প এক লক্ষ্য, বিকল্প এক কর্মপন্থা, এই আন্দোলন উপস্থিত করে।

সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষ থেকে (স্বদেশী আন্দোলন এই সময়ে চলছিল) একখানি পুস্তক প্রকাশ করা হয়। এই বইখানির নাম হল—"মুক্তি কোন্ পথে?" (১০) এই পুস্তকে কংগ্রেসের আদর্শটিকে 'ছোট ও নীচ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুস্তকে সন্ত্রাস বাদীদের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার বলা হয়েছে—সন্ত্রাসবাদীদের অবশ্য মনে রাখা উচিত যে এইটেই প্রধান কাজ নয়, প্রধান কাজ হল সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হওয়া। এই পুস্তকখানিতে দেশীয় সৈনিকদের সাহায্যে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা। ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের কথা এই আন্দোলনের লক্ষ্য বলে কখনও স্বীকৃতি পায়নি। তাছাড়া, স্বদেশী আন্দোলন হিংসার পথে বলপূর্বক ইংরেজ রাজ উচ্ছেদের কথাও কোনদিন অনুমোদন করেনি।

এই দুদিক থেকেই সন্ত্রাসবাদীরা নতুন আদর্শ স্থাপন করল।

'যুগান্তর পত্রিকা' ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশ রাজের উচ্ছেদ করার সংকল্প ঘোষণা করল। তারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা উত্থাপন করল। ফরাসী বিপ্লব ও ১৯০৫ সালের রুশ

বিপ্লবের নজির দেখিয়ে তারা বলতে চাইল—সশস্ত্র সংগ্রামের পথে উপরোক্ত দেশগুলিতে বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে ; ঠিক এই পথেই ভারতেও বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে। (১১) এই উদ্দেশ্যে তারা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উত্থাপন করল এবং তারা বলল—সৈন্যবাহিনীর মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শটি ছড়িয়ে দিতে হবে।

'সন্ধ্যা' পত্রিকাটিকেও ইংরেজ কর্মচারীরা সন্ত্রাসবাদীদের মুখপত্র বলে বর্ণনা করেছেন। এই পত্রিকাটি পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শটি তুলে ধরল দ্বিধাহীন ভাবে। 'সন্ধ্যা' লিখল (১২)—"আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। ফিরিঙ্গী শাসনের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত যতদিন অবশিষ্ট থাকবে ততদিন পর্যন্ত ভারতের উন্নতির আশা নেই। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যম হিসাবেই স্বদেশী, বয়কট, প্রভৃতি কথাগুলির মূল্য। নইলে এই কথাগুলি অর্থহীন।"

এই মর্মে হাজার হাজার ইস্তেহার সন্ত্রাসবাদীরা ছড়িয়ে দিয়েছিল। একখানি ইস্তেহারে (যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অন্য') লেখা হল (১৩)

"ভগবান ও দেশের নামে, ভাইসব, তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি—যুবা বৃদ্ধ, বড়লোক, গরীব, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, সকলের কাছেই—এসো, যোগ দাও ভারতের স্বাধীনতায় এই যুদ্ধে, রক্ত ও অর্থ ঢেলে দাও এই কাজে। শুনতে পাচ্ছ না, মা ডাকছেন এবং পথনির্দেশ করছেন!"

"সংযুক্ত ভারতের স্বাধীন রাজ্যের বাঙলা শাখার" (১৪) পক্ষ থেকে ঐ ইস্তেহারগুলি বিলি করা হত। একটি ইস্তেহারে "সংযুক্ত ভারতের" একটি শিলমোহরেরও ব্যবহার দেখা যায়।

সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্ত সমিতির সংগঠনগুলি ছিল খুব মজবুত। এই সমিতির সদস্যেরা দেশের জন্যে প্রাণদানের জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকত। তারা সমিতির কার্যকলাপ সম্পূর্ণ গোপন রাখবে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করত। ব্যায়ামের আখড়া, হিন্দু মন্দির, আশ্রম প্রভৃতিকে সামনে রেখে তারা তাদের গুপ্ত কার্যকলাপ চালিয়ে যেত। 'ভবানী মন্দির' নামে একখানি পুস্তকে শক্তি আদর্শটি যুবকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। "বর্তমান রণনীতি" নামে আর একখানি পুস্তকে হিংসার পথ অনিবার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। রাশিয়ার নিহিলিষ্ট ও আয়ার্ল্যাণ্ডের সন্ত্রাসবাদীদের কর্মপন্থা অনুধাবন করে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তারা অস্ত্রাদি ব্যবহার করা শিখতে আরম্ভ করেছিল।

সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতারও যোগাযোগ ছিল। এই সম্পর্কে 'যুগান্তর' সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন (১৫)—ভগিনী নিবেদিতা ম্যাটসিনীর আত্মজীবনী নামক ছয় খণ্ড পুস্তকের প্রথম খণ্ডটি বৈপ্লবিক সমিতিকে প্রদান করেন। এই বই সমগ্র বাঙলায় ঘুরত। এই খণ্ডের শেষে 'গেরিলাযুদ্ধ' কি প্রকারে করতে হয় সে বিষয়ে একটি অধ্যায় আছে। এইটি টাইপ করে চারদিকে পাঠানো হত। উদ্দেশ্য ছিল গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা করা। নিবেদিতা উপরোক্ত লেখক ক্রপটকিনের দুখানি বইও উপহার দেন। এই বই দুখানি হল—(১) Memories of a Revolutionist (২) In Russian & French Prisons.

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ সখারাম গণেশ দেউস্করের কথাও উল্লেখ করেছেন। ইনি ছিলেন সুসাহিত্যিক ও 'দেশের কথা' নামে একখানি পুস্তকের লেখক। সরকার এই পুস্তকখানির প্রচার নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি কর্মীদের নিয়ে পাঠচক্র করতেন এবং তাদের 'সোস্যালিজম' সম্পর্কিত পুস্তকাদি পড়তে উৎসাহ দিতেন। (১৫)

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে বোঝা যায় যে সন্ত্রাসবাদীরা একটি অগ্রগামী আদর্শের জন্যেই সংগ্রাম করেছিল। ইওরোপের এনার্কিষ্ট আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাবে, কংগ্রেসের নরমপন্থী আদর্শের বিকল্প হিসাবে একটি অগ্রগামী আদর্শ তুলে ধরাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে ও মহাযুদ্ধের পরেও সন্ত্রাসবাদীরা তদানীন্তন কালের কংগ্রেস নেতাদের আপোষ-পন্থী কর্মসূচীর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শটি তাঁরাই সর্বপ্রথম জনসমক্ষ্যে তুলে ধরেছিলেন এই কথা বলা যায়।

১৯২১ সালে কংগ্রেস যখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় তখন সন্ত্রাসবাদীরা তাতে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে কংগ্রেস যখন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করল তখনও সন্ত্রাসবাদীরা অনেকে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেয় এবং এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। বস্তুত এই প্রস্তাবের মধ্যে তাঁরা নিজেদের আন্দোলনের জয় দেখতে পেলেন।

বাঙলা দেশে যখন 'ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পেজান্টস্ পার্টি' গড়ে ওঠে তখন সন্ত্রাস-

বাদীদের মধ্যে কেউ কেউ এই পার্টির সভ্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধোত্তর যুগে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবার পরে সন্ত্রাসবাদীরা কেউ কেউ শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

মোট কথা, সন্ত্রাসবাদীরা আগাগোড়াই প্রগতিশীল আন্দোলনগুলিতে যোগ দিতেন। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আবার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সময় থেকেই সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসমালোচনা আরম্ভ হয়। তাঁরা দেখলেন সন্ত্রাসবাদের পথে সাফল্য লাভ করা সুদূরপরাহত। ব্যক্তিগত সাহস, খুন বা ডাকাতি—দেশের লোকের মনে উন্মাদনা এনেছিল সত্যি, দেশের জন্যে নির্ভীক আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছিল, কিন্তু বিদেশী সরকারের ভিত্তিমূলকে পুরোপুরি নাড়া দিতে পারেনি কোনো দিন। কাজেই সন্ত্রাসবাদের অসাফল্য জলের মত পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল দেশবাসীর কাছে। সন্ত্রাসবাদীরা নিজেরাও আত্মসমালোচনা আরম্ভ করলেন।

ঠিক এই সময়েই তারা একটি নতুন আদর্শের সন্ধান পেলেন। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব এবং যুদ্ধোত্তর যুগে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে রুশদেশের জয়-যাত্রা তাদের অনেকের মনে গভীর বিশ্বাস উৎপাদন করল। এই সময়ে তাঁরা সাগ্রহে তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল ও সোবিয়েত গভর্ণমেণ্ট প্রচারিত সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন। দেশের মধ্যেও ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হল। এই আন্দোলনের সাফল্যও তাঁদের অনেকের দৃষ্টি এড়াল না। জেলের মধ্যে নতুন জীবনজিজ্ঞাসা শুরু হল অনেক সন্ত্রাসবাদীর মনে। ক্রমশ সন্ত্রাসবাদীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। একটি দল সন্ত্রাস-বাদের ব্যর্থতা দেখে এই পথই শুধু ত্যাগ করলেন না, তাঁরা জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গেই সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। কেউ কেউ আবার অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় নিয়ে আশ্রম খুললেন।

যুবক সন্ত্রাসবাদী নেতাদের মধ্যে অনেকে (রিভোল্ট গ্রুপের অধিকাংশ সদস্য) সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে অন্য পথ ধরলেন। (১৭) তাঁরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত হয়ে শ্রমিক কৃষক আন্দোলনে অগ্রণী হলেন। কেউ কেউ নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। মোট কথা, দেশে যখন গণ আন্দোলন ছিল না, ছিল শুধু বুর্জোয়া নেতাদের আপোষপন্থী

আন্দোলন, তখন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। দেশে গণ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পরে সন্ত্রাসবাদীদের কাজ ফুরিয়ে গেল। তাই ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে অবশেষে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে ছেদ পড়ল।

গ্রন্থনির্দেশিকা

(১) The Congress and the National Movement—P. 8
(২) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম—পৃঃ ১৩১
(৩) Sedition Committe Report, 1918
(৪) ঐ
(৫) ঐ
(৬) ঐ
(৭) ঐ
(৮ ঐ
(৯) ঐ
(১০) ঐ
(১১) ঐ
(১২) ঐ
(১৩) ঐ
(১৪) ঐ
(১৫) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম—পৃঃ ৯৬
(১৬) ঐ, পৃ: ১৩৫-৩৬
(১৭) 'রিভোল্ট গ্রুপ' সম্পর্কে তথ্যগুলি এই গ্রুপের নেতা নিরঞ্জন সেনেব কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয়

ভারতে যন্ত্রশিল্পের যুগ শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেরও শেষে।

তার আগে এখানে ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে গোটাকয়েক মিল গড়ে উঠেছিল। কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে পরীক্ষামূলকভাবে দু একটা জুট মিল খোলার চেষ্টা হয়। কয়লাখনিও এই সময়ে কয়েকটা খোঁড়া হয়েছিল। ইংরেজদের চেষ্টায় চা-বাগিচা কয়েকটা গড়ে উঠেছিল। বলাই বাহুল্য, এই কারখানা, কয়লাখনি ও চা-বাগিচাগুলোতেই ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর যন্ত্রচালনার কাজে হাতে খড়ি। এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে যে কারখানাগুলো গড়ে উঠেছিল তাতে যে শ্রমিকেরা কাজ করত তারাই ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর পথিকৃৎ।

তবে এখানে ওখানে কয়েকটা মিল আর কয়েক হাজার শ্রমিকের কাজে যোগদান থেকে এই সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে যে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগে ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল।

আসলে ভারতে ধনতন্ত্রের সত্যিকার বিকাশ হয়েছে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ধনতন্ত্র কিছুটা অগ্রসর হয়েছে বলা চলে। এই সময়ে শ্রমে অর্ধ নিযুক্ত বা পূর্ণ নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ (১) ঃ—শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৫,০০০,০০০। এই শ্রমিকদের পরিজনবর্গকে নিয়ে শ্রমগত বেতনের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা হিসাব করলে দাঁড়ায় ৩৩,০০০,০০০। উপরোক্ত লোকদের মধ্যে মহিলা শ্রমিকদের

সংখ্যা ছিল ৬,০০০,০০০। মোট লোকসংখ্যার হিসাবে শ্রমিক ও ওদের পরিজনদের সংখ্যা ছিল জনসংখ্যার শতকরা ৮·৫ ভাগ।

উপরোক্ত সংখ্যার মধ্যে ছিল দু'রকমের শ্রমিক—আধুনিক বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক আর গ্রামাঞ্চলে শিল্পকাজে নিযুক্ত শ্রমিক। গ্রামাঞ্চলে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে শিল্পকাজে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাই ছিল খুব বেশি, প্রায় ১৩,৫০০,০০০। পরিজনদের নিয়ে তাদের সংখ্যা ধরা যেতে পারে ২৯,৭০০,০০০।

আধুনিক বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত সহরবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১,৫০০,০০০ পরিজনদের নিয়ে এদের সংখ্যা ধরা যেতে পারে ৩,৩০০,০০০।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ বছরের মধ্যে ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ আরও বৃদ্ধি পেল। কাজেই শ্রমিকদের সংখ্যাও বেড়ে গেল। ১৯১১ সালে আধুনিক বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা (২) বৃদ্ধি পাওয়ার পরে দাঁড়াল ১৭,৫১৫,২৩০। এই সময়ে পরিজনদের নিয়ে এদের সংখ্যা ধরা যেতে পারে ৩৫,৩২৩,০৪১।

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে নানাকারণে ভারতের ধনতন্ত্র কিছুটা অগ্রসর হবার সুযোগ পেয়েছিল। ১৯২০ সালে শ্রমিকের সংখ্যার যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় শ্রমিকের সংখ্যা যুদ্ধপূর্ব যুগের তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে আধুনিক বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩,০০০,০০০। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে হিসাবে দেখা যায় এই সংখ্যা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯২০ সালে আধুনিক বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াল ৯,০০০,০০০ বা তার কিছু বেশি।

এই সময়ে বিভিন্ন প্রধান শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কিরূপ ছিল তার একটা মোটামুটি হিসাব নিচে দেওয়া হল—

(১)	কাপড়ের কল ও চটকল (যন্ত্রচালিত)	১,৩০০,০০০
(২)	যাতায়াত ব্যবস্থা	১,২০০,০০০
(৩)	খনি	৮০০,০০০
(৪)	বাগিচা	৯০০,০০০
(৫)	ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতু শিল্প	১৫০,০০০
(৬)	চাউল, ময়দা, তৈল ও কাগজের কল প্রভৃতি	১৫০,০০০
(৭)	মুদ্রাযন্ত্র	১৫০,০০০

(৮)	ডক ও জাহাজ শিল্প	২০০,০০০
(৯)	সমুদ্রপথে যাতায়াত	৩০০,০০০
(১০)	গৃহনির্মাণ শিল্প	১,৯০০,০০০
(১১)	চিনি শিল্প	১২০,০০০
(৪২)	অস্ত্র ও গোলাবারুদ	১০০,০০০
(৪৩)	চামড়া	৫০,০০০
(৪০)	তামাক	৩৮,০০০
(৪৫)	পেট্রোল শোধনাগার	৪০,০০০
(৪৬)	গ্যাস ও ইলেকট্রিক	৫০,০০০

মোট কথা, এই সময়ে ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণীর এই অংশটি যতই দুর্বল হোক না কেন শ্রেণী—চেতনা ও সংগ্রামে নির্ভীকতা—এই দুই দিক থেকে বিচার করলে শ্রমিক শ্রেণীর এই অংশটির আবির্ভাবে জাতীয় আন্দোলনে একটি অতি বলিষ্ঠ শক্তির সংযোজন হল।

শ্রমিক শ্রেণীর অর্থ নৈতিক সংগ্রাম

আগেই বলেছি ১৮৮০ সালের আগে ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল নামমাত্র। কাজেই এই সময়ে শ্রমিকের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। বলাই বাহুল্য, এই অবস্থায় সংগঠিত আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয়নি।

ভারতের ধনতন্ত্রে প্রথম বিকাশ হয় বোম্বাই, কলকাতা আর মাদ্রাজে। কাজেই এই তিনটি শহরেই শ্রমিকের সংখ্যা ছিল বেশি। শ্রমিক আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয়েছে এই তিনটি শহরে।

এই প্রসঙ্গে কাপড়ের কলের প্রধান কেন্দ্র বোম্বাইয়ের নাম প্রথম করতে হয়। তারপরেই চটকলের কেন্দ্রস্থল কলকাতা।

ভারতে প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট কবে হয়েছে তার কোনো রেকর্ড নেই। তবে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশের আদি যুগ থেকেই শ্রমিকেরা ধর্মঘট করতে আরম্ভ করেছে। ১৮৮০ সালের আগেই কয়েকটা কারখানা ও বাগিচায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছিল—যদিও এই ধর্মঘট-গুলো ছিল ছোট খাটো, সেইজন্যেই হয়তো তার রেকর্ডও নেই। (৪)

যা রেকর্ড রয়েছে তার থেকে জানা যায় ১৮৭৭ সালে নাগপুরে 'এম্প্রেস মিলস্'-এ বেতনের দাবি নিয়ে শ্রমিকেরা সর্বপ্রথম ধর্মঘট করে। (৫)

১৮৮২ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রায় ২৫টি ধর্মঘটের খবর পাওয়া যায়।

এই সময়ে অমানুষিক অত্যাচার চলত শ্রমিকদের ওপরে। ১৮৮১ সালে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্যে একটি ফ্যাক্টরী আইন পাশ হয়। এই আইনে শ্রমিকদের দিনে ১৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো চলবে না—এই নিয়ম প্রবর্তন করা হল। কিন্তু মালিকেরা এতেও সন্তুষ্ট হল না। তারা এই আইন ভাঙতে কসুর করল না। ফলে ১৮৯১ সালে আবার একটি আইন পাশ হল। কিন্তু মালিকেরা তাও মানতে রাজি হল না। শ্রমিকদের উপর উৎপীড়ন সমান ভাবেই চলতে থাকল। শেষে শ্রমিকেরা মরীয়া হয়ে উঠল ও বিদ্রোহ করল।

শ্রমিকদের এই বিদ্রোহ ধর্মঘটের রূপ গ্রহণ করল। ১৮৯৪ সালে বোম্বাই শহরে কাপড়ের কলের শ্রমিকেরা ষ্ট্রাইক করল। ১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেদাবাদের মিল শ্রমিকেরা একটি বড় ধর্মঘট সংগঠিত করল।

কলকাতার সন্নিকটে বজবজ জুট মিলেও এই সময়ে শ্রমিকেরা ষ্ট্রাইক করে (অক্টোবর ১৩, ১৮৯৫)। এই ষ্ট্রাইকের জন্যে উপরোক্ত মিলটি ছ সপ্তাহ ধরে বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এই ষ্ট্রাইকের দরুণ মিল মালিকদের ক্ষতি হয়েছিল ৮০,০০০ টাকা। (৬)

১৮৯৬ সালে জুন মাসে বজবজের ঐ মিলটিতে শ্রমিকেরা আবার ষ্ট্রাইক করে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মিলটিতে শ্রমিকেরা পুনর্বার ষ্ট্রাইক করেছিল।

১৮৯৭ সালে বোম্বাই সহরে শ্রমিকেরা দৈনিক বেতন দানের দাবিতে (তখন মাসিক বেতন দানের নিয়ম প্রচলিত ছিল) শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছিল।

১৯০৩ সালে মাদ্রাজে গভর্ণমেণ্ট প্রেসে শ্রমিকদের ওভারটাইম খাটানো হত, অথচ এজন্যে তাদের মজুরী দেওয়া হত না। এই অন্যায় প্রতিকারের জন্যেই এই ষ্ট্রাইকটি হয়েছিল। এই ষ্ট্রাইকটি প্রায় ছমাসে ধরে চলেছিল।

১৯০৫ সালে বাঙলার শ্রমিকদের মধ্যে আবার আলোড়ন আরম্ভ হল।

ঐ বছরে সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতাস্থিত গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া প্রেসের শ্রমিকেরা ধর্মঘট করল। (৭)

এই ষ্ট্রাইকের সময়ে শ্রমিকেরা যে অভিযোগগুলি পেশ করেছিল সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। রবিবার ও গেজেটেড ছুটির দিনে বেতন না দেওয়া।

২। অন্যায়ভাবে জরিমানা করা।

৩। ওভারটাইমের জন্যে অল্প মজুরী দেওয়া।

৪। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিলেও কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ছুটি মঞ্জুর করতে রাজি না হওয়া।

এই ধর্মঘটটি এক মাস ধরে চলেছিল। ষ্ট্রাইকের সংগঠনকারীদের মধ্যে থেকে সাতজনকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হল। এক মাস ষ্ট্রাইক চলার পরে শ্রমিকেরা কাজে যোগ দেয় এবং তাদের দাবির অধিকাংশই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুর করা হয়।

১৯০৭ সালে বাঙলায় রেল শ্রমিকেরা প্রথম ষ্ট্রাইক করেছিল। সমস্তিপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপের শ্রমিকেরা বিদ্রোহ করেছিল (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯০৭) মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে। ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে এই ষ্ট্রাইকের নিষ্পত্তি হলে শ্রমিকেরা আবার কাজে যোগ দেয়। এই ষ্ট্রাইকের ফলে শ্রমিকেরা একটি দুর্ভিক্ষ ভাতা আদায় করে। (৮)

১৯০৫-৭ সালে যখন বাঙলায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ষ্ট্রাইক চলছিল তখন বোম্বাই শহরেও মিল শ্রমিকদের মধ্যে আলোড়ন দেখা দেয়। মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে বোম্বাইয়ের এই ধর্মঘটগুলি সংগঠিত হয়েছিল।

১৯১০ সালে কাজের সময় সংক্ষেপের দাবি:ত ও বোম্বাই, ব্রোচ প্রভৃতি অঞ্চলে কতকগুলি ষ্ট্রাইক সংগঠিত করা হয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য ও খাটুনির সময় বৃদ্ধির প্রতিবাদে ধর্মঘটের এক নতুন জোয়ার আরম্ভ হয়। এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই সময়ে যে সমস্ত ধর্মঘট হয়েছিল সেগুলি চেতনার দিক থেকেও অনেকটা উন্নত ছিল।

১৯১৯ সালে মাদ্রাজ প্রদেশে, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি স্থানে বহু ধর্মঘট হয়েছিল। এই সময়ে বোম্বাইয়ের সমস্ত কাপড়ের কলের শ্রমিকেরা একযোগে একটি সাধারণ ধর্মঘট পালন করেছিল। ১৯২০ সালে, বোম্বাই, আমেদাবাদ, শোলাপুর প্রভৃতি জায়গায় কাপড়ের কলে ও সুতাকলে, পাঞ্জাবে

রেল মজুরেরা এবং কলকাতা, দিল্লী ও সিমলায় গভর্ণমেণ্ট প্রেসে এবং টাটা লোহা কারখানায় বিরাট বিরাট ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল। (৯)

১৯১৯-২০ সালের মধ্যে প্রায় দুশোরও বেশি ধর্মঘট হয়েছিল। এবং এই সব ধর্মঘটে প্রায় ১৫ লক্ষ শ্রমিক যোগ দিয়েছিল। এই সমস্ত ধর্মঘটে মূল দাবি ছিল দুটি—(১) খাটুনীর সময় হ্রাস, (২) মজুরী বৃদ্ধি।

১৯২১-২২ সালের মধ্যে বাঙলা দেশের চটকলগুলিতেও অনেকগুলি ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল।

১৯২১ সালের হিসাব নিকাশে দেখা যায় যে ঐ সময়ে ৩৯৬টি ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল এবং তার মধ্যে প্রায় ৩০০টি ধর্মঘটই সফলতা লাভ করেছিল।

এই সময়ে চা-বাগানের মজুরেরা ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট উপলক্ষে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের শ্রমিকেরা সহানুভূতি-সূচক ধর্মঘট করেছিল, চাঁদপুরের বিখ্যাত কুলি দুর্ঘটনাও এই সময়ে ঘটেছিল। এই ধর্মঘটে সর্বসমেত ১৮ হাজার শ্রমিক যোগ দিয়েছিল এবং ধর্মঘট আড়াই মাস ধরে চলেছিল। (১০)

১৯২২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের শ্রমিকেরা একটি সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করে। এই ধর্মঘটের ফলে ই. আই. রেল দেড় মাস ধরে অচল হয়ে যায়।

জামসেদপুরে টাটা কারখানাতেও এই সময়ে একটি বড় ধর্মঘট হয়।

১৯২৩ সালেও বড় বড় ধর্মঘট হয়েছিল বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলোতে। এই অঞ্চলের শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের ফলে কারখানার কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

১৯২৫-২৬ সালে রেল লাইন ও রেলের কারখানায় যে সব ধর্মঘট হয় সেগুলি উল্লেখযোগ্য। এন ডব্লুউ রেলের কারখানা, রাওলপিণ্ডি, লাহোর করাচি বি,-এন, ডব্লুউ রেলের গোরক্ষপুর কারখানা ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খড়গপুর কারখানায় এই সময়ে ধর্মঘট চলছিল। (১২)

খড়গপুরের ধর্মঘট অনেক দিন স্থায়ী হয়েছিল। রেল কর্তৃপক্ষ অক্সিলিয়ারী পুলিস বাহিনীর সাহায্যে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করে। ধর্মঘটিদের ওপর গুলিচালনা করা হয়। খড়গপুরের এই ধর্ম্মঘটের জের ১৯২৭ সাল পর্যন্ত চলেছিল।

১৯২৬ সালে বাঙলা দেশের চটকলগুলোতেও আবার ধর্মঘট আরম্ভ হয়।

১৯২৫-২৬ সালের ধর্মঘটগুলো আগের দিনের ধমঘটের চেয়েও অনেক

সুসংগঠিত হয়েছিল। এই ধর্মঘটগুলো শ্রমিক শ্রেণীর উন্নততর চেতনার সাক্ষ্য বহন করছে।

এইভাবেই ১৮৮০ থেকে ১৯২৫ এই ৪৫ বছরের মধ্যে ভারতে শ্রমিকশ্রেণী অনেকগুলি অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। শ্রমিকদের এই সংগ্রামগুলি ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফুর্ত শ্রেণী সংগ্রাম। এতগুলি শ্রেণী সংগ্রাম পরিচালনা করার ফলে শ্রমিক শ্রেণী নিজের শক্তি সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হতে আরম্ভ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ক্রমশ শ্রমিক শ্রেণী প্রাপ্তবয়স্কের জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে সমাজে একটি সচেতন, সংগ্রামী শক্তি হিসাবে আবির্ভুত হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন

ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে যুদ্ধোত্তর যুগে।

তার আগে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্যে ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

কলকাতায় ১৮৭০ সালের আগে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে শ্রমিকদের মধ্যে কিছু কিছু সংস্কারমুলক কাজ আরম্ভ হয়। শশীপদ ব্যানার্জী নামে জনৈক ব্রাহ্ম নেতা বরানগরে জুট মিলের শ্রমিকদের মধ্যে সংস্কারমূলক কাজ চালাবার উদ্দেশ্যে একটি শ্রমিক-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। (১৩)

তিনি স্থানীয় শ্রমিকদের শিক্ষাদানের জন্যে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্ম নেতাদের উদ্যোগে 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একখানি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৮৪ সালে লোকাণ্ডে নামক জনৈক কর্মচারী বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের মজুরদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন, এবং সাড়ে পাঁচ হাজার শ্রমিকের স্বাক্ষরিত একটি আবেদন-পত্র বোম্বাইয়ের ফ্যাক্টরী কমিশনারের কাছে পেশ করেন।

১৮৮৯ সালে আর একটি আবেদন-পত্র বোম্বাইয়ের মজুরেরা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করে। এই আবেদন-পত্রে মজুরেরা নিম্নলিখিত দাবিগুলি পেশ

করে—(১) সপ্তাহে একদিন (রবিবারে) ছুটি (২) নিয়মিত মজুরী প্রদান (৩) দুর্ঘটনার বাবদ খেসারত।

১৮৯০ সালে বোম্বাইয়ে পুনরায় দশ হাজার শ্রমিকের একটা সভা হয়েছিল। এই সভায় দুজন মহিলা শ্রমিক বক্তৃতা দেন। এই সভার পক্ষ থেকে আর একটি আবেদন পত্রে সপ্তাহে একদিনের ছুটির দাবিটি পুনরায় উত্থাপিত হয়েছিল। শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রভাবে মালিকেরা এই দাবি স্বীকার করে নেয়।

এই সময়েই সর্বপ্রথম মিঃ লোকাণ্ডে ও বেঙ্গলী নামে অপর এক ব্যক্তির চেষ্টায় 'বোম্বাই মিল মজদুর সভা' বা 'বোম্বে মিলহ্যাণ্ডস্ এসোসিয়েশন' নামে মজুরদের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এইটিকেই ভারতের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন বলা যেতে পারে। (১৪)

এই ধরনের আরও একটি প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয় ১৮৯৭ সালে। এইটি ছিল রেলকর্মচারীদের সংগঠন। এই সংগঠনটির প্রথমে নাম ছিল 'এম্যালগেমেটেড সোসাইটি অব রেলওয়ে সার্ভেণ্টস্ অব ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড বার্মা'।

তারপরে এখানে সেখানে যতই শ্রমিক ধর্মঘটের আধিক্য ঘটল ততই স্থানে স্থানে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক সঙ্ঘও গড়ে উঠতে লাগল। ১৯১০ সালে বোম্বাইয়ে 'কামগর হিতবর্ধক সভা' নামে একটি মজুর সঙ্ঘ গঠিত হয়। এই সভার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন নাড়ে, বোলে ও তালচেকর। এই সঙ্ঘটি মালিকদের কাছে ১২ ঘণ্টার শ্রম-সময়ের দাবি পেশ করে। (১৫)

আগেই দেখেছি প্রথম মহাযুদ্ধের ভেতরে শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘটের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এই যুদ্ধের মধ্যেই ১৯১৭ সালে রুশ দেশে শ্রমিক শ্রেণীর সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। এই ঘটনাটি দুনিয়ার প্রতিটি দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এই অবস্থায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম হল। এ-আই-টি-ইউ-সিই ভারতে সর্বপ্রথম সর্ব ভারতীয় সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের পত্তন করে। এই দিক থেকে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

১৯২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে 'এম্পায়ার থিয়েটার হলে' নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই কংগ্রেসের

উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিষ্টার দেওয়ান চমনলাল। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন জোসেফ ব্যাপ্টিষ্টা। সভাপতি নির্বাচিত হন লালা লাজপৎ রায়।

এই ঘটনার পরে বিভিন্ন প্রদেশে শ্রমিক সঙ্ঘ গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে বাঙলার চটকলে মজুরদের ধর্মঘট পরিচালনার জন্যে 'বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন' গঠিত হয়েছিল।

১৯২৩ সালে লাহোরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। এই সভাতেই তিনি বলেছিলেন—আমি চাই শতকরা আটানব্বুই জনের স্বরাজ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যখন শ্রমিকেরা বড় বড় ধর্মঘট করতে আরম্ভ করল তখন থেকেই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতারা শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু মুখে তাঁরা যতই শ্রমিক দরদের কথাই বলুন না কেন তাঁরা স্বাধীন শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। এঁরা চেয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিটিকে নিজেদের বুর্জোয়া রাজনীতির স্বার্থানুযায়ী ব্যবহার করতে। তাঁই এঁদের কাছে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন সচেতন আন্দোলন ছিল ভয়ের কথা।

১৯২৪-২৫ সালের মধ্যে ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। এ-দেশে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ও মার্কসবাদের প্রভাবে স্বাধীন শক্তি হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করার চেষ্টাও আরম্ভ হয়।

১৯২৬-২৭ সালের মাঝামাঝি খড়গপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে একটি স্বাধীন শক্তি হিসাবে শ্রমিক আন্দোলনকে যাঁরা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁদের শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

নবীনদের চেষ্টার ফলেই নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এই সময়ে ঘোষণা করে সাধারণ ধর্মঘট হল কংগ্রেসের অন্যতম নীতি।

১৯২৭ সালে কানপুরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে অধিবেশন হল সেই অধিবেশনটি বুর্জোয়া নেতৃত্বের কবল থেকে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে মুক্ত করতে অনেকটা সাহায্য করেছিল। (১৬) এই অধিবেশনেই সর্বপ্রথম ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নিজস্ব একটি রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই

অধিবেশনেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে যুক্ত করার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায় এবং 'লীগ এগেনষ্ট ইম্পিরিয়ালিজমের' সঙ্গে কংগ্রেসকে যুক্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এইভাবে একটি স্বাধীন শক্তি হিসাবে শ্রমিক আন্দোলনকে গড়ে তোলার চেষ্টা হল।

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা

ভারতের শ্রমিক শ্রেণী শুধু যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক সংগ্রামে অধিকতর পরিপক্কতা লাভ করল তাই নয়। ক্রমশ রাজনীতিতেও শ্রমিক শ্রেণী একটি শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হতে থাকল।

১৯০৫-১০ সালে যখন মহারাষ্ট্র ও বাঙলায় স্বদেশী-স্বরাজ-বয়কট আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিয়েছিল তখন এই আন্দোলনের ডাকে শ্রমিকেরাও সাড়া দিয়েছিল।

১৯০৮ সালে জাতীয় আন্দোলনের সর্বাগ্রগণ্য নেতা তিলককে যখন ছবছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল তখন বোম্বাইয়ের শ্রমিকেরা এই কারাদণ্ডের প্রতিবাদে দুদিন ধরে ধর্মঘট করেছিল।

শুধু ধর্মঘটই করেনি তারা, 'তিলক মহারাজ কি জয়', এবং 'স্বদেশী আন্দোলনের জয় হোক্' এই ধ্বনি উচ্চারণ করে বোম্বাই শহরের রাজপথে দাঁড়িয়ে শ্রমিকরা পুলিসের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করেছিল। এই লড়াইয়ে জনকয়েক নেতৃস্থানীয় যুবক পুলিসের গুলির আঘাতে নিহত হয়েছিল। (১৭)

এই ধর্মঘটটিকে উপলক্ষ করে লেনিন ১৯০৮ সালে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তিনি এই ধর্মঘটের গুরুত্ব নির্দেশ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—এই ধর্মঘট থেকে বোঝা যায় যে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী শ্রেণী-সচেতন হয়ে উঠেছে ও রাজনৈতিক গণ-সংগ্রাম পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট পরিপক্কতা লাভ করেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই অবশ্য ভারতে শ্রমিক শ্রেণী একটি রাজনৈতিক চেতনা-শক্তি হিসাবে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক

চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তার ফলে ১৯২১ সালে গান্ধীজী যখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন যখন শ্রমিকেরা সোৎসাহে এই আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। (১৮) হাজার হাজার কাপড়ের কলের শ্রমিক, রেল শ্রমিক ও খনিমজুর ধর্মঘট করে হরতাল পালন করেছিল।

তারপরে ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে 'প্রিন্স অব ওয়েলসের' অভিনন্দন অনুষ্ঠানগুলি বয়কট করা এবং আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তখনও শ্রমিক শ্রেণী উৎসাহের সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। (১৯)

বোম্বে শহরে বড় বড় প্রায় প্রত্যেকটি শিল্পে ধর্মঘট হওয়ার ফলে রাজকুমার নামার পরেই শহরের জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে এবং চারদিন যাবৎ এই অচল অবস্থা চলেছিল। এই দিন বোম্বাই শহরে ৮৩ জন পুলিস হয়েছিল আহত, ৫৩ জন ভারতীয় হয়েছিল নিহত এবং ৩৪১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৬০ খানি ট্রামগাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কলকাতায়ও অনুরূপ অবস্থা দেখা দিয়েছিল। এখানেও পূর্ণ হরতাল পালিত হয়েছিল। সন্ধ্যায় ইলেকট্রিক তার কেটে দেওয়া হয়েছিল, এবং রাস্তাগুলো একেবারে নিস্তব্ধ, অন্ধকার ও লোকশূন্য হয়ে উঠেছিল। কলকাতা হয়ে উঠেছিল মৃতমানুষের একটি শহর। একমাত্র কলকাতাতেই পাঁচশো লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

এইভাবেই প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই শ্রমিক শ্রেণী একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ভারতের রাজনীতিকে বেশ কিছুটা প্রভাবিত করতে আরম্ভ করল। কিন্তু তবুও এখনও ভারতের শ্রমিক শ্রেণী একটি স্বাধীন শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। এই সময়ে বুর্জোয়া নেতাদের পরিচালিত আন্দোলনে তারা যোগ দিত। বুর্জোয়া নেতারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে তাদের ব্যবহার করত। তবে সব সময়ে শ্রমিক শ্রেণীকে তারা নির্দিষ্ট অহিংসার গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখতে পারত না। তার প্রমাণ উপরোক্ত জনতা-পুলিসের সঙ্ঘর্ষগুলি।

১৯২৩ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার পর থেকে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর চেতনা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। এই সময় থেকে বুর্জোয়া নেতৃত্বের সম্পর্কে প্রশ্ন জাগল শ্রমিক শ্রেণীর মনে। নতুন বিকল্প নেতৃত্বের প্রয়োজন দেখা দিল। এই সময় থেকেই শ্রমিক শ্রেণী একটি স্বাধীন

শক্তি হিসাবে রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করল। ১৯২৭ সালে নাগপুরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একটি নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করল। (২০)

এই রাজনৈতিক কর্মসূচীটি কংগ্রেস স্বীকৃত রাজনৈতিক কর্মসূচী থেকে মূলগতভাবে আলাদা।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য হল নিম্নরূপ ঃ

(১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি।

(২) ধনবাদের উচ্ছেদ ও মজুর-কৃষকের গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা।

সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা

এই পটভূমিকায়, প্রথমত রুশ বিপ্লবের প্রভাবে এবং দ্বিতীয়ত শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতর চেতনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারারও প্রচার শুরু হল। যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতে মার্ক্সীয় মতবাদের প্রচার ও শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব পার্টি গঠনের চেষ্টাও অগ্রসর হল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্মের ইতিহাস নিম্নরূপ : (২১)

১৯১৭ সালের নবেম্বর মাসে রাশিয়ার সর্বহারা বিপ্লব সংঘটিত হলো। লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয়, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, অর্থাৎ বিশ্ব কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হলো ১৯১৯ সালে। ১৯২০ সালে মস্কোতে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হলো। এই অধিবেশনে লেনিনের ঔপনিবেশিক নিবন্ধ (থিসিস্) গৃহীত হয়। এই নিবন্ধে ভারতসহ অধীন দেশ সমূহের স্বাধীনতার ওপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের জনসাধারণের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। মজুররা বহুস্থানে ধর্মঘট করলেন। খিলাফৎ আন্দোলন ও বন্দীমুক্তি আন্দোলন আগে হতেই শুরু হয়েছিল। তারপরে ১৯১৯ সালে শাসনতন্ত্র বিষয়ক নতুন আইন পাস হলো। এই আইন দেশের লোকের মনঃপূত হলো না। রাওলাট এক্ট নামক একটি পীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধেও অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। ফলে শুরু হলো ১৯২০ সালে ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। তার সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনের সংযোগ ঘটাতে আন্দোলন

অত্যন্ত শক্তিশালী হলো। কিন্তু ১৯২১ সালের শেষ দিকে এই আন্দোলনের জোর অনেকটা কমে গেল।

এই অবস্থায়, ১৯২১ সালের শেষাশেষিতে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই প্রচেষ্টার পেছনে দেশের আন্দোলনের প্রভাব তো ছিলই, কিন্তু বিশেষ প্রেরণা ছিল তৃতীয়, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকেরও। বিশ্ব কমিউনিস্ট পার্টির প্রেরণা ছাড়া কোনও দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। প্রথম চেষ্টা শুরু হয়েছিল কলকাতা, বোম্বে ও লাহোরে। উইলিয়াম জেড্ ফস্টার তাঁর বিখ্যাত "হিস্টরি অফ দি থি ইন্‌টারন্যাশনাল্‌স্" গ্রন্থে যে বলেছেন ভারতের কমিউনিস্ট-পার্টির জন্ম হয়েছে ১৯২২ সালে সে-কথাও বেঠিক নয়। কারণ, পার্টি গঠন প্রচেষ্টা সম্পর্কিত কাগজপত্র কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের দফতরে ১৯২২ সালের গোড়াতেই শুধু পৌঁছুতে পেরেছিল।

রুশ বিপ্লবের পর হতে, বিশেষ করে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গঠিত হওয়ার পর হতে ত নিশ্চয়ই, ভারতের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বিশেষ সতর্ক হয়েছিল। তারা তাদের কেন্দ্রীয় ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোটিকে নতুন করে দৃঢ়ভিত্তিতে গড়ে তুলেছিল। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার আগে হতেই তার ওপরে আঘাত হানার অস্ত্রটি প্রস্তুত ছিল। কমিউনিস্টদের ধর-পাকড় তো ১৯২২ সালেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরে পরে ১৯২৩ সালে পেশোয়ারে, ১৯২৪ সালে কানপুরে এবং ১৯২৯ সালে মীরাটে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চালানো হলো। কানপুর ও মীরাট কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ভারত গবর্ণমেণ্ট আদালতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যে আলাদা আলাদা ফরিয়াদ পেশ করেছিল সে-দুটি ফরিয়াদেই তারা বলেছে যে ইউরোপে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল নামে একটি বিপ্লবী সংগঠন আছে। ১৯২১ সালে এই কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনাল স্থির করে যে ব্রিটিশ ভারতে তার আপন শাখা প্রসারিত করবে। এই উদ্দেশ্যে আসামী (উভয় মোকদ্দমায়) শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, শওকৎ উস্‌মানী, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও অন্যরা উক্ত কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের রাজা ও সম্রাটকে তাঁর ব্রিটিশ ভারতের রাজত্ব থেকে বঞ্চিত করা, ইত্যাদি। বলে রাখা ভালো, শওকৎ উস্‌মানী এখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হতে বহিষ্কৃত।

১৯২৭ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম গঠনতন্ত্র রচিত হয়। কমিউনিস্টরা শুরু হতেই মজুর আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত থেকেছেন। ১৯২৭ সাল হতে তাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বিশেষ স্থান অধিকার করেন। ১৯২৮ সালে তাঁরা আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। কমিউনিস্টদের একান্ত প্রচেষ্টায় ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগ্রামশীল রূপ পরিগ্রহ করে। কমিউনিস্টরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরেও কাজ করেছেন এবং সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রভৃতিতেও নির্বাচিত হয়েছেন। এদেশের মুক্তি আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করতেন, কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস সর্বদা থেকেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ করার পক্ষে। জন্ম হতেই কমিউনিস্ট পার্টি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রশ্ন দেশের সামনে তুলে ধরেছে এবং ১৯২২ সাল হতে কংগ্রেসের অধিবেশনে কমিউনিস্টরাই বারেবারে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। তার জন্যে তাঁরা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের, ব্রিটিশ শাসকদের তো বটেই, বিরাগ ভাজনও হয়েছেন। ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে কমিউনিস্টদের পরিপূর্ণ সহযোগে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হয়। কিন্তু ১৯২৮ সালে আবার কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নাকচ হয়ে গিয়ে তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের প্রস্তাবে পরিণত হয়। আবার ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সে-সময়ে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা ও লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার প্রভাব দেশে এত বেশি বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল যে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ না করে কংগ্রেস নেতৃত্বের গত্যন্তর ছিল না।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ছোট থাকার কারণে ১৯৩০ সালের আগে তা আনুষ্ঠানিকভাবে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভূত হয়নি। কিন্তু ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় শুরু হতেই কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের যে প্রেরণা ছিল তা আগেই বলেছি এবং ছিল বলেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরাও কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের স্বীকৃতি লাভ করতেন। ১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসে ভারতের পার্টির দুজন প্রতিনিধিকে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের একজে-কিউটিব্‌ কমিটিতে গ্রহণ করার কথা হয়। ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির যে বৈঠক হয় তাতে পার্টির একজন সভ্যকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্য নির্বাহক কমিটিতে যোগ দেওয়ার জন্যে নির্বাচনও করা হয়। কিন্তু, মার্চ মাসে মীরাট মোকদ্দমা শুরু হয়ে যাওয়ায় তাঁর আর বিদেশে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বলা বাহুল্য, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দফ্‌তর মস্কোতে অবস্থিত ছিল।

১৯২৮ সালে ব্যাপকভাবে ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলিতে মজুরদের সংগ্রাম শুরু হয়। বেশির ভাগ জায়গাতেই এ-সংগ্রাম কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। যে-সব জায়গায় সংগ্রামে কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি সে-সব জায়গায়ও সংগ্রামে কমিউনিস্টরা যোগ দিয়েছেন।

এত সব সহ্য করা ভারতের ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আগে হতেই কমিউনিস্টদের ওপরে আঘাত হানার জন্যে তারা প্রস্তুত হচ্ছিল। ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড আরউইন ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় আইন সভায় ঘোষণা করলেন যে "কমিউনিস্ট মতবাদ উদ্বেগজনকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এবং তা উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে উঠেছে।" ওই বছরের মার্চ মাসে ভারত গভর্ণমেণ্ট মীরাটের জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল এবং সঙ্গে সঙ্গেই অভিযুক্তদের নামে গিরেফ্‌তারী পরওয়ানা বার হয়ে গেল। ২০শে মার্চ তারিখে ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে কমিউনিস্ট সন্দেহে ৩১ জন ব্যক্তিকে গিরেফতার করা হল। পরে হিউ লেস্টার হচিন্‌শনকে গিরেফতার করায় আসামীদের সংখ্যা ৩২ জন দাঁড়াল। এই ৩২ জনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—(১) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য (দুজন গ্রেট্‌ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিরও সভ্য ছিলেন)। (২) যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন না, কিন্তু কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। (৩) যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য তো ছিলেনই না, কমিউনিস্ট মতবাদেও বিশ্বাস করতেন না।

মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম রাজকীয় মোকদ্দমা (State trial)। আদালতের ছুটির দিনগুলি ছাড়া প্রতিদিন মোকদ্দমা চলে ও দায়রার আদালতে মোকদ্দমা শেষ হয়েছিল ১৯৩৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে। অভিযুক্তদের ওপরে সবচেয়ে দীর্ঘ সাজা ছিল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আর সব চেয়ে কম সাজা ছিল ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। এর পরে হাইকোর্টের আপিলের শুনানি শেষ হতে আরও কয়েক মাস লেগেছিল। এই

মোকদ্দমা চালানোর বিরুদ্ধে এবং এর কঠোর সাজার বিরুদ্ধে পৃথিবীময় আন্দোলন হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আন্দোলন করেছিলেন ইংল্যাণ্ডের মজুরগণ। তারই প্রভাবে হাইকোর্টের আপিলে আসামীদের সাজা কমে যায়।

মীরাট মামলার কমিউনিস্ট আসামীরা আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে-সব দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছিলেন সে-গুলি এদেশের কমিউনিস্টদের সংগ্রাম ও আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁরা এ-কথা কখনও ভাবেননি যে তাঁদের বিবৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আদালত তাঁদের মুক্তি দিতে পারে। বরঞ্চ তাঁরা জানতেন যে তাঁদের বিবৃতির জন্যে তাঁদের সাজা বেড়েই যাবে। তা সত্ত্বেও তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের কর্মসূচী ও মতবাদ দেশের সর্বত্র প্রচারিত হোক। কার্যত তাই হয়েছিল। যে-উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তাঁদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালিয়েছিল সে-উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল।

মীরাট মামলা চলা অবস্থাতেই ১৯৩০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের সহিত সংযুক্ত (affiliated) হয়। সঙ্গে সঙ্গে পার্টির খসড়া কর্মসূচীও (Draft Platfrom of Action of the Communist Party of India) প্রকাশিত হয়ে যায়। নানান কারণে মাঝে কিছুদিন তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সহিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংযুক্তিকরণ স্থগিত ছিল। কিন্তু ১৯৩৪ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নতুনভাবে আবার গঠিত হয়। এ সময়ে মীরাট মামলার কয়েক জন কমিউনিস্ট বন্দীও হাইকোর্টের আপিলের ফলে মুক্তি পেয়ে এসেছিলেন। এই সময়েই পার্টি আবার আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত হলো। তখন পার্টির দ্বিতীয় গঠনতন্ত্রও গৃহীত হয়েছিল। এই ১৯৩৪ সালেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারত গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বে-আইনি ঘোষিত হয়। অবশ্য, এর আগেও পার্টি যে কখনও খোলাখুলিভাবে কাজ করতে পেরেছে তা নয়। তবুও সরকারী দফ্‌তরের কাগজপত্রে পার্টি বে-আইনি ঘোষিত ছিলনা। ১৯২৬ সাল হতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা বেশির ভাগ সাংগঠনিক কাজই করেছেন তখনকার কৃষক ও শ্রমিক দলের (Workers' and Peasants' Partyর) মঞ্চ থেকে। তাই, ১৯৩৪ সালে ভারতের

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কৃষক ও কৃষক শ্রমিক দলও বে-আইনি ঘোষিত হয়েছিল, যদিও এই দলের তখন কোনও অস্তিত্বই ছিল না।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ভারতে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রসারে বাধা দেওয়া তো দূরে থাক, বরং এই মামলাটিই ভারতের মানুষের মনে কমিউনিস্ট মতবাদ সম্পর্কে কৌতূহল জাগরিত করল। এ-দেশে মার্কসবাদ পঠন পাঠন, মার্কসবাদী ব্যবস্থার দৃষ্টি থেকে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের বিচার, ভারতের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, ভারতের সংস্কৃতির পুনর্বিচার প্রভৃতি আরম্ভ হল। মার্কসবাদকে কেন্দ্র করে একটি নতুন ভাব-বিপ্লবের সৃষ্টি হল।

জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি এমন একটি কর্মসূচী হাজির করল যা সর্বাংশে নতুন। এই কর্মসূচীতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শটি স্থান পেল চরম লক্ষ্য হিসাবে। পূর্ণ স্বাধীনতা, এবং কৃষি সংস্কার—প্রথম থেকে এই দুটিই ছিল কমিউনিস্ট কর্মসূচীর মূল বৈশিষ্ট্য। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত দেশ-প্রেমিক শক্তিকে সম্মিলিত করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সামন্ততন্ত্র-বিরোধী একটি জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করার কর্তব্যটিও কমিউনিস্ট পার্টিই সর্বপ্রথম দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিল।

বস্তুত কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যুদয় ভারতের রাজনীতিতে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করল। এখন থেকে শ্রমিক শ্রেণী ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব নেবার জন্যে প্রস্তুত হতে আরম্ভ করল। ভারতের রাজনীতিতে এক অনাগত ভবিষ্যতের পদধ্বনি শোনা গেল।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

(১) M, N. Roy—India in Tradition, P 108-9.

(২) ঐ, পৃঃ ১১৯

(৩) ,, পৃঃ ১২১-২২

(৪) Rajanikanta Das—Factory labour in India, Ch. X

(৫) R. P. Dutt—India to-day. P. 330

(৬) Buchanan—Development of Capitalistic Enterprise in India P.

(৭) Ahamed Mukhtar—Trade Unionism and Labour dispute in India Ch. I

(৮) ঐ

(৯) ধরণী গোস্বামী—ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, পৃঃ ৯

(১০) ঐ, পৃঃ ১৪

(১১) ঐ, পৃঃ ১৫

(১২) ঐ, পৃঃ ২০

(১৩) R. K. Mukherjee—The Indian Working Class. P. 352

(১৪) ধরণী গোস্বামী—ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, পৃঃ ৪

(১৫) Ahamed Muktar—Trade Unionism and Labour Dispute in India P. 10-16

(১৬) ধরনী গোস্বামী—ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, পৃঃ ২২-২৩

(১৭) D. C. Home—Bombay Worker's First Political Strike—1908, "New Age" June, 1953

(১৮) Joan Beauchamp—British Imperialism in India, P. 172

(১৯) ঐ পৃঃ ১৭৭

(২০) ধরণী গোস্বামী—ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, পৃঃ ১০

(২১) ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির জন্মের ইতিহাসটি মুজক্‌ফর আহ্‌মদের একটি অপ্রকাশিত বিবৃতি থেকে গৃহীত।

উপসংহার

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সারা ভারত জুড়ে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলেছিল বাঙলা তাতে শুধু যোগ দেয়নি, রীতিমত সম্মানিত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকেরা এতদিন এই কথাই প্রচার করত যে অন্যমনস্ক-ভাবে ব্রিটিশ এই দেশে প্রবেশ করেছিল। ভারত বিজয়ের কোনো সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। কিন্তু একবার এখানে প্রবেশ করার পরে তারা দেখল যে এখানকার লোকেরা দুঃখ সাগরে ভাসছে—দেশীয় রাজার অত্যাচারে দেশে চলছে অরাজকতা। এই অরাজকতা থেকে ভারতকে উদ্ধার করার দায়িত্ব তখন তাকে নিতে হয়েছিল। ব্রিটেন সভ্য দেশ। ভারত সাহায্য প্রার্থী। তাই ভারতের অভিভাবক হয়ে বসতে হল ব্রিটেনকে, ইচ্ছা না থাকলেও। এই অভিভাবকত্বের কাজ তাকে দুশো বছর ধরে করতে হয়েছে। তারপরে ভারত যখন যোগ্য হয়েছে তখন নাকি স্বেচ্ছায় ব্রিটেন ক্ষমতা অর্পণ করেছে ভারতবাসীর কাছে।

বলাই বাহুল্য, উপরোক্ত এই ধারণাটি সাম্রাজ্যবাদীদের কষ্টকল্পনা মাত্র। এটি ইতিহাস নয়, ইতিহাস বিকৃতি।

আসল কথা হল, ভারত সূচ্যগ্র ভূমিখণ্ডও ইংরেজকে বিনা যুদ্ধে দখল করতে দেয়নি। সেইজন্যেই ১৭৫৭ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত একটানা সংগ্রাম তাকে চালাতে হয়েছিল ব্রিটেনের বিরুদ্ধে। মীর কাশিমের বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে নৌবিদ্রোহ পর্যন্ত প্রায় দুশো বছরের ইতিহাসের মধ্যে মূর্ত হয়ে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই ইতিহাস।

কেউ কেউ বলতে চান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত।

মীর কাশিম থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে ভারতবাসী ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যে একটানা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার কি কোনই মূল্য নেই ?

আসল কথা, ইংরেজেরা এতদিন আমাদের মনের মধ্যে যে রীতিনীতি গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সেটির কবল থেকে আমরা এখনও মুক্তি পাইনি। তাই আমরা ধরে নিই এই হীনবীর্য জাতিটা ১৭৫৭ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত শতাধিক কাল যাবৎ ঘুমিয়ে ছিল, ইংরেজের অভিভাবকত্ব মেনে নিয়েছিল মুখ বুজে।

আসলে, এই কথাটাই আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই যে প্রত্যেকটি দেশের সৎ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকের মত ভারতের নাগরিকেরাও তাদের দেশকে ভালবাসতে জানে, বিদেশী অত্যাচারীকে ঘৃণা করতে জানে। দেশের শত্রু ইংরেজের কাছ থেকে ভারতের দেশপ্রেম শেখার কোনদিন প্রয়োজন হয়নি। দেশকে ভালবাসার প্রবণতা—এটি ভারতের নিজস্ব সম্পদ। ইংরেজ আসার আগেও ভারতবাসী এই সম্পদের সঙ্গে পরিচিত ছিল। ইংরেজ আসার পরে এই সম্পদটিই সে ব্যবহার করেছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে। এই প্রবণতা থেকেহ ভারতে গড়ে উঠেছিল মীরকাশিমের বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান, স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রভৃতি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্তর যেমন বদলেছে, দেশের সমাজ বিকাশের ধারাটি যেমন এগিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তিগুলোও নব নব রূপে বিকশিত হয়েছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতিতেও নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের সংযোজন হয়েছে।

এই দিক থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে প্রধানত তিনটি মূল স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে।

প্রথমটি, মীরকাশিমের সংগ্রাম থেকে ১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান পর্যন্ত এই একশো বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই স্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতরে দুটি ধারা বর্তমান—একটি দেশপ্রেমিক সামন্তপ্রভুদের বিদ্রোহের ধারা, মীরকাশিম, টিপু সুলতান প্রভৃতি এই ধারার প্রতিনিধি, অপরটি সামন্ততন্ত্র বিরোধী, ব্রিটিশ বিরোধী—কৃষকপ্রধান ধারা, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, ফরাজী বিদ্রোহ, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই ধারাটির রূপায়ণ। ১৮৫৭ সালের

জাতীয় অভ্যুত্থানে সমসাময়িক ভাবে এই দুই ধারার মিলন ঘটেছিল। এই অভ্যুত্থানের মধ্যে সামন্তপ্রভুদের দেশপ্রেমিক-অংশটি যেমন যোগ দিয়েছিল, তেমনি সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ব্রিটিশ-বিরোধী সৈনিক ও কৃষক সমাজই ছিল এই বিদ্রোহের মূল শক্তি।

১৮৫৭ সালের পরে বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যেমন অগ্রগতি দেখা দিল তেমনি এ-দেশে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরও সূত্রপাত হল।

এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব চলছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই। রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির চিন্তাধারার মাধ্যমে এই বুর্জোয়া আন্দোলনের প্রস্তুতি-পর্বের সূত্রপাত। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত যেমন একদিকে চলেছিল একটানা কৃষক বিদ্রোহের ধারা : নীল বিদ্রোহ, ওয়াহাবী বিদ্রোহ, পাবনা ও বগুড়ার কৃষক বিদ্রোহ প্রভৃতি, তেমনি অপর দিকে ঠিক এই সময়ে ব্রাহ্ম আন্দোলন, হিন্দু মেলা, বঙ্গদর্শন, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গোষ্ঠী প্রভৃতির নেতৃত্বে বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ভাবধারাও প্রসার লাভ করেছিল। এমন কি, এই সময়ে অল্প বিস্তর কৃষক বিদ্রোহের ধারা, ও বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ধারার মধ্যে একটি যোগাযোগের সূত্র খোঁজারও চেষ্টা চলেছিল। (নীলবিদ্রোহ ও পাবনার কৃষক বিদ্রোহের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশের সহানুভূতি এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যনীয়)।

এই যোগাযোগের সূত্রটি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই ব্রিটিশ ধুরন্ধরদের উদ্যোগে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

কিন্তু ইংরেজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। কংগ্রেসের জন্ম লগ্নে বুর্জোয়া সংস্কারবাদের চৌহদ্দীর মধ্যে কংগ্রেসের কাজের যে গণ্ডী বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সেই গণ্ডীর মধ্যে কংগ্রেসের কাজকে বেশীদিন আটকে রাখা গেল না।

দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত ও অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকদের রাজনৈতিক চেতনা খরতর হওয়ার পর থেকে বুর্জোয়া সংস্কারবাদের বাঁধা গণ্ডী ভেঙে ঐ নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির উদ্যোগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনটি সংগ্রামী পর্যায়ে উন্নীত হল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে দুটি ধারা লক্ষিত হতে থাকল। একটি বড় বড় শিল্পপতিদের স্বার্থ-ঘেঁষা বুর্জোয়া সংস্কার-

বাদী ধারা বা লিবারেল ধারা, আর একটি বুর্জোয়া সংগ্রামী ধারা অথবা গণতান্ত্রিক ধারা। উপরতলার মানুষের সংস্কারবাদী ধারার ধ্বজাবাহী ছিলেন এই সময়ে কংগ্রেসের 'মডারেট' বা নরমপন্থী নেতারা। আর নিম্নতলার মানুষের সংগ্রামী ধারাটির এই সময়ে পতাকা বহন করলেন 'চরমপন্থী' নেতারা। এই চরমপন্থী নেতাদের উদ্যোগেই ভারতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সূত্রপাত এবং এই সংগ্রামেরই প্রকাশ হয়েছিল ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে, যুদ্ধের সময়কার হোমরুল আন্দোলনে, ১৯০৫ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যবর্তী পর্বের একটানা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে।

১৯১৬ সালের আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে যে বুর্জোয়া সংগ্রামী ধারাটির উদ্বোধন হয়েছিল সেটি প্রেরণা লাভ করেছিল ইংলণ্ডের বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, আয়ার্ল্যাণ্ডের আন্দোলন, চীনের আন্দোলন প্রভৃতি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলি থেকে। এই সময় ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে ভারতে ধনতন্ত্রের অগ্রগতির ফলে শ্রমিক শ্রেণী একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে পূর্ব-নির্দিষ্ট বুর্জোয়া বিপ্লবের গণ্ডীর মধ্যেও ভারতের জাতীয় আন্দোলনের রাশটি আর টেনে রাখা সম্ভব হল না। এখন থেকে আরম্ভ হল ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নতুন একটি পর্যায়ের উদ্বোধন।

রুশ দেশে অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যের ফলে দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের সামনে একটি নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হল। এখন থেকে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আয়োজন চলল। প্রতিটি অত্যাচারিত দেশের আন্দোলনের মধ্যেই একটি ধারার আবির্ভাব হল যা সমাজতন্ত্রকে চরম রাজনীতিক লক্ষ্য বলে ঘোষণা করল।

এই অবস্থায় ভারতের জাতীয় আন্দোলনও দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ল। একটি হল আগের পর্বের বুর্জোয়া সংগ্রামী ধারার জের। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই সময়ে পুরোনো দিনের বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ধারাটি (মডারেট নেতাদের ধারাটি) জাতীয় আন্দোলনের মঞ্চ থেকে বিদায় নিল এবং ইংরেজের কাছে নতি স্বীকার করল, কিন্তু 'মডারেট'রা বিদায় নিলেও ভারতের বড় বড় শিল্পপতিদের সঙ্গে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের বিরোধ রয়েই গেল। তাই ভারতের শিল্পপতি ও

তাঁদের প্রতিনিধি স্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় আন্দোলনে থাকার, নিজেদের স্বার্থে এই আন্দোলন ব্যবহার করার প্রয়োজন অনুভব করল। জাতীয় আন্দোলনে গান্ধী নেতৃত্ব ছিল এই ধারাটিরই ধারক ও বাহক। শিল্পপতিদের শ্রেণী-স্বার্থ অনুযায়ী এই ধারাটি যাঁরা অনুসরণ করলেন তাঁদের হাতে রইল ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হুমকি, আর এক হাতে রইল আপোষ প্রস্তাব। এই আন্দোলন যাতে সশস্ত্রগণ অভ্যুত্থানে পরিণত হতে না পারে তার জন্যেই এই ধারাটি আমদানি করল অহিংস সত্যাগ্রহের পথ। জাতীয় সংগ্রামটিকে ব্যবহার করে ব্রিটেনের কাছ থেকে সুবিধামত সংস্কার আদায় করাই এই ধারাটির ছিল লক্ষ্য। তাই নতুন অবস্থায় নবরূপে এই ধারাটি বুর্জোয়া সংস্কারবাদকে জীইয়ে রাখার চেষ্টা করল।

অপর দিকে, এই সময় থেকেই একটি শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হল। তারই প্রমাণ হল কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পত্তন, বড় বড় ধর্মঘটের আবির্ভাব, কৃষক সভার স্থাপনা ইত্যাদি। সমাজ-তন্ত্রের চরম লক্ষ্য, পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প, আর কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচী এই তিনটি বিষয় নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা যে নতুন কার্যক্রম হাজির করলেন সেইটেই জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে একটি বামপন্থী ধারা বলে প্রচারিত হতে লাগল।

এই বামপন্থী আন্দোলনের চাপেই এই কংগ্রেস ১৯২৭ সালে গ্রহণ করেছিল পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প। এই ধারাটির প্রভাবেই কংগ্রেসকে বর্জন করতে হয়েছিল জমিদারী ব্যবস্থার প্রতি প্রশংসাসূচক প্রস্তাব। এই বামপন্থী ধারাটি জাতীয় আন্দোলনকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে দেখত। তাদের প্রেরণার উৎস ছিল সোবিয়েত রাশিয়ার প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্রটি, আর ছিল সারা ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলন, ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় আন্দোলন, বিশেষ করে চীনের গণমুক্তি সংগ্রাম। তারপরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ও মহাযুদ্ধের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন দ্রুত খারাপ হতে থাকল তেমনি দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অসন্তোষও বহুগুণে বেড়ে গেল। ফলে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনও আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল।

এই সময়ে জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে বামপন্থীদের শক্তিও বহুগুণে বেড়ে

গেল। দেশের লোকের চোখে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্নগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে একটি স্বাধীন শক্তি হিসাবে কাজ করতে আরম্ভ করল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, যুব-আন্দোলন, মহিলা আন্দোলন ইত্যাদি গড়ে উঠতে লাগল। সমাজতন্ত্রের আদর্শটি কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্যান্য বামপন্থী শক্তিও গ্রহণ করল। কংগ্রেস, সমাজতন্ত্রী পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল।

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের এক হাতে সংগ্রাম, আর এক হাতে আপোষ, এই নীতির বদলে আমরণ অবিরাম সংগ্রামের শপথ নিয়ে বামপন্থী শক্তিগুলো অগ্রসর হল।

এই সময়ে যে-সমস্ত বড় বড় সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল তার প্রত্যেকটির পুরোভাগে ছিলেন বামপন্থীরা। উদাহরণ হিসাবে যুদ্ধপূর্ব যুগের আইন অমান্য আন্দোলন, যুদ্ধকালীন স্বতঃস্ফূর্ত আগস্ট আন্দোলন, একটানা শ্রমিক ধর্মঘট, যুদ্ধোত্তর যুগের আজাদ হিন্দ আন্দোলন, পুলিশ ধর্মঘট, সর্বোপরি নাবিক ধর্মঘটের কথা বলা চলে।

এই আন্দোলনগুলির চাপেই ইংরেজ বুঝতে পারে যে ভারতের রাজনৈতিক চেতনা যে স্তরে উন্নীত হয়েছে তাতে তার পক্ষে এ-দেশ প্রত্যক্ষভাবে শাসন করা আর সম্ভব নয়। সেইজন্যেই এই বিপ্লবী শক্তির জয়ের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে ইংরেজ সংস্কারবাদী কংগ্রেস নেতাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে যায়। ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারটার পিছনে এই উদ্দেশ্যটাই প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

অবশ্য মুহূর্তের জন্যেও এই কথাটি ভোলা উচিত নয় যে ১৯৪৭ সালে ভারত যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে সেটা হয়েছে ভারতের পক্ষে পরম লাভ।

এই পরম লাভের পিছনে রয়েছে দু'শো বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুঞ্জীভূত ফলরাশি। শুধু কংগ্রেস পরিচালিত অহিংস সত্যাগ্রহ নয়, সর্বস্তরের আইন-অমান্য আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদীদের হিংসাত্মক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, নৌ-বিদ্রোহ—স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপারে উপরোক্ত প্রত্যেকটি আন্দোলনেরই অবদান রয়েছে।

বস্তুত, অহিংস সত্যাগ্রহ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, শ্রমিক কৃষক আন্দোলন, নৌ,-বিদ্রোহ প্রভৃতি ভিন্নধর্মী স্রোতধারার সম্মেলনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে যে মহাসমুদ্র সৃষ্টি হয়েছিল সেই মহাসমুদ্রের গর্জনে ভয় পেয়েছিল ইংরেজ এবং তারই ভয়ে সে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি হয়েছিল।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের হয়েছে পর লাভ। কিন্তু এই স্বাধীনতার ভিত্তিমূল আজও একান্তভাবে দুর্বল। পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, কৃষকদের মধ্যে জমিবণ্টন, জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণ-তান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কছেদ, বিশ্বশান্তি ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে মৈত্রী—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চ থেকে পর পর উচ্চারিত এই দাবিগুলির ভিত্তিতে ভারতের সমাজ-বিকাশের ধারাটি যেদিন উন্মুক্ত হবে সেই দিন হবে ভারত-দিগন্তে নব সূর্যোদয়।

সেই সূর্যোদয়ের শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় ভারতের অগণিত শ্রমজীবী মানুষ দিন গুনছে।

হ

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ /০,	১৮ লাইনে	'একাদশদর্শী'	হবে	'একদেশদর্শী'
" ৩০,	১৩ "	'১৮৯৩'	"	'১৭৯৩'
" ৬৭,	১২ "	'বর্বরো চিভ'	"	'বর্বরোচিত'
" ৮৯,	৫ "	'কার্ল মার্কিন'	"	'কার্ল মার্কস'
" ২৬১,	৭ "	'কংগ্রেস, সমাজতন্ত্রী পার্টি'	"	'কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী পার্টি'